

গবাদিপশুর রোগ ও প্রতিরোধ

LIVESTOCK DISEASES & THEIR PREVENTION



(বিএজিএড প্রোগ্রামের 'গৃহপালিত পশুর রোগ ও প্রতিকার' নামক বই থেকে সংকলিত)



কৃষি ও পর্যায় উন্নয়ন কল্যাণ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
BANGLADESH OPEN UNIVERSITY

ড. মোঃ আখতার হোসেন
ডা. আনন্দ আমিনুর রহমান
ডা. সাবিব আহমেদ

গবাদিপশুর রোগ ও প্রতিরোধ

সি এল পি প্রোগ্রাম

কোর্স কোড : CLP 1305

(বিএজিএড প্রোগ্রামের গৃহপালিত পশুর রোগ ও প্রতিকার নামক বই থেকে সংকলিত)



কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন স্কুল
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

গবাদিপশুর রোগ ও প্রতিরোধ

LIVESTOCK DISEASES & THEIR PREVENTION

সি এল পি প্রোগ্রাম

কোর্স কোড : CLP 1305

লেখক

ড. মোঃ আখতার হোসেন

সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগ

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

ড. আনন্দ আমিনুর রহমান

ভেটেরিনারি মেডিসিন এন্ড এনিম্যাল সায়েন্স অনুষদ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

ড. সাবিব আহমেদ

পশুসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা

সংকলক

ড. আনন্দ আমিনুর রহমান

ভেটেরিনারি মেডিসিন এন্ড এনিম্যাল সায়েন্স অনুষদ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদনা পরিষদ

সভাপতি

প্রফেসর ড. আবু হেনা মোহাম্মদ ফারুক

সদস্য

ড. মোঃ আবু তালেব

ড. মোঃ শাহ আলম সরকার

ড. মোঃ সরওয়ার হোসেন চৌধুরী

ড. আনন্দ আমিনুর রহমান

ড. মোঃ মোর্শেদুর রহমান

ড. মোঃ বিলাল হোসেন

ড. মোঃ নুরুল ইসলাম

ড. আবু সাদেক মোঃ সেলিম

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

ড. আবু হেনা মোঃ ফারুক

কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন স্কুল
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

গবাদিপশুর রোগ ও প্রতিরোধ

LIVESTOCK DISEASES & THEIR PREVENTION

কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন স্কুল

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৮

পুনঃপ্রকাশ : ২০১১

কম্পিউটার কম্পোজ

তুষার কান্তি মুখা

প্রকাশনায়

প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

গাজীপুর-১৭০৫

© বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

প্রচ্ছদ

মোঃ মনিরুল ইসলাম

চিত্রাংকন ও স্থির চিত্র

ড. আ.ন.ম আমিনুর রহমান

কভার ট্রাফিকস

আবদুল মালেক

মুদ্রণ

স্বরবর্গ প্রিণ্টার্স

১৮/২৬/৮, শুকলাল দাস রোড, ঢাকা-১১০০।

ISBN 984-34-5055-8

ORIGINAL PUBLICATION

DISEASES & REMEDIES OF DOMESTIC ANIMALS (গৃহপালিত পশুর রোগ ও প্রতিকার), Written by: Dr. Akter Hossain, Dr. A N M Aminoor Rahman and Dr. Sabbir Ahmed. Edited by: Dr. A N M Aminoor Rahman. First Edition: January, 1998. Published by: Publishing, Printing & Distribution Division, Bangladesh Open University, Gazipur-1705.

সূচিপত্র

ইউনিট ১ গবাদিপশুর রোগ নির্ণয়ে প্রাথমিক করণীয়	১-৩০
পাঠ ১.১ গবাদিপশুর বাহ্যিক পরীক্ষা	১
পাঠ ১.২ গবাদিপশুর অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা	৭
পাঠ ১.৩ পরীক্ষাগারে বিভিন্ন নমুনা পরীক্ষা	১২
ব্যবহারিক	
পাঠ ১.৪ একটি সুস্থ গবাদিপশু দেখে বাহ্যিক লক্ষণগুলো জানা ও খাতায় লেখা	২০
পাঠ ১.৫ নিজ হাতে গবাদিপশুর শরীরের তাপমাত্রা নির্ণয় করা	২৩
পাঠ ১.৬ নিজ হাতে গবাদিপশুর নাড়ির গতি ও শ্বাসপ্রশ্বাসের হার নির্ণয় করা	২৬
ইউনিট ২ গবাদিপশুর ভাইরাসজনিত সংক্রামক রোগ	৩১-৪৬
পাঠ ২.১ ক্ষুরারোগ	৩১
পাঠ ২.২ গবাদিপশুর বসন্ত	৩৬
পাঠ ২.৩ জলাতক্ষ	৪১
ইউনিট ৩ গবাদি পশুর ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রামক রোগ	৪৭-৬৬
পাঠ ৩.১ বাচ্চুরের ব্যাকটেরিয়াজনিত বিভিন্ন সংক্রামক রোগ	৪৭
পাঠ ৩.২ বাদলা রোগ	৫২
পাঠ ৩.৩ গলাফোলা রোগ	৫৬
পাঠ ৩.৪ তড়কা রোগ	৬১
ইউনিট ৪ গবাদিপশুর সাধারণ পরজীবীজনিত রোগ	৬৭-১০৮
পাঠ ৪.১ গবাদিপশুর অন্তঃপরজীবীর পরিচিতি	৬৭
পাঠ ৪.২ গবাদিপশুর অন্তঃপরজীবীজনিত রোগ	৭৬
পাঠ ৪.৩ গবাদিপশুর বহিঃপরজীবীর পরিচিতি	৮২
পাঠ ৪.৪ গবাদিপশুর বহিঃপরজীবীজনিত রোগ	৮৭
পাঠ ৪.৫ গবাদিপশুর প্রোটোজোয়াজনিত রোগ	৯২
ব্যবহারিক	
পাঠ ৪.৬ পরীক্ষাগারে গোবর পরীক্ষা করে কৃমির ডিম শণাক্তকরণ	৯৮
পাঠ ৪.৭ গবাদিপশুর বহিঃপরজীবী দমনে ওষুধ প্রয়োগ	১০২
ইউনিট ৫ অপুষ্টিজনিত ও প্রজনন সংক্রান্ত রোগ	১০৫- ১৪০
পাঠ ৫.১ ভিটামিনের অভাবজনিত রোগ ও প্রতিকার	১০৫
পাঠ ৫.২ খণ্জপদার্থের অভাবজনিত রোগ ও প্রতিকার	১১১
পাঠ ৫.৩ গবাদিপশুর অনুর্বরতার কারণ ও প্রতিকার	১২০
পাঠ ৫.৪ গবাদিপশুর জনন অঙ্গের বিভিন্ন রোগ ও প্রতিকার	১২৫

ব্যবহারিক		
পাঠ ৫.৫	গবাদিপশুর জনন অঙ্গে ওষুধ প্রয়োগ	১৩৮
ইউনিট ৬	গবাদিপশুর সাধারণ রোগব্যাধি	১৪১-
		১৪৮
পাঠ ৬.১	গবাদিপশুর বিষক্রিয়া ও প্রতিকার	১৪১
পাঠ ৬.২	গবাদিপশুর পেটফাঁপা ও প্রতিকার	১৪৯
পাঠ ৬.৩	গবাদিপশুর উদরাময় ও কোষ্ঠকাঠিন্য রোগ	১৫৫
পাঠ ৬.৪	জোয়াল কান্দা, কুঁজে ঘা ও অন্যান্য ক্ষত	১৬৫
পাঠ ৬.৫	গবাদিপশুতে বিভিন্ন রকমের ক্ষত	১৭২
পাঠ ৬.৬	গবাদিপশুর দাদ ও অন্যান্য চর্মরোগ	১৭৭
ব্যবহারিক		
পাঠ ৬.৭	পেটফাঁপা রোগে আক্রান্ত পশুকে নিজ হাতে ওষুধ খাওয়ানো	১৮২
পাঠ ৬.৮	কুঁজে ঘায়ের চিকিৎসার জন্য মলম তৈরি করে ঘায়ের চিকিৎসা করা	১৮৫
ইউনিট ৭	গবাদিপশুর রোগ প্রতিরোধে টিকার ব্যবহার	১৮৯-
		১৯০
পাঠ ৭.১	বিভিন্ন ধরনের টিকার সংরক্ষণ পদ্ধতি ও পরিবহণ	১৮৯
পাঠ ৭.২	গবাদিপশুর ব্যাকটেরিয়াল টিকার পরিচিতি ও ব্যবহার	১৯২
পাঠ ৭.৩	গবাদিপশুর ভাইরাল টিকার পরিচিতি ও ব্যবহার	১৯৫
ব্যবহারিক		
পাঠ ৭.৪	বিভিন্ন ধরনের টিকাবীজ সংরক্ষণ হাতে কলমে শেখা ও পদ্ধতি খাতায় লেখা ...	১৯৮
পাঠ ৭.৫	একটি সুস্থ গবাদিপশুকে যে কোনো একটি ব্যাকটেরিয়াল টিকা প্রদান করতে শেখা	২০১
পাঠ ৭.৬	একটি সুস্থ গরুকে যে কোনো একটি ভাইরাল টিকা প্রদান করতে শেখা	২০৪
ইউনিট ৮	টিকা ও ওষুধের ব্যবহার পদ্ধতি	২০৭-
		২২৬
পাঠ ৮.১	টিকা ও ওষুধ প্রয়োগ পদ্ধতি	২০৭
পাঠ ৮.২	ইনজেকশনের মাধ্যমে গবাদিপশুতে ওষুধ প্রয়োগ	২১১
ব্যবহারিক		
পাঠ ৮.৩	গবাদিপশুকে নিজ হাতে ওষুধ খাওয়ানো	২১৫
পাঠ ৮.৪	একটি গরুর বিভিন্ন জায়গায় ইনজেকশন প্রদান করা	২১৮

পাঠ নির্দেশনা

“গবাদিপশুর রোগ ও প্রতিরোধ” কোর্সবইটি বিশেষভাবে কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন স্কুল এর সিএলপি প্রোগ্রামের ছাত্রদের জন্য লেখা হয়েছে। আপনি জানেন, দূর শিক্ষায় শিক্ষকের সার্বক্ষণিক উপস্থিতি নেই। তাই পাঠের কোনো কঠিন বিষয় যেন আপনার বুবাতে অসুবিধা না হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখেই কোর্সবইটি লেখা হয়েছে। কোর্সবইটির আঙ্গিক ও উপস্থাপনা তাই প্রচলিত পাঠ্যবই থেকে কিছুটা ভিন্ন ধরনের। যেহেতু সরাসরি শিক্ষকের সাহায্য ছাড়াই কোর্সবইটি আপনাকে নিজে পড়ে বুবাতে হবে, তাই এটি কীভাবে পড়বেন প্রথমেই তা জেনে নিন। এতে কোর্সবইটি পড়তে ও বুবাতে আপনার সুবিধা হবে।

কোর্সবইটির রূপরেখা

“গবাদিপশুর রোগ ও প্রতিরোধ” কোর্সবইটি আটটি ইউনিটে বিভক্ত। প্রতিটি ইউনিটে একাধিক পাঠ রয়েছে। পাঠ সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে ইউনিটের বিষয়বস্তুর ওপর নির্ভর করে। ইউনিটের পাঠগুলোকে আলাদা করে সাজানো হলেও এদের মধ্যে একটি যোগসূত্র রয়েছে। এ কোর্সবইটির ইউনিট ১, ২ ও ৬ এর পান্তুলিপি রচনা করেছেন ড. মো. আখতার হোসেন, প্রফেসর, সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ; ইউনিট ৩ ও ৫ এর পান্তুলিপি রচনা করেছেন ড. আ. ন. ম. আমিনুর রহমান, অধ্যাপক (সার্জারি এন্ড অবস্টেট্রিক্স), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর এবং ইউনিট ৪, ৭ ও ৮ এর পান্তুলিপি রচনা করেছেন ডা. সারিবর আহমেদ, সাবেক পরিচালক, পশুসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।

ইউনিটের ভূমিকা

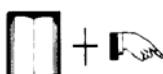
প্রতিটি ইউনিটের শুরুতেই রয়েছে একটি ভূমিকা। ভূমিকায় ইউনিটের বিষয়বস্তুর উদ্দেশ্য এবং গুরুত্ব সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। ইউনিটটিতে কী কী বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সংক্ষেপে তারও উল্লেখ রয়েছে। এতে আপনি ইউনিটের শুরুতেই জেনে যাচ্ছেন পাঠের মূল আলোচ্যসূচি কী?

পাঠের উদ্দেশ্য

লক্ষ্য করবেন প্রতিটি পাঠের শুরুতে এক বা একাধিক সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য দেয়া আছে। প্রতিটি উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই পাঠের বিষয়বস্তু সহজভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। পাঠ শেষে পাঠের উদ্দেশ্যগুলো অর্জন করা সম্ভব হয়েছে কি—না তা নিজেই মূল্যায়ন করবেন। এজন্য পাঠ শেষে স্বমূল্যায়ন প্রশ্ন অর্থ্যাত পাঠোন্তর মূল্যায়ন রয়েছে। এতে আপনি পাঠটি কতটুকু বুবাতে পারবেন তা নির্ধারণ করতে পারবেন।

আইকনের (Icon) ব্যবহার

পাঠের বিষয়বস্তুগুলো একদৃষ্টিতে বুঝে নেয়ার জন্য প্রয়োজন অনুসারে কোর্সবইটির বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের প্রতীক বা আইকন ব্যবহার করা হয়েছে, যা দেখে আপনি সহজেই বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা এবং আপনার করণীয় কী তা বুবাতে পারবেন। নিম্নে এ কোর্সবইটিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের আইকনের অর্থ নির্দেশ করা হলো—



= পড়ন ও লক্ষ্য করুন



= পাঠের উদ্দেশ্য



= আবশ্যিক পাঠ/সারমর্ম



= ছবি দেখুন



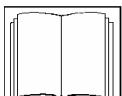
= অনুশীলন/চূড়ান্ত মূল্যায়ন



= পাঠ্ঠোভর মূল্যায়ন



= উত্তরমালা



= তথ্যসূত্র

বক্স লিখন



পাঠের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় অংশকে আরও আকর্ষণীয় করে প্রদর্শনের জন্য মাঝে মাঝেই “বক্স লিখনের” মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিটি “বক্স লিখন” মনোযোগ দিয়ে পড়ুন এবং মনে রাখার চেষ্টা করুন।

অনুশীলন

আপনি পাঠটি ভালোভাবে বুঝতে পারছেন কি—না তা যাচাই করার জন্য পাঠের মাঝে কোনো কোনো জায়গায় দেয়া রয়েছে অনুশীলন। অনুশীলনগুলো আপনাকে সমাধা করতে হবে। এসব অনুশীলন আপনার জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

সারমর্ম

প্রতিটি পাঠেই সারমর্ম দেয়া আছে। সারমর্ম পড়ে আপনি নির্দিষ্ট পাঠের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অতি সহজেই ধারণা নিতে পারবেন।

পাঠ্ঠোভর মূল্যায়ন

প্রতিটি পাঠের শেষে আপনি পাঠটি কর্তৃক বুঝতে পেরেছেন তা যাচাইয়ের জন্য রয়েছে পাঠ্ঠোভর মূল্যায়ন। পাঠটি ভালোভাবে বোঝার পর পাঠ্ঠোভর মূল্যায়নের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়ার চেষ্টা করুন। অতঃপর আপনার দেয়া উত্তর ইউনিট শেষে দেয়া উত্তরের সাথে মিলিয়ে নিন। সবগুলো উত্তর সঠিক হলে পরবর্তী পাঠ শুরু করুন অন্যথায় পাঠটি পুনরায় পড়ুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

প্রতি ইউনিটের শেষে রয়েছে চূড়ান্ত মূল্যায়ন। এতে সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন রয়েছে। এ প্রশ্নগুলোর উত্তর তৈরি করার চেষ্টা করুন, যা আপনাকে পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করতে সাহায্য করবে। এক্ষেত্রে অন্যান্য তথ্যসূত্রের সাহায্য নিতে পারেন। এছাড়া প্রয়োজনে আপনার টিউটরের সাথেও কথা বলতে পারেন। ইউনিটের সবগুলো পাঠ ভালোভাবে পড়লে চূড়ান্ত মূল্যায়নের প্রশ্নগুলো সমাধানে কোনো অসুবিধা হবে না।

ORIGINAL PUBLICATION

DISEASES & REMEDIES OF DOMESTIC ANIMALS (গৃহপালিত পশুর রোগ ও প্রতিকার), **Written by:** Dr. Akter Hossain, Dr. A N M Aminoor Rahman and Dr. Sabbir Ahmed. **Edited by:** Dr. A N M Aminoor Rahman. **First Edition:** January, 1998. **Published by:** Publishing, Printing & Distribution Division, Bangladesh Open University, Gazipur-1705.

DISEASES & REMEDIES OF DOMESTIC ANIMALS (গৃহপালিত পশুর রোগ ও প্রতিরোধ), a 3 Credit Coursebook for the Bachelor of Agricultural Education Programme. **Written by:** Dr. Akter Hossain, Dr. A N M Aminoor Rahman and Dr. Sabbir Ahmed. **Edited by:** Dr. A N M Aminoor Rahman. **First Edition:** January, 1998. **Computer Published by:** Publishing, Printing & Distribution Division, Bangladesh Open University, Gazipur-1705.

ইউনিট ১ গবাদিপশুর রোগ নির্ণয়ে প্রাথমিক করণীয়

ইউনিট ১ গবাদিপশুর রোগ নির্ণয়ে প্রাথমিক করণীয়

পশুসম্পদ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে এ খাতের অবদান প্রায় ৬.৫ শতাংশ। জমি চাষ, ফসল মাড়াই, পরিবহণ, সার ও জুলানির বিষয় বিবেচনা করলে এ অবদানের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ১৩ শতাংশ। জাতীয় অর্থনীতিতে অবদানকারী এসব গবাদিপশু মানুষের ন্যায় বিভিন্ন রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে থাকে। যথাসময়ে আক্রান্ত পশুর রোগ নির্ণয় করা এবং সে অনুযায়ী চিকিৎসা প্রদান করা অপরিহার্য। বর্তমানে চিকিৎসার অভাবে প্রতিবছর ১০ শতাংশ গবাদিপশু এবং ১০—১৫ শতাংশ হাঁসমুরগির মৃত্যু হচ্ছে। এতে প্রতিবছর দেশের প্রায় ১৪০০ কোটি টাকার সম্পদ বিনষ্ট হয়। কাজেই পশুর রোগ যথাসময়ে নির্ণয় করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে পশুর বাহ্যিক পরীক্ষা, অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা এবং পরীক্ষাগারে বিভিন্ন রোগের নমুনা পরীক্ষাসংক্রান্ত বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিকসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে।

পাঠ ১.১ গবাদিপশুর বাহ্যিক পরীক্ষা

এ পাঠ শেষে আপনি –

- রোগ নির্ণয়ে গবাদিপশুর মালিক বা পালককে কী কী জিজ্ঞাসা করতে হবে তা লিখতে পারবেন।
- কীভাবে রোগাক্রান্ত গবাদিপশুর সাধারণ ও নিদানিক বা ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা করবেন তা আলোচনা করতে পারবেন।
- কীভাবে গবাদিপশুর শারীরিক পরীক্ষা করতে হবে তা বর্ণনা করতে পারবেন।



পশুর রোগ নির্ণয়ের জন্য এর মালিক বা পালকের নিকট থেকে রোগসংক্রান্ত বিভিন্ন বর্তমান ও অতীত তথ্যাদি সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

বর্তমান ও অতীত ইতিহাস

গবাদিপশুর রোগ নির্ণয়ের জন্য প্রথমেই বাহ্যিক পরীক্ষা আবশ্যিক। এ পরীক্ষাকে সাধারণ পরীক্ষা (General Examination) বলে। রোগে আক্রান্ত পশু থেকে কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়ে এ পরীক্ষা করা হয়। পশু মানুষের ন্যায় কথা বলতে পারে না। কাজেই, বাহ্যিক পরীক্ষার পূর্বে পশুর মালিক অথবা পালকের নিকট থেকে রোগসংক্রান্ত বিভিন্ন বর্তমান ও অতীত তথ্যাদি সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, পশুর খাদ্য গ্রহণ স্বাভাবিক আছে কি—না, পশু প্রস্তাবপায়খানা ঠিকমতো করছে কি—না, বর্তমানে তার অসুবিধা কী, কতদিন পূর্বে রোগের লক্ষণ প্রথম দেখা দিয়েছে, ইতিপূর্বে কোনো চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে কি—না ইত্যাদি।

সাধারণ পরীক্ষা (General Examination)

পশুকে প্রথমে দূর থেকে দেখে এবং পরে নিকটে যেয়ে তার শারীরিক পরীক্ষা করতে হবে। সাধারণ পরীক্ষার মধ্যে নিচের পর্যবেক্ষণগুলো রোগ নির্ণয়ের জন্য সহায়ক হবে। যথা—

ক. আচার (Behaviour) : অসুস্থ পশু সাধারণত সীমিত নড়াচড়া করে এবং অন্যান্য পশু থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। পারিপার্শ্বিক উদ্বীপক অসুস্থ পশুকে উদ্বেলিত করে না। অনেক সময় পশুকে স্থাবিত ও চিন্তাযুক্ত মনে হয়। পেটে ব্যথা হলে পশুকে অস্ত্রিত মনে হয়, বেশি নড়াচড়া করে, ঘনঘন শুয়ে পড়ে ও উঠে দাঁড়ায়, পেটের দিকে তাকায় ও পিছনের পা দিয়ে পেটে আঘাত করে, গড়াগড়ি দেয়, ডাকাডাকি করে। শরীরে খণ্ডিজাতীয় উপাদানের (যেমন— সোডিয়াম ক্লোরাইড, কোবাল্ট, ফসফরাস ইত্যাদি) অভাব হলে পশু অখাদ্য বস্তু, যেমন— কাপড়, জুতো ইত্যাদি খাওয়ার চেষ্টা করে। আবার জলাতঙ্ক হলে পশু উদ্বেজিত ও আক্রমণাত্মক হয়।

পারিপার্শ্বিক উদ্বীপক অসুস্থ পশুকে উদ্বেলিত করে না।

খ. গলার স্বর (Voice) : কিছু কিছু রোগ, যেমন— জলাতক্ষ, হলে পশুর গলার স্বর পরিবর্তিত হয়। শরীরে তীব্র ব্যথা হলে পশু অনুচ্ছ স্বরে দীর্ঘক্ষণ ডাকতে থাকে।

গ. খাদ্য গ্রহণ (Eating) : অসুস্থ পশুতে রংচিহীনতা দেখা দেয়। মুখগহরে কোনো ক্ষত থাকলে, অন্নালি সংকুচিত হলে অথবা অন্নালির উপরে অবস্থিত গহরের অর্থাৎ গলবিল বা ফ্যারিংস অবশ্য (Pharyngeal Paralysis) হলে পশু খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না।

ক্ষুরারোগ, বাদলা, সন্ধিচ্ছুতি
অথবা পায়ের হাড় ভেঙে গেলে
পশু খাঁড়িয়ে হাঁটে।

ঘ. চালচলন ও ভঙ্গি (Gait & Posture) : পশুর চালচলন ও ভঙ্গি দেখে শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। যেমন— কোনো পশু খাঁড়িয়ে হাঁটলে তা প্রধানত পায়ের স্নায়, পেশি, অস্থি বা অস্থিসন্ধির রোগ নির্দেশ করে। উদাহরণ স্বরূপ ক্ষুরারোগ, বাদলা, সন্ধিচ্ছুতি অথবা পায়ের হাড় ভেঙে গেলে পশু খাঁড়িয়ে হাঁটে। পেটে ব্যথা হলে পিঠ কুঁজো করে রাখে, মাথা ঘোরা বা গিড রোগ (Gid Disease) হলে পশু বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে। বুকে ব্যথা অথবা শ্বাসকষ্ট হলে পশু সামনের দুপা বাইরের দিকে সম্প্রসারিত করে। টিটেনাস (Tetanus) হলে লেজ, কান, ঘাড় ইত্যাদি শক্ত হয়ে যায়। তারকাটাজাতীয় জিনিস খাদ্যের সঙ্গে পাকস্থলীতে প্রবেশ করলে পশু মেরণ্দন ধনুকাকৃতি ও পেট টান করে রাখে। মলঘার, যোনঘার প্রভৃতি অঙ্গে ব্যথা অনুভূত হলে লেজ উঁচিয়ে রাখে। দুঃখজ্বর (গরমশতবাবৃৎ) হলে গরু শোয়া অবস্থায় মাথা বুকের দিকে বাঁকিয়ে রাখে। ম্যাগনেসিয়ামের ঘাটতিজনিত টিটেনি রোগ (Grass Tetany) হলে গরু পার্শ্বদিকে শুয়ে (Lateral Recumbancy) চার হাতপা ছাড়িয়ে রাখে এবং এর মাথা ধনুকের মতো বেঁকে যায়।

সুস্থ পশুর ত্বক মসৃণ। অসুস্থ
পশুর লোম উসকোখুশকো হয়।

সুস্থ ও সবল পশুতে মাজেল
সর্বদা ঘর্মাক্ত থাকে।

ঙ. ত্বক (Skin) : ত্বকের অবস্থা প্রত্যক্ষ করেও কোনো কোনো রোগ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। সাধারণত সুস্থ পশুর ত্বক মসৃণ থাকে। অসুস্থ পশুর লোম উসকোখুশকো থাকে। অধিক শীতে অথবা জ্বরে পশুর লোম খাড়া হয়ে যায়। দাদ, ফোঁড়া, ক্ষত ইত্যাদি হলে দূর থেকে সহজে অনুমান করা যায়।

চ. বিবিধ : অসুস্থ পশু সাধারণত নিজীব থাকে। মশামাছি গায়ে বসলে মাথা, কান বা লেজ দিয়ে তাঢ়ায় না। পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায় না। মুখের উপরে ঠেঁটের লোমবিহীন অংশ বা মাজেল (Muzzle) শুক হয়ে যায়। সুস্থ ও সবল পশুতে মাজেল সর্বদা ঘর্মাক্ত থাকে। অসুস্থ পশুর জাবরকাটা বন্ধ হয়ে যায় এবং দৈহিক অবস্থার অবনতি ঘটে। দীর্ঘস্থায়ী রোগের কারণে, যেমন— পুষ্টিহীনতা বা কৃমির আক্রমণে, পশু দুর্বল হয়ে পড়ে।

পশুর নিরানিক বা ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা (Clinical Examination)

এ পরীক্ষার সময় অধিকাংশ পশু বিরক্তি বোধ করে এবং প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। এ কারণে এসব পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য পশুকে ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। ক্যাটেল শূট (Cattle Chute), লিপ টুইচ (Lip Twitch) প্রভৃতি ব্যবহার করে পশুকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তাছাড়া গরুর



চিত্র ১ : ক্লিনিক্যাল পরীক্ষার জন্য ক্যাটেল শূটে পশু নিয়ন্ত্রণ

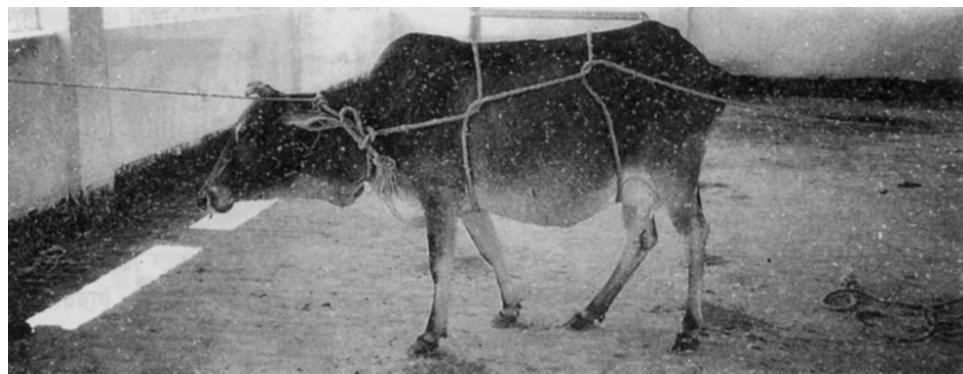


চিত্র ২ : ক্লিনিক্যাল পরীক্ষার জন্য লিপ টুইচ ফ্লারা পশু নিয়ন্ত্রণ

পাশে দাঁড়িয়ে মাথা ও শিং শক্তভাবে ধরে পশুকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এছাড়া উত্তেজিত ও চথ্বল পশুকে দড়ি দিয়ে মাটিতে ফেলে (Casting) নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এখানে বিভিন্ন নির্দানিক বা ক্লিনিক্যাল পরীক্ষার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হয়েছে।



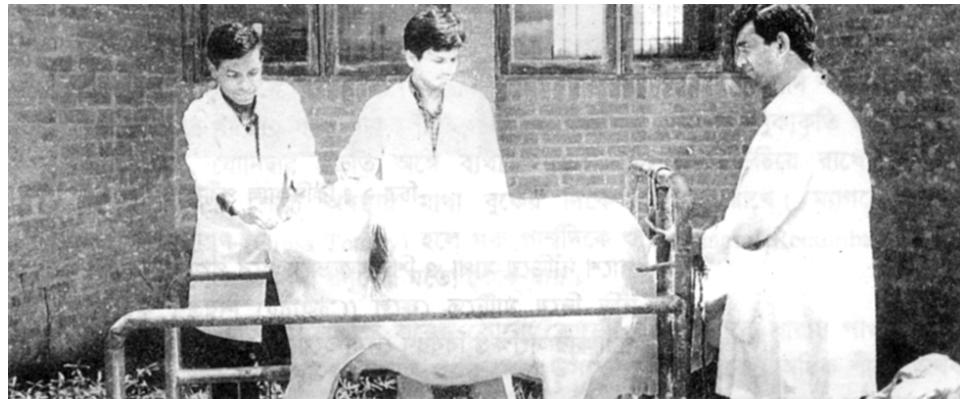
চিত্র ৩ : শিং ও মাথা ধরে পশু নিয়ন্ত্রণ



চিত্র ৪ : দড়ি বেঁধে মাটিতে ফেলে পশু নিয়ন্ত্রণ

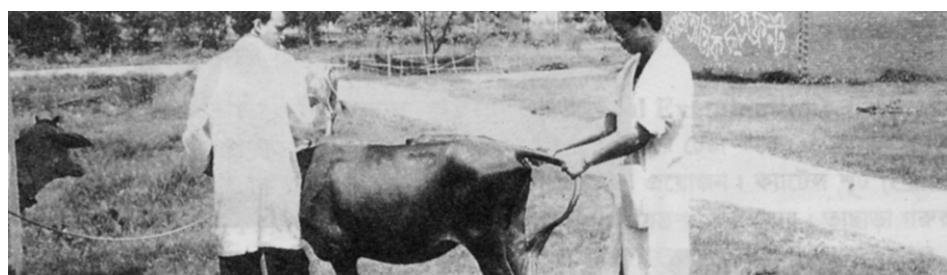
সুস্থ গরুর দৈহিক তাপমাত্রা
৩৮.৩°—৩৮.৯° সেলসিয়াস বা
১০১°—১০২° ফারেনহাইট।

ক. মলাশয়ের তাপমাত্রা (Rectal Temperature) : মানুষের ন্যায় বিভিন্ন প্রজাতির গবাদিপশুর দেহেও নির্দিষ্ট তাপমাত্রা রয়েছে। মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসে (Hypothalamus) অবস্থিত কেন্দ্রীয় তাপ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র (Thermoregulatory Centre) বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও নির্দিষ্ট তাপমাত্রা রক্ষা করে। একটি সুস্থ গরুর দৈহিক তাপমাত্রা ৩৮.৩°—৩৮.৯° সেলসিয়াস (১০১°—১০২° ফারেনহাইট)। দেহের এ উভাপের হ্রাস-বৃদ্ধি পশুর অসুস্থতা নির্দেশ করে। সাধারণত ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, মাইকোপ্লাজমা, ক্ল্যামাইডিয়া, ছত্রাক ইত্যাদি জীবাণু এবং প্রোটোজোয়া ও অন্যান্য পরজীবীর মারা সৃষ্টি রোগে দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। ক্ষুদ্রাকার পশুর শরীরের তাপমাত্রা বৃহদাকার পশুর চেয়ে বেশি থাকে। দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা সকাল থেকে বিকেলে বেশি থাকে।



চিত্র ৫ : মলাশয় থেকে গাভীর দেহের তাপমাত্রা নির্ণয়

হৎপিন্ডের প্রতি স্পন্দনে রক্ত ধমনির মাধ্যমে সারা শরীরে সঞ্চালিত হয়। প্রতি স্পন্দনে সৃষ্টি রক্ত প্রবাহ ধমনির দেয়ালে ধাক্কা দেয় যা পশুর শরীরের নির্দিষ্ট স্থানে হাত রেখে অনুমান করা যায়। বিভিন্ন প্রজাতির পশুর নাড়ির গতির হার বিভিন্ন। কোনো পশুর নাড়ির গতি সম্বন্ধে ধারণা থাকলে এই পশুর হৎপিন্ডের কার্যকারিতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।

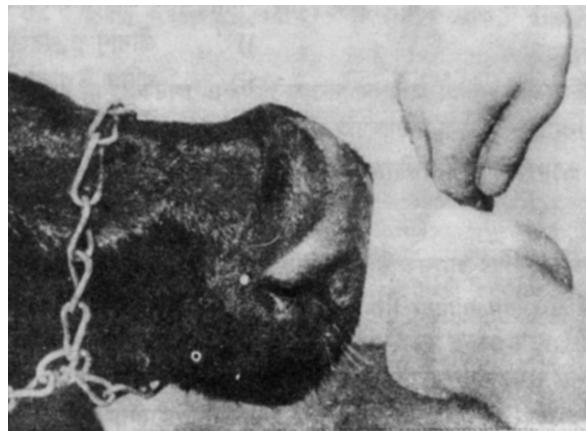


চিত্র ৬ : লেজের ধমনি থেকে গরুর নাড়ির গতি নির্ণয়



চিত্র ৭ : চোয়ালের ধমনি থেকে ঘোড়ার নাড়ির গতি নির্ণয়

গ. শ্বাসপ্রশ্বাসের হার (Respiratory Rate) : কোনো একটি পশু প্রতি মিনিটে যতবার শ্বাস গ্রহণ অথবা ত্যাগ করে তাই হচ্ছে সে পশুর শ্বাসপ্রশ্বাসের হার।



চিত্র ৮ : গবাদিপশুর শ্বাসপ্রশ্বাসের হার নির্ণয়

শারীরিক পরীক্ষা (Physical Examination)

শারীরিক পরীক্ষা তিনভাগে বিভক্ত। নিম্নে এগুলো বর্ণনা করা হলো—

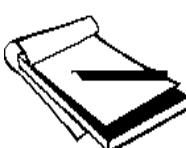
ক. পালপেশন (Palpation) : পালপেশনের মাধ্যমে শরীরের অভ্যন্তরীণ অঙ্গস্থানের আকৃতি ও প্রকৃতি নির্ণয় করা যায়। এ পদ্ধতিতে পশুর দেহের বিভিন্ন অংশে হাতের আঙুলের সাহায্যে চাপ দিলে এ স্থানের দৃঢ়তা, বেদনানুভূতি, স্থানিক পরিবর্তন প্রভৃতি অনুমান করা যায়। যেমন— বাদলা রোগে আক্রান্ত স্থান পালপেট করলে পুরুপুর শব্দ হয় এবং পশু ব্যথা অনুভব করে। ক্ষুদ্র আকারের পশু, যেমন— ছাগল, ভেড়া, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি প্রাণীতে যকৃত, প্লীহা, পাকষ্ঠলী, জরায়ু, মূত্রাশয় প্রভৃতি অঙ্গের অস্থাভাবিকতা নির্ণয় করা যায়।

খ. পারকাশন (Percussion) : শরীরের বিভিন্ন অংশে হাত দিয়ে মৃদু আঘাত করলে যে শব্দ সৃষ্টি হয় তা অনেকক্ষেত্রে রোগ নির্ণয়ে সহায় হয়। প্রধানত বুক এবং পেটে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। এ পরীক্ষার মাধ্যমে অনেকক্ষেত্রে দেহাভ্যন্তরের অস্থাভাবিক অবস্থা বোঝা যায়। উদাহরণস্বরূপ, পাকষ্ঠলী বা অন্ত্র গ্যাস গ্লারা স্ফীত হলে এই পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে তা সহজেই নির্ণয় করা যায়।

গ. অক্ষালটেশন (Auscultation) : এ পদ্ধতি প্রয়োগে শরীরের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অঙ্গের কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে সৃষ্টি শব্দ শ্ববণের মাধ্যমে সেসব অঙ্গের অস্থাভাবিকতা নিরূপণ করা হয়। এ পরীক্ষার গ্লারা প্রধানত হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, পাকষ্ঠলী, অন্ত্র প্রভৃতি অঙ্গের কার্যক্রম পরীক্ষা করা হয়। স্টেথোস্কোপের (Stethoscope) সাহায্যে এ পরীক্ষা করা হয়। শাস্ত পশুতে শরীরের নির্দিষ্ট স্থানে কান লাগিয়েও এ পরীক্ষা করা যায়।

পালপেশনের মাধ্যমে শরীরের অভ্যন্তরীণ অঙ্গস্থানের আকৃতি ও প্রকৃতি নির্ণয় করা যায়।

প্রধানত বুক এবং পেটে পারকাশন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।



অনুশীলন (Activity) : আপনার এলাকার গবাদিপশুতে যেসব রোগ দেখা যায় বলে আপনি মনে করেন সেগুলোর লক্ষণ ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখুন।

সারমর্ম : মানুষের জীবনে গবাদিপশুর গুরুত্ব অপরিসীম। প্রতিবছর অসংখ্য গবাদিপশু চিকিৎসার অভাবে মারা যায়। এদেরকে রক্ষার জন্য সঠিক রোগ নিরূপণ এবং সে অনুসারে চিকিৎসা প্রদান অপরিহার্য। পশুর রোগসংক্রান্ত বর্তমান ও অতীত ইতিহাস, পশুর আচরণ, গলার স্বর, খাদ্য গ্রহণ, চালচলন ও ভঙ্গি, ত্বকের অবস্থা সম্পর্কিত তথ্যাদি রোগ নির্ণয়ে সহায়তা করে। তাছাড়া দেহের তাপমাত্রা, শ্বাসপ্রশ্বাস ও নাড়ির গতির হার, পালপেশন, পারকাশন ও অক্ষালটেশনের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে পশুর রোগ নিরূপণ করা হয়।



পাঠোভর মূল্যায়ন ১.১

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

- ক. গবাদিপশুর শরীরে কখন জর দেখা দেয়?
- i) জীবাণু ও পরজীবীর সংক্রমণ হলে
 - ii) খণিজ উপাদানের অভাব হলে
 - iii) কৃমির আক্রমণ হলে
 - iv) পুষ্টিহীনতা হলে

খ. গবাদিপশুর শরীরের কোন্ স্থান থেকে তাপমাত্রা নির্ণয় করা হয়?

- i) মুখগহ্বর
- ii) নাসিকারক্তু
- iii) মলগ্নার
- iv) যোনিগ্নার

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. শরীরে খণিজ উপাদানের অভাব হলে পশু অখাদ্য বস্তু খায়।

খ. জলাতঙ্ক রোগে পশুর গলার স্বর পরিবর্তিত হয়।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. সুস্থ পশুর ত্বক _____ থাকে।

খ. লিপ টুইচ ব্যবহার করে পশু _____ করা যায়।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. কোন্ রোগে আক্রান্ত হলে পশু উত্তেজিত হয়?

খ. বাদলা রোগে আক্রান্ত স্থান পালপেট করলে কী হয়?

পাঠ ১.২ গবাদিপশুর অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা



এ পাঠ শেষে আপনি –

- রেডিওগ্রাফির সাহায্যে অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা করে যেসব রোগ নির্ণয় করা যায় সেগুলোর নাম বলতে পারবেন।
- মলাশয় পরীক্ষা বা রেকটাল এক্সামিনেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিভিন্ন রোগব্যাধি নির্ণয় কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে পারবেন।
- মুখগহুর, চোখ ও কান পরীক্ষাসংক্রান্ত নানা তথ্যাদি সম্পর্কে লিখতে পারবেন।



কিছু রোগ বাহ্যিক পরীক্ষা, কিছু রোগ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় পরীক্ষার মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে নির্ণয় করা হয়।

রঞ্জনরশ্মি বা এক্স-রে (X-ray) প্রয়োগের মাধ্যমে দেহাভ্যন্তরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ছবি গ্রহণকে রেডিওগ্রাফি বলে।

গবাদিপশুর রোগ নির্ণয়ের লক্ষ্যে পূর্ববর্তী পাঠে বাহ্যিক পরীক্ষাসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এসব বিষয় প্রধানত সাধারণ পরীক্ষার (General Examination) আওতাধীন। অনেক রোগ রয়েছে যেগুলো বাহ্যিক পরীক্ষার মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করে চূড়ান্তভাবে নির্ণয় করা হয়। আবার অনেক রোগ বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ উভয় পরীক্ষার মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে নির্ণয় করা হয়। তাছাড়া পরীক্ষাগারে নমুনা পরীক্ষার মাধ্যমেও অনেক রোগ চূড়ান্তভাবে নির্ণয় করা হয়। এ বিষয়ে পরবর্তী পাঠে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ পরীক্ষাকে অনেক সময় বিশেষ পরীক্ষা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এসব পরীক্ষার মাধ্যমে শরীরের অভ্যন্তরে অদৃশ্য বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অস্বাভাবিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হয়। এখানে রোগ নির্ণয়ে কিছু অভ্যন্তরীণ গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ক. রেডিওগ্রাফি (Radiography) : রঞ্জনরশ্মি বা এক্স-রে (X-ray) প্রয়োগের মাধ্যমে দেহাভ্যন্তরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ছবি গ্রহণকে রেডিওগ্রাফি বলে। ডেরিউট. সি. রঞ্জন (W. C. Rontgen) নামক একজন বিজ্ঞানী ১৮৯৫ সালে এ রশ্মি আবিক্ষার করেন এবং তাঁরই নামানুসারে এর নাম দেয়া হয় রঞ্জন রশ্মি। এ আবিক্ষারের ফলে রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। রেডিওগ্রাফির মাধ্যমে গৃহীত ছবি পর্যালোচনা করে বিভিন্ন রোগাবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। এ পরীক্ষার মাধ্যমে হাড়ভাস্তু (Fracture), সন্দিচ্ছুতি (Dislocation), পাকস্থলীতে ধাতব পদার্থের উপস্থিতি, মৃত্যুপাথর, পিন্টপাথর, লালা গ্রহণ পাথর, পৌষ্টিকনালির ক্ষত, টিউমার প্রভৃতি রোগ চূড়ান্তভাবে নির্ণয় করা যায়। তাছাড়া হৎপিণ্ড, ফুসফুস, যকৃত, পিণ্ডা, বৃক্ত, কেন্দ্রীয় ম্যায়ুতন্ত্র প্রভৃতি অঙ্গের অস্বাভাবিক অবস্থা নিরীক্ষা করা যায়।

সম্প্রতি চিকিৎসা অঙ্গে আল্ট্রাসনোগ্রাফি (Ultrasonography) প্রয়োগের ফলে রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এক বিপুল সাধিত হয়েছে। এ পদ্ধতিতে তাংক্ষণিকভাবে টেলিভিশনের পর্দায় রোগীর অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অবস্থা প্রতিফলিত হয়। বাংলাদেশে মানুষের চিকিৎসায় এ প্রযুক্তি ব্যাপকভাবে আদৃত হলেও পশুতে এর ব্যবহার এখনও শুরু হয় নি।

খ. মলাশয় পরীক্ষা (Rectal Examination) : ভেটেরিনারি (Veterinary) বা পশু চিকিৎসা পেশায় রেকটাম বা মলাশয় পরীক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। মাঠপর্যায়ে এ পরীক্ষা ব্যাপকভাবে প্রচলিত।



চিত্র ৯ : রেকটাল পরীক্ষার মাধ্যমে গবাদিপশুর রোগ নির্ণয়

ডেটেরিনারি বা পশুচিকিৎসা
পেশায় মলাশয় পরীক্ষার গুরুত্ব
অপরিসীম। মাঠ পর্যায়ে এ
পরীক্ষা ব্যপকভাবে প্রচলিত।

বৃহদাকার পশু, যেমন— গরু, মহিষ, ঘোড়া প্রভৃতি পশুর পৌষ্টিক, মূত্র ও জননতন্ত্রের রোগব্যাধি নিরূপনে রেকটাল পরীক্ষা অত্যন্ত কার্যকর। এ পরীক্ষায় মলাশয়ে হাত চুকিয়ে পেটের অভ্যন্তরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অস্থাভাবিক অবস্থা সরাসরি পরীক্ষা করা হয়।

পরীক্ষা পদ্ধতি—

- ◆ প্রথমে পশুকে ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করে নিতে হবে। এ পরীক্ষার জন্য যথাসম্ভব ক্যাটল শূট ব্যবহার করতে হবে।
- ◆ প্লাস্টিকের লম্বা পিভের গ্লোভস যে কোনো একটি হাতে পড়তে হবে। পশুর দেহ থেকে সম্ভাব্য জীবাণু সংক্রমণ রোধ করার জন্য গ্লোভস (Gloves) ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া গ্লোভস ব্যবহার করলে হাতে কোনো মল বা পায়খানা লাগে না। তবে গ্লোভসবিহীন হাত ফ্লারাও এ পরীক্ষা করা যায়।
- ◆ রেকটাল পরীক্ষার সময় পরিহিত পোশাক যেন নোংরা না হয় সেজন্য এপ্রোন এবং পশুর ক্ষুরের চাপা থেকে পরীক্ষাকারীর পা রক্ষার জন্য হাটু পর্যন্ত উঁচু রাবার বুট পরতে হবে।
- ◆ পরিহিত গ্লোভ ভালোভাবে ভ্যাসিলিন, তরল সাবান অথবা খণ্ডিজ তেল দিয়ে পিছিল করে নিতে হবে। এতে গ্লোভসহ হাত সহজেই মলনালিতে প্রবেশ করতে পারে।
- ◆ মলনালিতে হাত প্রবেশের সময় পশু সাধারণত পায়খানা ও প্রস্তাব করে। তবে স্বেচ্ছায় কোনো পশু পায়খানা না করলে মলনালি থেকে হাত দিয়ে পায়খানা ফেলে দিতে হবে। উল্লেখ্য, মলনালি পায়খানা দিয়ে পূর্ণ থাকলে সঠিকভাবে রেকটাল পরীক্ষা করা যায় না।
- ◆ মলাশয়ে হাত প্রবেশের পর একগুচ্ছ ও সাবধানতার সাথে আঙুল দিয়ে বিভিন্ন অঙ্গের অস্থাভাবিক অবস্থা পালপেশনের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

রেকটাল পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন তন্ত্রের যেসব প্রধান প্রধান রোগ নির্ণয় করা যায় তা এখানে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন—

পৌষ্টিকতন্ত্র (Digestive System)

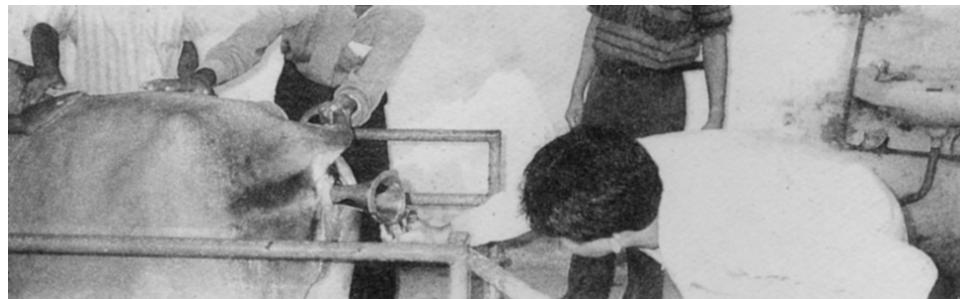
এ তন্ত্রের আওতায় মলনালির শিথিলতা (Rectal Paralysis), আন্ত্রিকপ্রদাহ (Enteritis), অন্ত্রের স্ফীতি (Intestinal Distension), অন্ত্রের প্যাচ খাওয়া (Volvulus), অন্ত্রের এক অংশ অন্য অংশের মধ্যে প্রবেশ করা (Intrasusception), টিউমার, সিকাম শক্ত হয়ে যাওয়া (Caecal Impaction), পাকস্তলীর স্থানচ্যুতি (Abomasal Displacement), রংমেন শক্ত হওয়া (Ruminal Impaction), রংমেনের নিশ্চলতা (Ruminal Atony) প্রভৃতি রোগ রেকটাল পরীক্ষার মাধ্যমে নিরূপন করা যায়।

জননতন্ত্র (Reproductive System)

জননতন্ত্রের নিষিদ্ধিত অঙ্গের রোগ পরীক্ষা করা হয়। যথা—

ডিম্বাশয় (Ovary)— স্ত্রী পশুতে দুটো ডিম্বাশয় থাকে। রেকটাল পরীক্ষার মাধ্যমে ডিম্বাশয়ের সিস্ট (Ovarian Cyst), টিউমার, আকৃতি, প্রকৃতি এবং কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয়।

জরায়ু (Uterus) — জরায়ুপ্রদাহ (Metritis), জরায়ু পাকা (Pyometra), টিউমার প্রভৃতি রোগ পরীক্ষা করা যায়। ভ্যাজাইনাল স্পেকুলাম ব্যবহার করে এসব রোগ পরীক্ষা করা হয়।



চিত্র ১০ : ভ্যাজাইনাল স্পেকুলামের মাধ্যমে ঘোনি ও জরায়ুগ্রীবার রোগ নির্ণয়

জরায়ুগীবা (Cervix)— জরায়ুগীবাপ্রদাহ (Cervicitis), জরায়ুগীবা শক্ত হয়ে ঘাওয়া (Cervical Fibrosis), টিউমার প্রভৃতি রোগ নির্ণয় করা যায়।

জনসম্পর্কিত পরীক্ষা (Fetal Examination)— গাভী গর্ভবতী (Pregnant) কি—না, গর্ভপাত (Abortion) হয়েছে কি—না, জরায়ুতে জনের অবস্থান (Fetal Presentation and Position) সঠিক আছে কি—না, জন জীবিত কি মৃত, জনের বিভিন্ন রোগবস্থা, যেমন— হাইড্রোসেফালাস (Hydrocephalus), এমফাইসিমা (Emphysema) প্রভৃতি অবস্থা রেকটাল পরীক্ষার মাধ্যমে নিরূপণ করা যায়।

যোনি (Vagina)— ভ্যাজাইনাল স্পেকুলাম (Vaginal Speculum) ব্যবহার করে যোনি এবং জরায়ুর মুখ (Uterine Os) পরীক্ষা করা হয়।

পরীক্ষা পদ্ধতি (Examination Procedure)—

- ◆ পরীক্ষককে প্রথমে এপ্রোন ও উঁচু বুট পড়তে হবে।
- ◆ গাভীকে ক্যাটল শূটে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- ◆ ভ্যাজাইনাল স্পেকুলাম যন্ত্রিত দুটো চোয়ালের বহিরাংশ ভ্যাসলিন বা অন্য কোনো তৈলাক্ত পদার্থ গ্লারা পিছিল করে নিতে হবে।
- ◆ যন্ত্রিত চোয়াল দুটো একত্র করে সতর্কতার সাথে যোনিতে প্রবেশ করাতে হবে। অতঃপর চোয়াল দুটো ধীরে ধীরে প্রসারিত করলে যোনির দেয়াল ও জরায়ুগীবা সহজেই দৃশ্যমান হবে। আলোর অপর্যাপ্ততা হলে টর্চ ব্যবহার করা যায়। এ পরীক্ষার মাধ্যমে যোনি দেয়ালের ক্ষত, রক্তপাত, গুটি (Nodule), প্রদাহ (Vaginitis), টিউমার, যোনির সংকীর্ণতা প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করা যায়। তাছাড়া জরায়ুগীবার মুখ উন্মুক্ত কি বন্ধ তাও দেখা যায়। জরায়ুগীবার মুখে রক্ত, পুঁজ বা অতিরিক্ত শ্লেষ্মার উপস্থিতি পরীক্ষা করা যায়। আবার কোনো পশুর যোনি ও মলনালির সংযুক্তি (Rectovaginal Fistula) ঘটলে যোনিতে পায়খানা দেখা যেতে পারে।

রেকটাল পরীক্ষার মাধ্যমে বৃক্কের আকৃতি ও প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করা যায়।

মুদ্রতন্ত্র (Urinary System)

রেকটাল পরীক্ষার মাধ্যমে বৃক্কের আকৃতি ও প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করা যায়। বৃক্কপ্রদাহ (Nephritis), হাইড্রোনেফ্রোসিস (Hydronephrosis), পাইলোনেফ্রাইটিস (Pyelonephritis), টিউমার প্রভৃতি রোগে বৃক্কের আকার বড় হয়। এছাড়া এ পরীক্ষার মাধ্যমে মুদ্রতন্ত্রের টিউমার নির্ণয় করা যায়।

মুখগহর পরীক্ষা (Examination of Buccal Cavity)

রোগ নির্ণয়ে মুখগহরের পরীক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুখগহরে কোনো কঁটা বিধলে, ক্ষত হলে বা কোনো প্রদাহ হলে খাদ্য গ্রহণ বন্ধ হয়ে যায়। ক্ষুধামন্দা এবং লালা পড়া এ দুটো লক্ষণ দেখা গেলে পশুর মুখগহরের পরীক্ষা করা আবশ্যিক। তবে জলাতক্ষ রোগ সন্দেহ হলে মুখগহরের পরীক্ষা বর্জন করা উচিত।



ক



খ

চিত্র ১১ : পশুর মুখগহরের পরীক্ষা

গবাদিপশুর দৃষ্টিশক্তিসংক্রান্ত
সমস্যা অপেক্ষাকৃত কম।

চক্ষু পরীক্ষা

(Examination of Eye)

গবাদিপশুর দৃষ্টিশক্তিসংক্রান্ত সমস্যা অপেক্ষাকৃত কম। অফথ্যালমোস্কোপ (Ophthalmoscope) যন্ত্রের সাহায্যে চোখের অভ্যন্তরীণ অংশের অস্থাভাবিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হয়। বাংলাদেশে গবাদিপশুর ক্ষেত্রে এ যন্ত্রের প্রয়োগ এখনও শুরু হয় নি।



চিত্র ১২ : অপথ্যালমোস্কোপের সাহায্যে পশুর চোখ পরীক্ষা

কান পরীক্ষা (Examination of Ear)

গবাদিপশুতে চোখের ন্যায় কানের সমস্যাও কম। তবে, কুকুরে কান পাকা (Otorrhoea) রোগ প্রায়ই দেখা যায়। ইয়ার স্পেকুলাম (Ear Speculum) যন্ত্রের সাহায্যে কানের অভ্যন্তরীণ অংশের প্রদাহ, রক্তপাত (Haemorrhage), ফরেন বডিং (Foreign Body) উপস্থিতি প্রত্তি বিষয় পর্যবেক্ষণ করা যায়।



চিত্র ১৩ : অটোকোপের সাহায্যে পশুর কান পরীক্ষা



অনুশীলন (Activity) : মলাশয় পরীক্ষার মাধ্যমে কী কী তন্ত্রের রোগ নির্ণয় করা হয়? এগুলোর নাম লিখুন।



সারমর্ম : অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার মাধ্যমে দেহাভ্যন্তরের অদ্ধ্য বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের রোগব্যাধি ও অস্থাভাবিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হয়। এসব পরীক্ষার মধ্যে রেডিওগ্রাফি ও রেকটাল পরীক্ষা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। রেডিওগ্রাফির সাহায্যে শরীরের অভ্যন্তরের বিভিন্ন অংশের ছবি গ্রহণ ও তা পর্যালোচনা করে বিভিন্ন রোগব্যাধি নির্ণয় করা হয়। অন্যদিকে, রেকটাল পরীক্ষার ফ্লারা পৌষ্টিক, জনন ও মৃত্যুতন্ত্রের বিভিন্ন রোগব্যাধি পালপেশনের মাধ্যমে সরাসরি পরীক্ষা করা হয়। এছাড়া ভ্যাজাইনাল স্পেকুলাম, অফথ্যালমোস্কোপ এবং ইয়ার স্পেকুলাম ব্যবহার করে যথাক্রমে ঘোনি, চোখ ও কানের রোগাবস্থা প্রত্যক্ষ করা হয়।



পাঠোভর মূল্যায়ন ১.২

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. কোন্‌ রশ্মি ব্যবহার করে দেহের বিভিন্ন অঙ্গের ছবি গ্রহণ করা হয়?

- i) গামা রশ্মি
- ii) আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি
- iii) রঞ্জন রশ্মি
- iv) লেসার রশ্মি

খ. কোন্টি বৃক্ষের রোগ?

- i) হাইড্রোসেফালাস
- ii) সার্ভিসাইটিস
- iii) মেটাইটিস
- iv) হাইড্রোনেফ্রোসিস

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. রেডিওগ্রাফির সাহায্যে পাকস্ত্রীতে ধাতব পদার্থের উপস্থিতি নির্ণয় করা যায়।

খ. জলাতক্ষ রোগে মুখগহ্বর পরীক্ষা করা উচিত নয়।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. যৌন পরীক্ষার জন্য ভ্যাজাইনাল _____ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

খ. অন্ত্রের প্যাঁচ খাওয়াকে _____ বলে।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. কোন্ বিজ্ঞানী রঞ্জন রশ্মি আবিক্ষার করেন?

খ. কোন্ রোগে জরায়ুতে পুঁজ হয়?

পাঠ ১.৩ পরীক্ষাগারে বিভিন্ন নমুনা পরীক্ষা



এ পাঠ শেষে আপনি –

- গবাদিপশুর পায়খানা সংগ্রহ করা ও এ সংক্রান্ত বিভিন্ন পরীক্ষা সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- পশুর প্রস্তাব সংগ্রহ ও এ সংক্রান্ত বিভিন্ন পরীক্ষা বর্ণনা করতে পারবেন।
- পশুর শরীর থেকে রক্ত সংগ্রহ করার কৌশল এবং রক্তের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।



পায়খানা পরীক্ষা (Examination of Stool/Faeces)

পায়খানার নমুনা সংগ্রহ (Collection of Faecal Sample)

পশুর মলনালিতে সরাসরি আঙুল চুকিয়ে পায়খানার নমুনা সংগ্রহ করা যায়। পশুর ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে ডান হাত দিয়ে লেজ উঁচু করে ধরতে হবে এবং বাম হাত অথবা হাতের আঙুল মলনালিতে প্রবেশ করিয়ে পায়খানা সংগ্রহ করা যায়। প্রয়োজনে একজন সহকারী ফ্লারা অথবা ক্যাটল শূট (Cattle Chute) ব্যবহার করে পশু নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। আবার সদ্য ত্যাগ করা পায়খানার উপর থেকে নমুনা সংগ্রহ করা যেতে পারে। সংগৃহীত নমুনা অন্তিবিলম্বে পরীক্ষা করতে হবে।

ময়লায়ুক্ত পায়খানা পরীক্ষা করা অনুচিত। কারণ, এরূপ নমুনা থেকে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। সংগৃহীত নমুনা ক্ষুদ্র কাঁচের পাত্র, পলিথিন কাগজ অথবা কচুর পাতায় ভালোভাবে জড়িয়ে পরীক্ষাস্থলে নিতে হবে। খবরের কাগজ, টিসু পেপার অথবা পানি শোষণ করে এমন কোনো জিনিস এ কাজে ব্যবহার করা যাবে না।

স্থূল পরীক্ষা (Gross Examination)

এ পরীক্ষা ফ্লারা পায়খানার পরিমাণ, বর্ণ, গন্ধ ও গঠন নিরীক্ষা করা হয়। যেমন—

পরিমাণ (Quantity) : কোনো পশুর ত্যাগকৃত পায়খানার পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি না কর্ম তা পর্যবেক্ষণ করা হয়।

বর্ণ (Colour) : বিভিন্ন প্রজাতির পশুর পায়খানার বর্ণ বিভিন্ন, যেমন— গরুমহিষের পায়খানার স্বাভাবিক রঙ গাঢ় সবুজ। পায়খানার এ স্বাভাবিক বর্ণ বিভিন্ন রোগের কারণে পরিবর্তিত হতে পারে। যেমন— মলনালিতে ক্ষত থাকলে পায়খানার সাথে তাজা রক্ত মিশ্রিত থাকে। ক্ষুদ্রান্ত্রে ক্ষতের কারণে রক্তপাত হলে পায়খানার বর্ণ কালো হয়।

গন্ধ (Odour) : বিভিন্ন পশুর পায়খানার গন্ধ বিভিন্ন। বিভিন্ন রোগের কারণে পায়খানার স্বাভাবিক গন্ধের পরিবর্তন হতে পারে। বাচুরে কাফ ক্ষাওয়ার (Calf Scours) হলে পায়খানা অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হয়।

গঠন (Consistency) : পশুর পায়খানার গঠন সাধারণত অর্ধশক্ত। বিভিন্ন রোগ, যেমন— কলেরা, ডায়ারিয়া, অমাশয় ইত্যাদি হলে পায়খানা পাতলা হয়। পাতলা পায়খানা অন্ত্রের অতিসচলতা (Hypermotility) এবং কোষ্ঠকাঠিন্য অন্ত্রের নিশ্চলতা (Non-motility) নির্দেশ করে।

অণুবীক্ষণিক পরীক্ষা (Microscopic Examination)

এ পরীক্ষার সাহায্যে পায়খানার সাথে নির্গত কৃমির ডিমের বৈশিষ্ট্য উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হয়। বিভিন্ন প্রকার কৃমির ডিমের বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কৃমির ডিমের বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করে আক্রমণকারী কৃমি শণাক্ত করা যায়। কৃমির প্রজাতি শণাক্ত করা গেলে নির্দিষ্ট কার্যকরী কৃমিনাশক প্রয়োগ করা যায়।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ডিমের বৈশিষ্ট্য
দেখে আক্রমণকারী কৃমি
শণাক্ত করা যায়।

পরীক্ষা পদ্ধতি (Examination Method)

মল পরীক্ষার প্রধান পদ্ধতিগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো। যথা—

- ক. প্রত্যক্ষ পদ্ধতি (Direct Method)
- খ. ঘনত্ব পদ্ধতি (Concentration Method)
- গ. থিতানো পদ্ধতি (Sedimentation Method)
- ঘ. ম্যাকমাস্টার পদ্ধতি (McMaster Method)

এসব পদ্ধতির মধ্যে মাঠ পর্যায়ে প্রত্যক্ষ পদ্ধতি সর্বাধিক প্রচলিত বিধায় শুধু এ পদ্ধতিটিই সংক্ষেপে এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে।

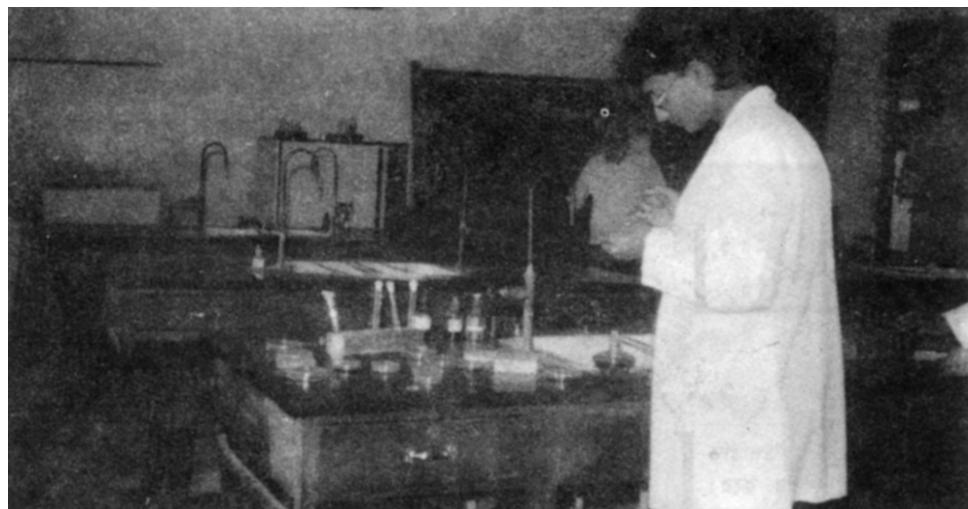
প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে মল পরীক্ষা

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. মলের নমুনা।
২. কাঁচের স্লাইড।
৩. কভার স্লিপ।
৪. সামান্য পানি।
৫. একটি সরু কাঠি (১২.৫-১৫.০ সে.মি. লম্বা)।
৬. অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

কাজের ধারা

- ◆ একটি স্বচ্ছ কাঁচের স্লাইডের মাঝাখানে কয়েক গ্রাম মল রাখুন।
- ◆ মলের উপর কয়েক ফোটা পানি দিন ও কাঠি দ্বারা ভালোভাবে মিশান।
- ◆ পানিমিশ্রিত মলে কোনো ভাসমান আঁশ থাকলে কাঠির সাহায্যে সাবধানে সরিয়ে ফেলুন।
- ◆ স্লাইডের উপরের তরল মল একটি কভার স্লিপ দিয়ে ঢেকে দিন। এতে মল পাইডের উপর সমানভাবে বিস্তৃত হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন কভার স্লিপ ও স্লাইডের মাঝে কোনো বুদ্ধিমত্তা না থাকে।



চিত্র ১৪ : গ্লাস স্লাইডে কাঠির সাহায্যে মলের স্মিয়ার তৈরি করা হচ্ছে

- ◆ এ পর্যায়ে পাইডটি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করুন।



চিত্র ১৫ : অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে মলের স্মিয়ার পরীক্ষা করা হচ্ছে

প্রস্তাব পরীক্ষা (Examination of Urine)

রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রস্তাব পরীক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। দেহাভ্যন্তরে অবস্থিত বৃক্কে (করফহর্ন) প্রস্তাব তৈরি হয় এবং ইউরেটারের (Ureter) মাধ্যমে তা মূত্রাশয়ে জমা হয়। মূত্রথলি সম্প্রসারিত হলে প্রস্তাবের বেগ অনুভূত হয় এবং মূত্রানালি (Urethra) দিয়ে তা বেরিয়ে আসে।

রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রস্তাব পরীক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

পশু প্রস্তাবরত অবস্থায় পরিষ্কার ও স্বচ্ছ বোতলে মূত্র সংগ্রহ করতে হবে।

মূত্রের নমুনা সংগ্রহ (Collection of Urine Sample)

পশু প্রস্তাবরত অবস্থায় পরিষ্কার ও স্বচ্ছ বোতলে মূত্র সংগ্রহ করতে হবে। বোতলে যেন কোনো ওষুধ বা রাসায়ানিক পদার্থ না থাকে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। পশুর পুরুষাঙ্গ এবং স্ত্রী জনন অঙ্গ মধ্য মর্দন করলে সাধারণত মূত্র নির্গত হয়। তাছাড়া রাবার ক্যাথেটারের (Catheter) সাহায্যে মূত্রাশয় থেকে সরাসরি নমুনা সংগ্রহ করা যায়। এছাড়া সিরিঞ্জ ও সুচের (Syringe and Needle) সাহায্যে স্কীত মূত্রাশয় থেকে প্রস্তাব সংগ্রহ করা যায়। এসব পদ্ধতিতে সংগৃহীত প্রস্তাবের গুণাগুণ পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে। একইসাথে একাধিক পশুর প্রস্তাব সংগ্রহ করার প্রয়োজন হলে বোতলের গায়ে সঠিক চিহ্ন দিতে হবে।

পরিমাণ (Quantity) : বিভিন্ন প্রজাতির, এমনকী একই প্রজাতির বিভিন্ন বয়স ও আকারের পশুতে, মূত্রের পরিমাণের তারতম্য ঘটে। সাধারণত সুস্থ পশুতে পানি গ্রহণের ওপর মূত্রের পরিমাণ নির্ভর করে। আবার বিভিন্ন রোগ, যেমন— ডায়াবেটিস হলে প্রস্তাবের পরিমাণ বেড়ে যায়।

আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific Gravity) : প্রস্তাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব এর ঘনত্বের সাথে সম্পর্কিত। সাধারণত প্রস্তাবের পরিমাণ কম হলে ঘনত্ব বেড়ে যায় এবং পরিমাণ বেড়ে গেলে ঘনত্ব কমে যায়। উদাহরণস্বরূপ, ক্রনিক ডিফিউজ নেফ্রাইটিস (Chronic Diffuse Nephritis) হলে আপেক্ষিক গুরুত্ব কমে যায় এবং ডায়াবেটিস হলে বেড়ে যায়। বিভিন্ন প্রজাতির পশুর প্রস্তাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.০১০—১.০৬০ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

বর্ণ (Colour) : ইউরোক্রোম (Urochrome) নামক এক প্রকার হলুদ পদার্থের উপস্থিতি প্রস্তাবের বর্ণ নির্ধারণ করে। প্রস্তাবের স্বাভাবিক রঙ হালকা অথবা গাঢ় হলুদ। বিভিন্ন রোগের কারণে এ স্বাভাবিক বর্ণের তারতম্য ঘটে। যেমন— জান্ডিস (Jaundice) হলে প্রস্তাবের বর্ণ হলুদ হয়। আবার পাইরোপ্লাজমোসিস (Piroplasmosis) হলে প্রস্তাব কফি বর্ণের হয়। অতিরিক্ত পানি পান করলে ঘনত্ব কমে যায় এবং প্রস্তাব অনেকটা বর্ণহীন হয়ে পড়ে। আবার দীর্ঘক্ষণ পানি পান করা থেকে বিরত থাকলে প্রস্তাবের ঘনত্ব বেড়ে যায় এবং অতিরিক্ত হলুদ হয়।

প্রস্তাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব ঘনত্বের সাথে সম্পর্কিত।

ইউরোক্রোমের উপস্থিতি প্রস্তাবের বর্ণ নির্ধারণ করে।
প্রস্তাবের স্বাভাবিক রঙ হালকা বা গাঢ় হলুদ।

স্বচ্ছতা (Transperancy) : স্বাভাবিক প্রস্তাব সাধারণত স্বচ্ছ হয়। তবে, বিভিন্ন রোগের কারণে এ স্বচ্ছতা ব্যতীত হতে পারে। প্রস্তাবে শ্লেষ্মা (Mucus), স্ফটিক দ্রব্য (Crystal), পুঁজ, রক্তকণিকা, জীবাণু ইত্যাদি উপস্থিতি থাকলে প্রস্তাব অস্বচ্ছ হয়ে পড়ে। ঘোড়ার সদ্য ত্যাগকৃত প্রস্তাব ঘোলাটে।

রাসায়নিক পরীক্ষা (Chemical Examination)

তংভোজী প্রাণীর প্রস্তাব ক্ষারযুক্ত অথবা মৃদু অস্কি। পক্ষান্তরে, মাংসাশি প্রাণীর প্রস্তাব অস্কি।

বিক্রিয়া (Ch⁺) : বিক্রিয়া বা P^H বলতে কোনো পদার্থের অল্পতা (Acidity) বা ক্ষারতা (Alkalinity) বুঝায়। তংভোজী পশু, যেমন— গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি প্রাণীর প্রস্তাব ক্ষারযুক্ত অথবা মৃদু অস্কি। পক্ষান্তরে, মাংসাশি প্রাণী, যেমন— কুকুর, বিড়াল প্রভৃতির প্রস্তাব অস্কি। বিভিন্ন রোগে বিভিন্ন প্রজাতির পশুর প্রস্তাবের অল্পতা ও ক্ষারতার মাত্রার তারতম্য ঘটে। মাঠ পর্যায়ে লিটমাস পেপার (Litmus Paper) ব্যবহার করে অতি সহজেই এ পরীক্ষা করা যায়। লাল লিটমাস প্রস্তাবের সংস্পর্শে এসে যদি নীল হয় এবং নীল লিটমাস লাল হয় তাহলে প্রস্তাবের বিক্রিয়া যথাক্রমে ক্ষারযুক্ত ও অস্কি বুঝায়। রঙের কোনো পরিবর্তন না হলে তা নিষ্ক্রিয় নির্দেশ করে। দীর্ঘক্ষণ খাদ্য গ্রহণ না করলে প্রস্তাবের অল্পতা বৃদ্ধি পায়।

প্রস্তাবের মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন উপকারী ও অপকারী পদার্থ বেরিয়ে যায়।

রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতি পরীক্ষা : প্রস্তাবের মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন উপকারী ও অপকারী পদার্থ বেরিয়ে যায়। উপকারী পদার্থের মধ্যে প্রোটিন, গুকোজ, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আবার ক্ষতিকারক পদার্থের মধ্যে রয়েছে ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, ক্রিয়েটিনিন, বিলিরংবিন ইত্যাদি। প্রস্তাবে এসব পদার্থের উপস্থিতির মাত্রা নিরূপণ করা যায়। কিন্তু এতদসংক্রান্ত পদ্ধতিসমূহ অপেক্ষাকৃত জটিল এবং এ স্তরে আলোচনা ততোটা অযোজনীয় নয় বিধায় তা এখানে উল্লেখ করা হলো না।

রক্ত পরীক্ষা (Examination of Blood)

প্রস্তাব এবং পায়খানা পরীক্ষার মাধ্যমে যেমন বিভিন্ন রোগের উপস্থিতি নির্ণয় করা যায় তেমনি রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে প্রাণ্তি তথ্যাদি রোগ নিরূপণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

রক্তের নমুনা সংগ্রহ (Collection of Blood Sample)

পশুর শরীরের অধিকতর ভাসমান শিরা থেকে সিরিঞ্জ ও নিউল গ্লারা রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া প্রভৃতি পশুতে ঘাড়ের উভয় পাশে অবস্থিত জুগ্নলার শিরা (Jugular Vein) থেকে রক্ত সংগ্রহ করা হয়। সংগ্রহীত রক্তের নমুনা জমাট রোধকারী পদার্থযুক্ত ও জীবাণুযুক্ত শিশিতে (ঠৰণৰ) রাখা হয়। সংগ্রহের ২৪ ঘন্টার মধ্যে পরীক্ষা করা সম্ভব না হলে রক্তের নমুনা



চিত্র ১৬ : পশু থেকে রক্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে

রেফ্রিজারেটরে (Refrigerator) রাখতে হবে। হেপারিন, সোডিয়াম ও পটাশিয়াম অক্সালেট, সোডিয়াম সাইট্রেট, ই.ডি.টি.এ. (EDTA) প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থ রক্ত জমাটবাঁধা রোধ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এখানে রক্তের বিভিন্ন রূটিন পরীক্ষাসমূহের নাম এবং বিভিন্ন রোগের সাথে এর সম্পর্ক উল্লেখ করা হয়েছে।

মোট লোহিতকণিকা গণনা
সর্বনিম্ন মান গরঢ়তে এবং সর্বোচ্চ
মান ছাগলে পাওয়া যায়। বিভিন্ন
রোগে শরীরে এ রক্ত কোষের
সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।

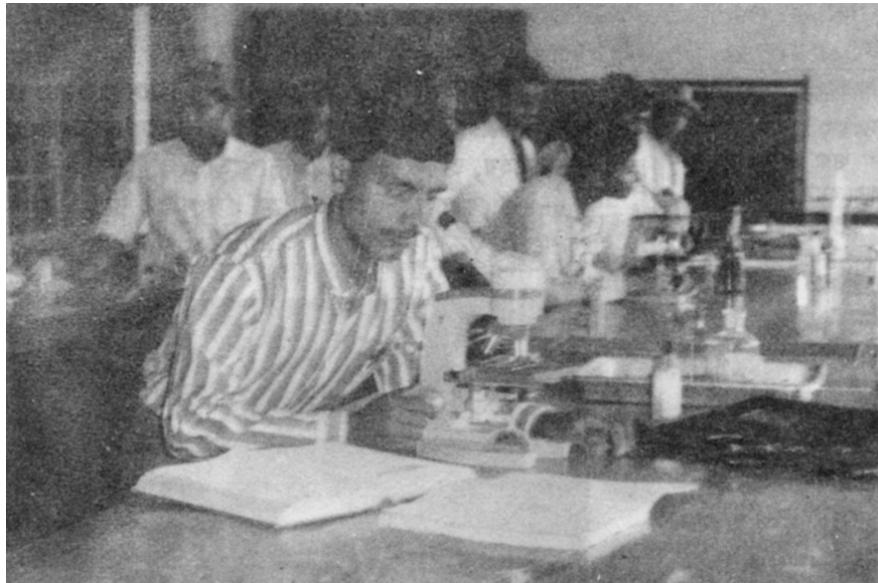
মোট লোহিতকণিকা গণনা (Total Erythrocytes Count)

বিভিন্ন প্রজাতির পশুর মোট লোহিতকণিকার সংখ্যা প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে $5.95-13.90$ মিলিয়ন। মোট লোহিতকণিকা গণনার সর্বনিম্ন মান (5.95 মিলিয়ন) গরঢ়তে এবং সর্বোচ্চ মান (13.90 মিলিয়ন) ছাগলে পাওয়া যায় (সারণি ১ দেখুন)। বিভিন্ন রোগে শরীরে এ রক্ত কোষের সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। লোহিতকণিকার সংখ্যা স্বাভাবিকের চেয়ে কমে গেলে রক্তশূন্যতা (অহংবসরধ) দেখা দেয়। শরীরে লোহাজাতীয় উপাদানের অভাব, দীর্ঘস্থায়ী রক্তপাত, দেহাভ্যন্তরে রক্তকণিকা ধ্বংস, হাড়ের শাঁস (Bone Marrow), যকৃত (Spleen) ধ্বংসপ্রাণ হলে মোট লোহিতকণিকা গণনা কমে যায়। এছাড়া রক্ত শোষণকারী পরজীবী, যেমন— বড়শি ক্রিম (Hookworm); রক্তকণিকা ধ্বংসকারী পরজীবী, যেমন— পাইরোপ্লাজমার (Piroplasma) আক্রমণ হলে মোট লোহিতকণিকার গণনা কমে যায়।

মোট শ্বেতকণিকা গণনা
হাজার সারণি ১ দেখুন।
বিভিন্ন পশুর মোট শ্বেতকণিকা গণনা প্রতি ঘন মিলিমিটারে $8.10-9.14$ হাজার (সারণি ২ দেখুন)। এ রক্ত কোষের গণনার মানের হ্রাস-বৃদ্ধি বিভিন্ন প্রকার রোগ নির্দেশ করে। সাধারণত ব্যাকটেরিয়া প্লারা সৃষ্টি রোগে মোট শ্বেতকণিকা গণনার মান বৃদ্ধি পায়। এছাড়া রক্তের ক্যানসার হলে শ্বেতকণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ফ্রান্সে, ভাইরাস প্লারা সৃষ্টি রোগে এ গণনার মান হ্রাস পায়।

মোট শ্বেতকণিকা গণনা (Total Leukocytes Count)

বিভিন্ন পশুর মোট শ্বেতকণিকা গণনা প্রতি ঘন মিলিমিটারে $8.10-9.14$ হাজার (সারণি ২ দেখুন)। এ রক্ত কোষের গণনার মানের হ্রাস-বৃদ্ধি বিভিন্ন প্রকার রোগ নির্দেশ করে। সাধারণত ব্যাকটেরিয়া প্লারা সৃষ্টি রোগে মোট শ্বেতকণিকা গণনার মান বৃদ্ধি পায়। এছাড়া রক্তের ক্যানসার হলে শ্বেতকণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ফ্রান্সে, ভাইরাস প্লারা সৃষ্টি রোগে এ গণনার মান হ্রাস পায়।



চিত্র ১৭ : অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে লোহিত ও শ্বেতকণিকা গণনা

শ্বেতকণিকার প্রভেদমূলক গণনা (Differential Count of Leukocytes)

শ্বেতকণিকার মধ্যে বিভিন্ন প্রকার কোষ রয়েছে। এগুলোর নাম নিউট্রোফিল (Neutrophil), লিম্ফোসাইট (Lymphocyte), ইউসিনোফিল (Eosinophil), বেসোফিল (Basophil) ও মনোসাইট

শ্বেতকণিকার মধ্যে নিউট্রোফিল, লিফ্ফোসাইট, ইউসিমোফিল, বেসোফিল ও মনোসাইট নামক কোষ রয়েছে। বিভিন্ন রোগের কারণে এসব রক্তকণিকার গণনার মানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।

(Monocyte)। বিভিন্ন রোগের কারণে এসব রক্তকণিকার গণনার আনুমানিক মানের হ্রাস-বৃদ্ধি পায়। পুঁজসৃষ্টিকারী (Pyogenic) ব্যাকটেরিয়া গ্লারা সংক্রমিত রোগে সাধারণত রক্তে নিউট্রোফিলের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আবার ভাইরাসজনিত রোগে রক্তে এ কোষের সংখ্যা হ্রাস পায়। ভাইরাস সংক্রমিত রোগে রক্তে লিফ্ফোসাইটের সংখ্যা ও হ্রাস পায়। শরীরে অ্যালার্জি দেখা দিলে অথবা পরজীবীর আক্রমণ হলে রক্তে ইউসিমোফিলের সংখ্যা বেড়ে যায়। যক্ষা এবং ক্রসেলোসিস রোগে রক্তে মনোসাইটের সংখ্যা বেড়ে যায়। বিভিন্ন প্রজাতির পশুর শ্বেতকণিকার প্রভেদমূলক গণনার স্বাভাবিক মান সারণি ৩ এ দেয়া হয়েছে।

সারণি ১ : বিভিন্ন প্রজাতির পশুর মোট লোহিতকণিকা গণনার স্বাভাবিক মান

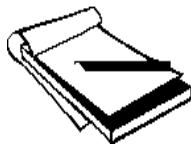
পশুর প্রজাতি	মোট লোহিতকণিকা গণনার মান (মিলিয়ন/কিউবিক মিলিমিটার)
মোড়া	৬.৯০
গরু	৫.৯৫
মহিষ	৬.৮০
ছাগল	১৩.৯০
ভেড়া	৮.৬০
শুকর	৭.৮০
কুকুর	৬.২০
বিড়াল	৭.২০

সারণি ২ : বিভিন্ন প্রজাতির পশুর মোট শ্বেতকণিকা গণনার স্বাভাবিক মান

পশুর প্রজাতি	মোট শ্বেতকণিকা গণনার মান (হাজার/কিউবিক মিলিমিটার)
মোড়া	৫.১১
গরু	৭.০৩
মহিষ	৬.৭০
ছাগল	৫.১৪
ভেড়া	৮.১০
শুকর	৭.৩০
কুকুর	৮.১৮
বিড়াল	৯.১৪

সারণি ৩ : বিভিন্ন প্রজাতির পশুর বিভিন্ন প্রকার শ্বেতকণিকার স্বাভাবিক প্রভেদমূলক গণনা

পশুর প্রজাতি	নিউট্রফিল (%)	ইউসিনোফিল (%)	বেসোফিল (%)	লিফ্ফোসাইট (%)	মনোসাইট (%)
ঝোড়া	৬২.০০	৮.০০	২.০০	২০.০০	৮.০০
গরু	২৯.১০	৯.৮৭	০-০.১০	৫১.৮০	৮.৩২
মহিষ	২৮.৭০	২.৯০	০	৬০.৬০	৭.৮০
ছাগল	৮০.০০	২.৫০	১.৬০	৮৮.০০	২.০০
ভেড়া	৮১.০০	৫.৭০	০.০৩	৫০.০০	৩.০০
শুকর	৩৯.০০	৮.৫০	১.২০	৫২.০০	৩.৩০
কুকুর	৬২.৮০	২.০-১.৮০	০.২-০.০	১০.০-২৮.০	৩.০-৯.০
বিড়াল	৮৮.৮২	২.০-১১.০	০-০.০৫	১৫.০-৮৮.০	০.০৫-০.৭

উৎস (সারণি ১, ২ ও ৩) : Chakrabarti, A. 1994. *Textbook of Clinical Veterinary Medicine (2nd Ed.)*।

অনুশীলন (Activity) : পায়খানা, প্রস্তাব ও রক্ত পরীক্ষার মধ্যে আপনার দৃষ্টিতে কী কী পার্থক্য আছে।



সারমর্ম ৩ গবাদিপশুর বিভিন্ন রোগ চূড়ান্তভাবে নির্ণয়ের জন্য গবেষণাগারে বিভিন্ন নমুনা পরীক্ষা করা হয়। এসব নমুনার মধ্যে মল, প্রস্তাব ও রক্ত গুরুত্বপূর্ণ। মলের বিভিন্ন পরীক্ষার মধ্যে বর্ণ, গন্ধ, গঠন ও কৃমির উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হয়। প্রস্তাবের ক্ষেত্রে এর পরিমাণ, আপেক্ষিক গুরুত্ব বর্ণ, স্বচ্ছতা, ল্লাতা, ক্ষারতা প্রভৃতি পরীক্ষা করা হয়। রক্তের বিভিন্ন পরীক্ষার মধ্যে রয়েছে মোট লোহিতকণিকা গণনা, মোট শ্বেতকণিকা গণনা, শ্বেতকণিকার প্রভেদমূলক গণনা ইত্যাদি। এসব পরীক্ষার মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করে চূড়ান্তভাবে রোগ নির্ণয় করা হয়।



পাঠোভর মূল্যায়ন ১.৩

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. কোন্টি মাংসাশি প্রাণী?

- i) কুকুর
- ii) হাতি
- iii) গরু
- iv) জিরাফ

খ. পায়োজেনিক ব্যাকটেরিয়া সংক্রমিত রোগে রক্তের কোন্ কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়?

- i) নিউট্রোফিল
- ii) লিফোসাইট
- iii) ইউসিনোফিল
- iv) বেসোফিল

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. অতিরিক্ত পানি পান করলে প্রস্তাবের ঘনত্ব বেড়ে যায়।

খ. গরুর জুগলার শিরা থেকে রক্ত সংগ্রহ করা হয়।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. ময়লাযুক্ত _____ পরীক্ষা করা উচিত নয়।

খ. _____ রোগে প্রস্তাবের রঙ হলুদ হয়।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. স্কুল পরীক্ষায় মলের কৌ কৌ বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা করা হয়?

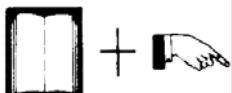
খ. প্রস্তাব শরীরের কোথায় তৈরি হয়?

ব্যবহারিক

পাঠ ১.৪ একটি সুস্থ গবাদিপশু দেখে বাহ্যিক লক্ষণগুলো জানা ও খাতায় লেখা

এ পাঠ শেষে আপনি –

- বাহ্যিক লক্ষণ দেখে সুস্থ ও অসুস্থ পশু শণাক্ত করতে পারবেন।



সুস্থ পশুর বাহ্যিক লক্ষণ
জানতে হলে অসুস্থ পশুর
লক্ষণসমূহ জানা অপরিহার্য।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

সুস্থ পশুর বাহ্যিক লক্ষণ জানতে হলে প্রথমে অসুস্থ পশুর লক্ষণসমূহ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা অপরিহার্য। সে কারণেই এখানে সুস্থ ও অসুস্থ পশুর বাহ্যিক লক্ষণসমূহ যুগপৎভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যথা—

মাজেল (Muzzle) : উপরের ঠোটের লোমবিহীন অংশকে মাজেল বলে। একটি সুস্থ পশুর মাজেল সর্বদা ঘর্ষাঙ্ক থাকে। বিন্দু বিন্দু ঘামে সিক্ত এ অংশ সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। অসুস্থ পশুর মাজেল সাধারণত শুক্র থাকে।

লালা (Saliva) : কোনো সুস্থ পশুর মুখ থেকে সাধারণত লালা পড়ে না। মুখ থেকে অতিরিক্ত লালা নির্গত হলে তা রোগাবস্থা নির্দেশ করে। উদাহরণস্বরূপ, মুখগহ্বরে কোনো ক্ষত হলে (যেমন—ক্ষুরারোগ) মুখ থেকে অতিরিক্ত লালা পড়ে। আবার জলাতক্ষ রোগে ক্ষতাবস্থা ছাড়াও লালা পড়ে।

খাদ্য গ্রহণ (Feeding) : সুস্থ পশুতে স্বাভাবিকভাবে ক্ষুধা ও অসুস্থ পশুতে ক্ষুধামন্দা দেখা দেয়। গলাবিল বা ফ্যারিংসের অবশতার কারণে পশু খাদ্য গলধংকরণ করতে পারে না। ফলে খাবার নাকমুখ দিয়ে বের হয়ে আসে।

কোনো সুস্থ পশুর মুখ থেকে
সাধারণত লালা পড়ে না।

রোমস্থক পশু, যেমন— গরু,
মহিষ, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি
জাবর কাটে। জারব কাটা বা
রোমস্থন সুস্থতার লক্ষণ।

জাবরকাটা (Rumination) : রোমস্থক পশু, যেমন— গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি জাবরকাটে। তৃণভোজী এসব প্রাণী খাদ্য যথাযথভাবে না চিবিয়ে গলধংকরণ করে। পরে বিশ্রামকালে বিশেষ প্রক্রিয়ায় এসব খাদ্য পাকস্থলী থেকে অন্তর্নালির মাধ্যমে মুখগহ্বরে আসে। লালা সংমিশ্রণ ও চর্বিতর্চর্বনের পর এ খাদ্য পুনরায় অন্তর্নালি হয়ে পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। এ প্রক্রিয়াকে জাবরকাটা বা রোমস্থন বলে। রোমস্থন সুস্থতার লক্ষণ। কোনো অসুস্থ পশু সাধারণত রোমস্থন করে না।

নাসিকারঞ্জ (Nostrils) : সুস্থ গবাদিপশুর নাসিকারঞ্জ পরিষ্কার থাকে। নাক থেকে কোনো শ্লেষ্মাজাতীয় তরল পদার্থ বের হলে তা সাধারণত শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ ইঙ্গিত করে।

শ্বাসপ্রশ্বাস (Respiration) : বিভিন্ন প্রজাতির পশুর নির্দিষ্ট শ্বাসপ্রশ্বাসের হার রয়েছে। সুস্থ পশুতে এ হার স্বাভাবিক থাকে। শ্বাসপ্রশ্বাসের অস্বাভাবিকতা তাই অসুস্থতার লক্ষণ। এ লক্ষণ বাহ্যিকভাবে সহজেই পর্যবেক্ষণ করা যায়।

চোখ ও কান (Eye and Ear) : সুস্থ পশুর চোখ পরিষ্কার থাকে। চোখে আঘাত লাগলে, ডারময়েড সিস্ট (Dermoid Cyst) হলে চোখ থেকে পানি পড়ে। জীবাণু সংক্রমণ হলে চোখে ময়লা জমতে পারে এবং চোখ লাল হতে পারে। তাছাড়া জান্ডিস (Jaundice) হলে চোখ হলুদ বর্ণ ধারণ করে। সুস্থ পশুর কান সর্বদা সজাগ থাকে এবং কোনো শব্দ হলে কান খাড়া করে ও সতর্ক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। পশু অসুস্থ হলে এরূপ প্রতিক্রিয়া বিলুপ্ত হয়।

লেজ (Tail) : সুস্থ পশুর লেজ সর্বদা ব্যস্ত থাকে। কোনো মশামছি বা কীটপতঙ্গ গায়ে বসলে লেজের সাহায্যে তাৎক্ষণিকভাবে তাড়িয়ে দেয়। অসুস্থ পশুতে লেজ নিশ্চল থাকে এবং মশামাছি মরা শরীরে

সুস্থ পশুর লেজ সর্বদা ব্যস্ত থাকে। মশামছি বা কীটপতঙ্গ গায়ে বসলে লেজের সাহায্যে তাৎক্ষণিকভাবে তাড়িয়ে দেয়।

চর্ম রোগের কারণে
বহিরাবরণের বৈশিষ্ট্য খর্ব হয় এবং খসখসে ও রুক্ষরূপ ধারণ করে।

স্বাচ্ছন্দে বিচরণ করে। এছাড়া গরুমহিষের লেজে পচনশীল ঘা (Gangrene) থাকতে পারে। আবার সুস্থ পশুর লেজ পরিক্ষার থাকে। আমাদের দেশে গরুমহিষে প্রায়শ ডায়ারিয়া বা পাতলা পায়খনা হয়। এসব ক্ষেত্রে পশুর লেজ এবং তদসংলগ্ন স্থানসমূহে পায়খনা লেগে থাকতে দেখা যায়। জরাযুতে পুঁজ (Pyometra) হলে লেজের উপরিভাগে পুঁজ জড়িয়ে থাকবে। কখনও কখনও রক্তিমণ্ডিত শেঁশ্বা লেজের সাথে সংযুক্ত থাকতে পারে। এসব অসুস্থতার লক্ষণ।

বহিরাবরণ (Body Coat) : সুস্থ পশুর বহিরাবরণ কোমল, মসৃণ ও চাকচিক্যপূর্ণ হয়। অপুষ্টি, চর্মরোগ প্রভৃতির কারণে বহিরাবরণের এ বৈশিষ্ট্য খর্ব হয় এবং খসখসে ও রুক্ষরূপ ধারণ করে। কখনও কখনও শরীরের অংশবিশেষ লোমহীন হয়ে পড়ে। এছাড়া খোসপাঁচড়া, ফেঁড়া, বিভিন্ন প্রকার ঘাত, কীড়াপড়া (Myiasis), টিউমার, সিস্ট (Cyst), আঁচিল (Papillomatosis), জোয়ালকান্দা, কুঁজে ঘা প্রভৃতি রোগ শরীরের বাহ্যিক আবরণ পরীক্ষা করে সহজেই চিহ্নিত করা যায়। সুস্থ পশুর লোম শায়িত অবস্থায় থাকে। পক্ষান্তরে, অতিরিক্ত শীত ও জ্বরে পশুর লোম খাড়া থাকে।

নাভি (Navel) : বাচ্চুরের নাভিতে প্রায়ই ফেঁড়া (Navel Abscess) ও হার্নিয়া (Umbilical Hernia) দেখা যায়। শক্ত জাতের বাচ্চুরে এ দুটো রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি। এসব রোগে নাভিসংলগ্ন এলাকা স্ফীত হয় এবং সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়।

বাহু (খরসন) : পশুর ৪টি বাহু অতি গুরুত্বপূর্ণ। এর কোনোটিতে ক্রটি হলে পশু তার কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। ক্ষুরারোগ (Foot and Mouth Disease), পা পচা (Foot Rot), পদপ্রদাহ (Laminitis), বিঞ্জি বা টাশ রোগ (Upward Patellar Fixatioin), সন্দিচ্ছাতি (Dislocation of Joint), সন্দিপ্রদাহ (Arthritis), বাহুর অবশতা (Limb Paralysis), হাড়ভাস্তা (Fracture) প্রভৃতি রোগে পশু খেঁড়া হয়ে যায়। সুস্থ পশুর বাহুগুলো ক্রটিমুক্ত থাকবে।

গবাদিপশুকে স্বাস্থ্যগতভাবে ৪ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—
অতি স্বাস্থ্যবান, স্বাস্থ্যবান,
স্বাস্থ্যহীন ও অতি স্বাস্থ্যহীন।

স্বাস্থ্যগত অবস্থা (Health Status) : পুষ্টিহীনতা আমাদের গবাদিপশুর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। পুষ্টিহীন পশুর রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকায় এরা সহজেই রোগাক্রান্ত হয়। আমাদের দেশের গবাদিপশুকে স্বাস্থ্যগতভাবে ৪ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন— অতি স্বাস্থ্যবান, স্বাস্থ্যবান, স্বাস্থ্যহীন ও অতি স্বাস্থ্যহীন। এদের মধ্যে অতি স্বাস্থ্যহীন পশুকে অসুস্থ হিসেবে ধরে নেয়া যায়। এ ধরনের পশুর বৈশিষ্ট্য/লক্ষণ এখানে দেয়া হয়েছে। যেমন—

এদের—

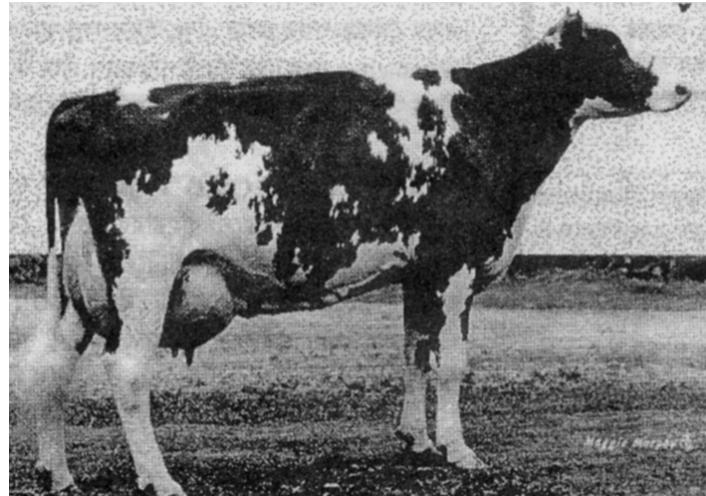
- ◆ বক্ষদেশের সকল হাড় (Ribs) স্পষ্ট দেখা যাবে।
- ◆ লাম্বার ট্রান্সভার্স প্রসেস (Lumbar Transverse Process) স্পষ্ট দেখা যাবে।
- ◆ প্যারালাম্বার ফোসা (Paralumbar Fossa) গভীর হবে।
- ◆ লেজের গোড়া সংকীর্ণ থাকবে।
- ◆ গুটিয়াল পেশি অবতল (Concave) থাকবে।
- ◆ টিউবার কঞ্চি (Tuber Coxae) ও টিউবার ইশ্চি (Tuber Ischi) ধারালোভাবে ভেসে উঠবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

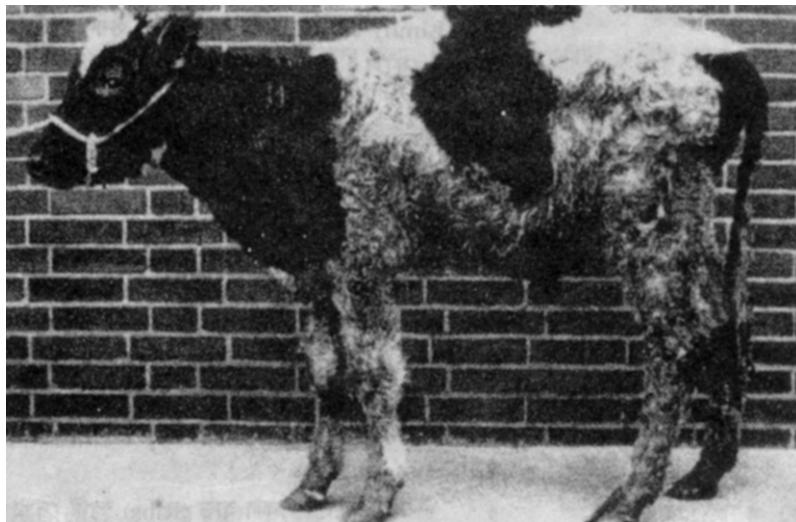
১. একটি সুস্থ ও একটি অসুস্থ পশু।
২. ব্যবহারিক খাতা, পেসিল, কলম, রাখার, সার্পনার, ক্ষেল ইত্যাদি।

কাজের ধারা

- ◆ প্রথমে পশু দুটোকে একটু দূরে দূরে দুটো খুঁটিতে বাঁধুন।
- ◆ এবার প্রথমে দূর থেকে এদের হাবভাব লক্ষ্য করুন।



চিত্র ১৮ : একটি সুস্থ পশু



চিত্র ১৯ : একটি অসুস্থ পশু

- ◆ এরপর পশু দুটোর কাছে যান ও এদের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করছন।
- ◆ কোর্সবইয়ে উল্লেখিত লক্ষণের সঙ্গে আপনার পর্যবেক্ষণ মিলিয়ে নিন।
- ◆ এবার পর্যালোচনা করে আপনার মন্তব্য অর্থাৎ কোন্টি সুস্থ ও কোন্টি অসুস্থ পশু তা নির্ণয় করুন।
- ◆ পুরো প্রক্রিয়াটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখুন ও মূল্যায়নের জন্য তা টিউটরকে দেখান এবং সই নিন।

সাবধানতা

- ◆ পশুদের খুব শক্ত করে বাঁধবেন না।
- ◆ লক্ষ্য রাখবেন যেন এরা ডয় বা আঘাত না পায়।
- ◆ এদেরকে খুব বেশি বিরক্ত করবেন না।

ব্যবহারিক

পাঠ ১.৫ নিজ হাতে গবাদিপশুর শরীরের তাপমাত্রা নির্ণয় করা



এ পাঠ শেষে আপনি –

- নিজ হাতে বিভিন্ন প্রজাতির গবাদিপশুর শরীরের তাপমাত্রা নির্ণয় করতে পারবেন।



প্রাসঙ্গিক তথ্য

শরীরের তাপমাত্রা

পশু উষ্ণরক্তবাহী হওয়ায় যে কোনো প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও শরীরের তাপমাত্রার তেমন কোনো পরিবর্তন হয় না। পশু সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হলেই সাধারণত শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। শরীরের বাহ্যিক তাপমাত্রা অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা অপেক্ষা অনেক কম। তাই পশুর দেহাভ্যন্তর থেকে প্রকৃত তাপমাত্রা নির্ণয় করা হয়।

তাপমাত্রা নির্ণয়ের পরিবেশ

- ছায়াতে বিশ্রামরত অবস্থায় শাস্ত পরিবেশে তাপমাত্রা নেয়া উচিত।
- প্রখর রৌদ্র অথবা বৃষ্টির মধ্যে থাকা অবস্থায় তাপমাত্রা নেয়া উচিত নয়।
- দীর্ঘপথ হাঁটা বা দৌড়ানোর পর ক্লান্ত অবস্থায় তাপমাত্রা নির্ণয় করা সঠিক নয়।
- পশু উত্তেজিত অবস্থায় থাকলে স্বাভাবিক তাপমাত্রা নিরূপণ করা যায় না।

তাপমাত্রার অভ্যর্থক

- ক্ষুদ্রাকার পশুর শরীরের তাপমাত্রা বৃহাদাকার পশুর চেয়ে বেশি থাকে।
- গর্ভবতী ও অল্লবয়স্ক পশুর তাপমাত্রা গভীর ও অধিক বয়স্ক পশু অপেক্ষা বেশি থাকে।
- দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা সকাল অপেক্ষা বিকেলে বেশি থাকে।

বিভিন্ন প্রজাতির পশুর শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা সারণি ৪ এ দেয়া হয়েছে।

সারণি ৪ : বিভিন্ন প্রজাতির পশুর শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা

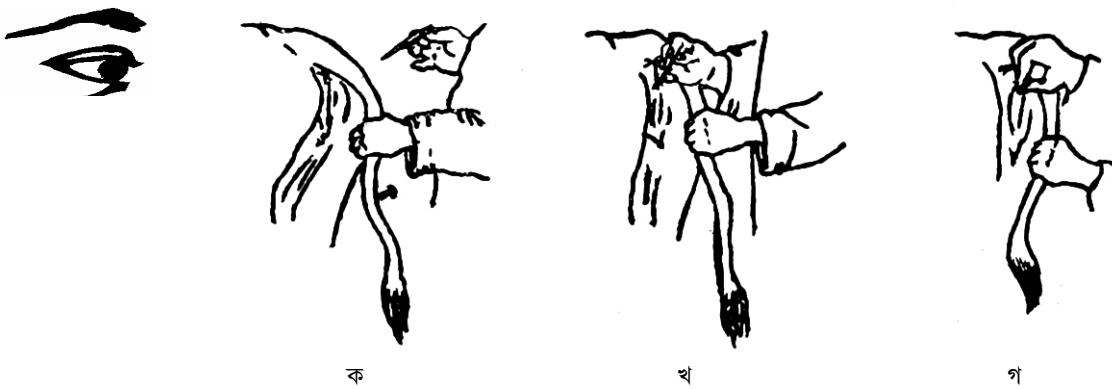
পশুর প্রজাতি	তাপমাত্রার পাল্টা ° সে. (° ফা.)	তাপমাত্রার গড় ° সে. (° ফা.)
ঘোড়া	৩৭.২–৩৮.১ (৯৯.০–১০০.৬)	৩৭.৬ (৯৯.৭)
গরু	৩৮.০–৩৯.৩ (১০০.৮–১০২.৮)	৩৮.৬ (১০১.৫)
ভেড়া	৩৮.৩–৩৯.৯ (১০০.৯–১০৩.৮)	৩৯.১ (১০২.৩)
ছাগল	৩৮.৫–৩৯.৭ (১০১.৩–১০৩.৫)	৩৯.১ (১০২.৩)
কুকুর	৩৭.৯–৩৯.৯ (১০০.২–১০৩.৮)	৩৮.৯ (১০২.০)
বিড়াল	৩৮.১–৩৯.২ (১০০.৫–১০২.৫)	৩৮.৬ (১০১.৫)
উট	৩৮.২–৪০.৭ (৯৩.৬–১০৫.৩)	৩৭.৫ (৯৯.৫)
গাধা	৩৬.৮–৩৮.৮ (৯৭.৫–১০১.১)	৩৭.৪ (৯৯.৩)
শুকর	৩৮.৭–৩৯.৮ (১০১.৬–১০৩.৬)	৩৯.২ (১০২.৫)

উৎস : Swenson, M. J. (1977). *Dukes' Physiology of Domestic Animals* (9th Ed.), Comstock Publishing Associates, Ithaka-London, p. 687.

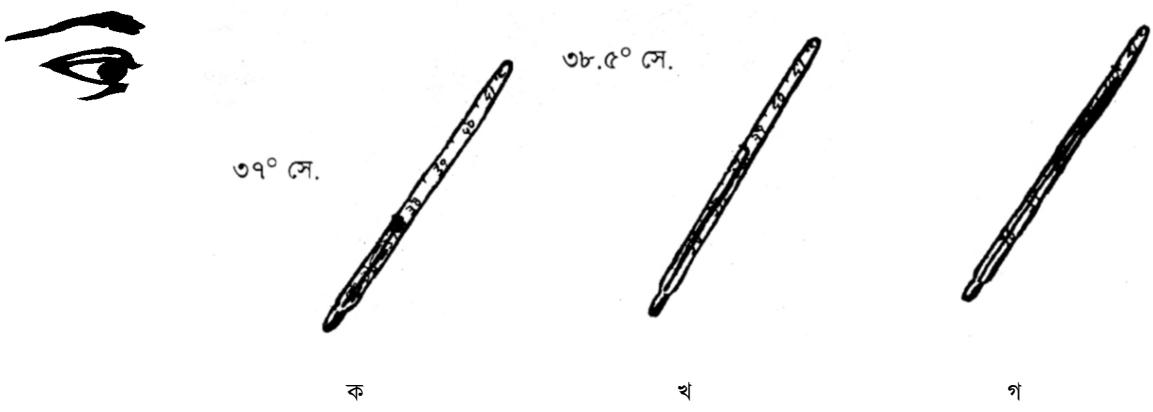
পশুর দেহের তাপমাত্রা নির্ণয়

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. যে কোনো প্রজাতির একটি গবাদিপশু (মনে করণ গরছ)।
২. যত্নপাতি—
 - ক. ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার (Clinical Thermometer)— ১টি।
 - খ. ক্যাটল শূট (Cattle Chute)— ১টি।
 - গ. তুলো— পরিমাণমতো।
৩. রাসায়নিক দ্রব্য—
 - ক. ভ্যাসলিন বা অন্য কোনো তৈলাক্ত পদার্থ— পরিমাণমতো।
 ৪. ব্যবহারিক খাতা, কলম, পেসিল, রাবার, সার্পনার, ক্ষেল ইত্যাদি।



চিত্র ২০ (ক, খ, গ) : পশুর দেহে তাপমাত্রা নির্ণয় করা হচ্ছে



চিত্র ২১ (ক, খ, গ) : থার্মোমিটারে পারদের স্তর দেখে সঠিক তাপমাত্রা গণনা

কাজের ধারা

- ◆ প্রথমে গরুটিকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করণ। সুবিধা থাকলে ক্যাটল শূট ব্যবহার করণ। অন্যথায় একজন সহকারীর সাহায্য নিন।
- ◆ একটি ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার নিন এবং এর পারদের স্তর ঝাঁকুনির মাধ্যমে সর্বকিং পর্যায়ে নামিয়ে আনুন।

- ◆ থার্মোমিটারের অগ্রভাগ ভ্যাসলিন অথবা অন্য কোনো তেলাক্ত পদার্থ গ্লারা পিচ্ছিল করণ ।
- ◆ বাম হাত গ্লারা পশুর লেজ একপাশে উঁচু করে ধরন এবং ডান হাত গ্লারা থার্মোমিটারের পিচ্ছিল প্রান্ত মলনালিতে যতটা সম্ভব ঢুকিয়ে দিন ।
- ◆ থার্মোমিটারটি উক্ত স্থানে তীর্যকভাবে ১-২ মিনিটকাল স্থির রাখুন (এ অবস্থায় থার্মোমিটারের বাল্ব মলনালির দেয়ালের সংস্পর্শে আসে এবং দেহের সঠিক তাপমাত্রা ধারণ করে) ।
- ◆ মলনালি থেকে থার্মোমিটার বের করণ এবং তুলোর সাহায্যে পরিষ্কার করণ ।
- ◆ থার্মোমিটারে পারদের স্তর দেখে সঠিক তাপমাত্রা নির্ণয় করণ ।

সাবধানতা

- ◆ মালনালি শক্ত মলে পরিপূর্ণ থাকলে ডান হাত দিয়ে পশুর লেজ ধরে বাম হাতের আঙুল গ্লারা মলনালি থেকে শক্ত মল সরিয়ে ফেলতে হবে । কেননা থার্মোমিটারের বাল্ব শক্ত মলের মধ্যে প্রবেশ করলে অপেক্ষাকৃত কম তাপমাত্রা নির্ণীত হবে ।
- ◆ মালনালিতে থার্মোমিটার অবশ্যই তীর্যকভাবে ধরে রাখতে হবে । কেননা থার্মোমিটারের বাল্ব মালনালির দেয়ালের সংস্পর্শে না আসলে অপেক্ষাকৃত কম তাপমাত্রা রেকর্ড হবে ।
- ◆ মালনালি ঢিলা অথবা শিথিল থাকলে পশুর সঠিক তাপমাত্রা নিরপিত হবে না । এক্ষেত্রে স্তুরী পশুর ঘোনিতে থার্মোমিটার প্রবেশ করিয়ে তাপমাত্রা নির্ণয় করা যায় ।

ব্যবহারিক

পাঠ ১.৬ নিজ হাতে গবাদিপশুর নাড়ির গতি ও শ্বাসপ্রশ্বাসের হার নির্ণয় করা



এ পাঠ শেষে আপনি –

- নিজ হাতে গবাদিপশুর নাড়ির গতি নির্ণয় করতে পারবেন।
- নিজ হাতে গবাদিপশুর শ্বাসপ্রশ্বাসের হার নির্ণয় করতে পারবেন।



প্রাসঙ্গিক তথ্য

গবাদিপশুর নাড়ির গতি

নাড়ির গতি বা পালস (Pulse) কী তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। সঠিক রোগ নিরূপনের জন্য নাড়ির গতি নির্ণয় অপরিহার্য। বিভিন্ন প্রজাতির গবাদিপশুতে নাড়ির গতি নির্ণয় করার স্থান ও প্রযুক্তিগত কৌশল তিনি। পশুর শরীরের নির্দিষ্ট ধমনি থেকে নাড়ির গতি নির্ণয় করা হয়। সংলগ্ন দুটো আঙুল গ্লারা ধমনিতে মৃদু চাপ প্রয়োগ করলে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অনুভব করা যায়। আঙুলের চাপ বেশি হলে ধমনির রক্ত প্রবাহ বন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং এরপে ক্ষেত্রে নাড়ির স্পন্দন উপলব্ধি করা যাবে না। অনুশীলনের মাধ্যমে সহজেই এ কৌশল আয়ত্তে আনা যায়।

ছোট প্রজাতির পশু, যেমন— ছাগল, ভেড়া, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতির নাড়ির গতি বড় প্রজাতির পশু, যেমন— গরু, মহিষ, ঘোড়া প্রভৃতির চেয়ে বেশি। একই প্রজাতির বিভিন্ন পশুর মধ্যেও এ নিয়ম প্রযোজ্য। আবার অন্ত বয়স্ক পশুর নাড়ির গতি অধিক বয়স্ক পশু অপেক্ষা বেশি থাকে। পুরুষ পশুর নাড়ির গতি স্ত্রী পশু অপেক্ষা কম থাকে। গর্ভবস্থায়, বিশেষ করে প্রসবপূর্ব সময়ে, নাড়ির গতি অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পায়।

নাড়ির গতি যথাসম্ভব শাস্ত অবস্থায় গ্রহণ করতে হবে। উভেজিত অবস্থায় অথবা ব্যায়াম করার পর নাড়ির গতি বৃদ্ধি পায়। সে কারণে হাঁটাহাঁটি, দৌড়ানো বা কাজ করার পর পশুকে অত্তত আধান্ত বিশ্রাম দেয়া আবশ্যিক।

অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণের পর, জাবরকাটা অবস্থায়, পরিবেশগত অতি উচ্চ বা নিম্ন তাপমাত্রায়, শরীরে তীব্র বেদনা অনুভূত হলে এবং সর্বোপরি স্বরের কারণে দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে নাড়ির গতি বেড়ে যায়। এখানে বিভিন্ন প্রজাতির পশুর নাড়ির গতি নির্ণয়ের স্থান ও প্রযুক্তিগত কৌশল বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রধানত লেজের ধমনি থেকে নাড়ির গতি নির্ণয় করা হয়। এছাড়া চোয়ালের নিচের দিকে অবস্থিত এক্সটারনাল ম্যাগজিলারি ধমনি (External Maxillary Artery) থেকেও নাড়ির গতি নির্ণয় করা যায়। তবে আমাদের দেশে মাঝ পর্যায়ে নাড়ির গতি প্রধানত লেজের ধমনি থেকেই গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে পশুকে প্রথমে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। পরে বাম হাতের সাহায্যে লেজ কিছুটা উঁচু করে ধরতে হবে এবং ডান হাতের আঙুল গ্লারা মলগ্লার থেকে ৭.৫-১০.০ সে.মি. নিচে লেজের নিদিকে মৃদুভাবে চাপ প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম স্পর্শেই আঙুল সঠিক স্থানে নাও পড়তে পারে। তখন কাছাকাছি স্থানেও ক্রমান্বয়ে চাপ প্রয়োগ করতে হবে যতক্ষণ না আঙুল ধমনির স্পন্দন অনুভূত হয়। এ অবস্থায় উক্ত স্পন্দন এক মিনিট গণনা করতে হবে। এক মিনিটে এ স্পন্দন যতবার অনুভব করা যাবে সেটিই হবে ঐ পশুর নাড়ির গতি।

গরুমহিসের চোয়ালের ধমনি থেকেও উপরের পদ্ধতি প্রয়োগ করে নাড়ির গতি নির্ণয় করা যায়। তবে, চোয়ালের ধমনির স্পন্দন অনুভব করা অপেক্ষাকৃত কঠিন। বিশেষ করে পশু শাস্ত প্রকৃতির না হলে চোয়াল থেকে নাড়ির গতি নির্ণয় করা সম্ভব হয় না।

ঘোড়া : ঘোড়াতে প্রধানত চোয়ালের ধমনি (External Maxillary Artery) থেকে নাড়ির গতি নির্ণয় করা হয়। এক্ষেত্রে ঘোড়ার মাথার কাছাকাছি বাম দিকে দাঢ়িয়ে বাম হাত দিয়ে আলতোভাবে মাথা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং ডান হাতের আঙুল গ্লারা চোয়ালের নিচের দিকটাতে ক্রমান্বয়ে মৃদু চাপ

প্রয়োগ করতে হবে। ধমনির স্পন্দন অনুভব করার পর এক মিনিটকাল তা গণনা করতে হবে। ঘোড়ার লেজের ধমনি থেকে নাড়ির গতি নির্ণয় করা হয় না। এছাড়া ঘোড়ার পিছনের দিকে যাওয়াও বিপদজনক।

ছাগলভেড়া : এসব পশুর ক্ষেত্রে উরুর ধমনি থেকে নাড়ির গতির হার নির্ণয় করা হয়। উরুর ইনগুইনাল অঞ্চলে (Inguinal Region) আঙুল দিয়ে মৃদু চাপ প্রয়োগ করে ধমনির স্পন্দন অনুভব করা যায়। এসব প্রাণীতে চোয়াল এবং লেজের ধমনি পর্যবেক্ষণ করা সুবিধাজনক নয়।

পশুর অস্থিরতা, পেশির কম্পন, দেহের স্থূলতা প্রভৃতি কারণে নির্দিষ্ট ধমনি থেকে নাড়ির গতির হার নিরূপণ করা সম্ভব না হলে স্টেথোকোপের (Stethoscope) সাহায্যে সারাসরি হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন গণনা করা যায়।



চিত্র ২২ : স্টেথোকোপের সাহায্যে সারাসরি হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন গণনা

সাধারণত বিভিন্ন প্রজাতির পশুর নির্ধারিত স্থান থেকে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন এক মিনিটকাল গণনা করা হয়। বিভিন্ন অসুবিধার কারণে উক্ত সময়ের জন্য গণনা সম্ভব না হলে ৩০ সেকেন্ড সময়ে স্পন্দন গণনা করা যেতে পারে। এ সংখ্যাকে দ্বিগুণ করলেই প্রতি মিনিটে নাড়ির গতি নির্ণীত হয়। বিভিন্ন গবাদিপশুর নাড়ির গতির হার সারানি ৫ এ দেয়া হয়েছে।

শ্বাসপ্রশ্বাসের হার

কোনো পশু ফুসফুসের সম্প্রসারণের সময় শ্বাস গ্রহণ করে এবং সংকোচনের সময় শ্বাস ত্যাগ করে। প্রতি মিনিটে ফুসফুস কতবার প্রসারিত হয় বা সংকুচিত হয় অর্থাৎ কতবার শ্বাস গ্রহণ করে অথবা শ্বাস ত্যাগ করে সেটিই হচ্ছে শ্বাসপ্রশ্বাসের হার। পশুর নাড়ির গতি নির্ণয় অপেক্ষা শ্বাসপ্রশ্বাসের হার নির্ণয় সহজতর। পশুর পেছনে দাঁড়িয়ে বক্ষবেষ্টনি ও পেটের ওর্ঠানামা দেখে এ হার নির্ণয় করা যায়। আবার পশুর সামনে দাঁড়িয়ে নাসিকারক্রের নড়াচড়া ও বায়ুর গতি পর্যবেক্ষণ করেও শ্বাসপ্রশ্বাসের হার নির্ণয় করা যায়। এছাড়া স্টেথোকোপের সাহায্যেও ফুসফুস থেকে সারাসরি এ হার নির্ণয় করা যায়। ব্যায়াম, উদ্রেজনা, উচ্চ পরিবেশগত তাপমাত্রা, শারীরিক স্থূলতা, রক্তশূন্যতা প্রভৃতি শ্বাসপ্রশ্বাসের হার বাড়িয়ে দেয়। বিভিন্ন প্রজাতির গবাদিপশুর শ্বাসপ্রশ্বাসের হার সারানি ৫ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতি মিনিটে ফুসফুস যতবার প্রসারিত বা সংকুচিত হয় অর্থাৎ যতবার শ্বাস গ্রহণ ত্যাগ করে সেটিই শ্বাসপ্রশ্বাসের হার।

সারণি ৫ : বিভিন্ন প্রজাতির গবাদিপশুর স্বাভাবিক নাড়ির গতি ও শ্বাসপ্রশ্বাসের হার

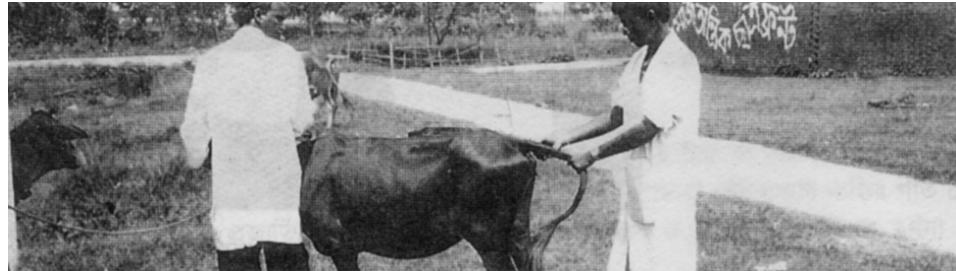
পশুর প্রজাতি	নাড়ির গতি (এতি মিনিটে)	শ্বাসপ্রশ্বাসের হার (এতি মিনিটে)
ঘোড়া	৩০-৪০	৮-১০
গরু	৬০-৮০	১০-৩০
মহিষ	৮০-৬০	১২-১৬
ভেড়া	৭০-৯০	১০-২০
ছাগল	৭০-৯০	২৫-৩৫
শূকর	৬০-৯০	১০-২০
কুকুর	৬০-৯০	১৫-৩০
বিড়াল	১১০-১৩০	২০-৩০

উৎস : সামাদ, এম. এ. (১৯৯৬)। পশ্চালন ও চিকিৎসাবিদ্যা, লিইক-এপিক প্রকাশনী, ময়মনসিংহ, পৃ. ১৩৫।

পরীক্ষণ ১ লেজের ধমনি থেকে গরুর নাড়ির গতি নির্ণয় করা

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. একটি গরু।
২. একটি ঘড়ি।
৩. ক্যাটল শূট বা টাভিস।
৪. ব্যবহারিক খাতা, কলম, পেসিল, রাবার, সার্পনার, স্কেল ইত্যাদি।



চিত্র ২৩ : লেজের ধমনি থেকে গরুর নাড়ির গতি নির্ণয়

কাজের ধারা

- ◆ প্রথমে গরুটিকে নিয়ন্ত্রণ করুন।
- ◆ অতঃপর বাম হাতের সাহায্যে এর লেজটি কিছুটা উঁচু করে ধরুন।
- ◆ এবার ডান হাতের আঙুলের সাহায্যে মলগ্নার থেকে ৭.৫-১০.০ সে.মি. নিচে লেজের নিফদিকে মৃদুভাবে চাপ প্রয়োগ করুন। ততক্ষণ পর্যন্ত চাপ প্রয়োগ করুন যতক্ষণ না আঙুলে ধমনির স্পন্দন অনুভূত হয়।
- ◆ এবার এ স্পন্দন ঘড়ির সাহায্যে এক মিনিটকাল পর্যন্ত গণনা করুন।
- ◆ আপনার পর্যবেক্ষণ খাতায় লিখুন ও সারণি ৫ এর সঙ্গে তা মিলিয়ে দেখুন কতটুকু সঠিক হয়েছে।
- ◆ পুরো পরীক্ষণটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখুন ও টিউটরকে দেখিয়ে তাতে সহ নিন।

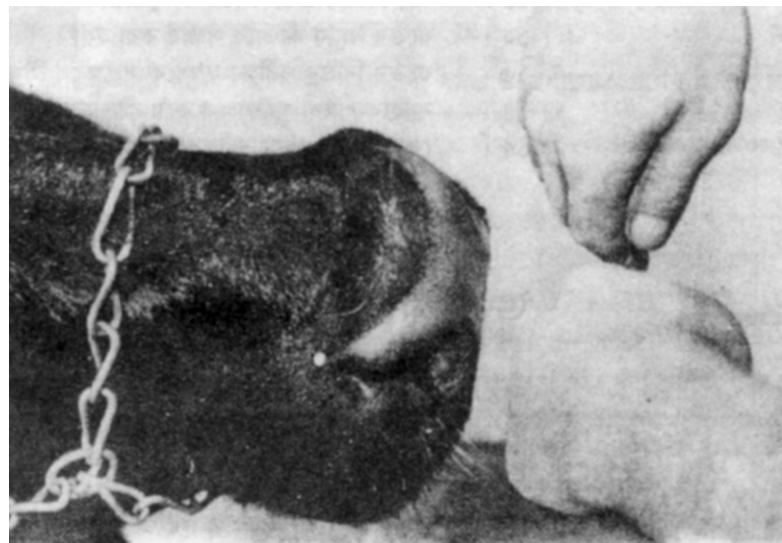
সাবধানতা

- ◆ গরুর লেজে খুব জোড়ে চাপ দেবেন না ।
- ◆ অথবা গরুকে হয়রানি করবেন না ।
- ◆ গরুকে সার্টিক পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ করবেন ।

পরীক্ষণ ২ গরুর শ্বাসপ্রশ্বাসের হার নির্ণয়

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. একটি গরু ।
২. একটি ঘড়ি ।
৩. ব্যবহারিক খাতা, কলম, পেসিল, রাবার, সার্পনার, ক্লেল ইত্যাদি ।



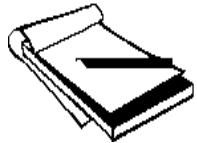
চিত্র ২৪ : গবাদিপঙ্কুর শ্বাসপ্রশ্বাসের হার নির্ণয়

কাজের ধারা

- ◆ প্রথমে গরুটিকে খুঁটির সঙ্গে বাঁধুন বা অন্য যে কোনোভাবে নিয়ন্ত্রণ করুন ।
- ◆ অতঃপর গরুটির সামনে এসে দাঁড়ান ।
- ◆ এবার গরুটির দুই নাসরঞ্জের সামনে আপনার হাত দুটো রাখুন ।
- ◆ গরুর নিঃশ্বাস যতবার হাতে লাগলো তা ঘড়ির সাহায্যে এক মিনিটকাল গণনা করে গরুর শ্বাসপ্রশ্বাসের হার নির্ণয় করুন ।
- ◆ আপনার পর্যবেক্ষণ খাতায় লিখুন ও সারাংশ ৫ এর সঙ্গে মিলিয়ে নিন ।
- ◆ পুরো পরীক্ষণটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখুন ও টিউটরকে দেখিয়ে তাতে সহ নিন ।

সাবধানতা

- ◆ গরুকে অযথা বিরক্ত করবেন না ।
- ◆ এ কাজের সময় মানুষকে ভীড় করতে দেবেন না ।



চূড়ান্ত মূল্যায়ন - ইউনিট ১

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন

- ১। রোগ নির্ণয়ে পশুর কী কী তথ্য গ্রহণ করা হয়?
- ২। পশুর সাধারণ পরীক্ষাসমূহের নাম লিখুন।
- ৩। পশুর শরীরের তাপমাত্রা নির্ণয়ের পদ্ধতি লিখুন।
- ৪। কীভাবে পশুর নাড়ি ও শ্বাসপ্রশ্বাসের হার নির্ণয় করা হয়?
- ৫। রেডিওগ্রাফির সাহায্যে কীভাবে রোগ নির্ণয় করা হয়?
- ৬। রঞ্জন রশ্মির ব্যবহার করে কী কী রোগ নির্ণয় করা যায়?
- ৭। রেকটাল পরীক্ষার সাহায্যে পৌষ্টিক ও জননতন্ত্রের কী কী রোগ নিরূপণ করা যায়?
- ৮। ভ্যাজাইনাল স্পেকুলাম কী এবং কীভাবে এ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়?
- ৯। কেন পশুর মুখগহৰ, চোখ ও কান পরীক্ষা করা হয়?
- ১০। কীভাবে পায়খানা ও প্রস্তাবের নমুনা সংগ্রহ করবেন?
- ১১। প্রস্তাবের বিক্রিয়া বলতে কী বুঝায়?
- ১২। রক্তের নমুনা কীভাবে সংগ্রহ করা হয়?
- ১৩। রক্তের বিভিন্ন পরীক্ষা সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।
- ১৪। বাহ্যিক লক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে কীভাবে একটি পশুর সুস্থিতা নির্ণয় করবেন?
- ১৫। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রার তারতম্য ঘটে?



উত্তরমালা - ইউনিট ১

পাঠ ১.১

- ১। ক. i ১। খ. iii ২। ক. স ২। খ. স ৩। ক. মস্তি ৩। খ. নিয়ন্ত্রণ ৪। ক.
জলাতক্ষ ৪। খ. পুরপুর শব্দ হয়

পাঠ ১.২

- ১। ক. iii ১। খ. iv ২। ক. স ২। খ. স ৩। ক. স্পেকুলাম ৩। খ. তলভিউলাস
৪। ক. ডিলিউ. সি. রঞ্জন ৪। খ. পায়োমেট্রা

পাঠ ১.৩

- ১। ক. i ১। খ. iv ২। ক. মি ২। খ. স ৩। ক. উচিত নয় ৩। খ. কোষ্ঠকাঠিন্য
৪। ক. পরিমাণ, বর্ণ, গন্ধ ও গঠন ৪। খ. বৃক্কে

ইউনিট ২ গবাদিপশুর ভাইরাসজনিত সংক্রামক রোগ

ইউনিট ২ গবাদিপশুর ভাইরাসজনিত সংক্রামক রোগ

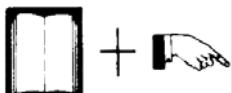
মানুষের ন্যায় গবাদিপশুও বিভিন্ন রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। কিন্তু পশুর রোগব্যাধির প্রতি আমরা প্রায়ই গুরুত্ব দিই না। অথচ এসব প্রাণীতে রোগব্যাধির গতিপ্রকৃতি অত্যন্ত জটিল। আমাদের পরিবেশে রোগ সৃষ্টির উপাদানসমূহ সর্বদা বিদ্যমান। ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, মাইকোপ্লাজমা, রিকেটিশিয়া, ছত্রাক প্রভৃতি রোগজীবাণু এবং বিভিন্ন পরজীবী অহরহ মানুষ ও পশুপাখির সংস্পর্শে আসছে। রোগ সৃষ্টির এসব জীবাণু সাধারণত খালি চোখে দেখা যায় না। তাই মানুষ ও গবাদিপশু পাখি সুস্থ রাখার জন্য পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যপোয়োগী রাখা অপরিহার্য। উপরোক্তিত জীবাণুজনিত রোগ, বিশেষ করে ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস সংক্রমিত রোগ, মহামারী হিসেবে দেখা দেয় এবং এতে অল্প সময়ে অসংখ্য পশুপাখি মারা যেতে পারে। ব্যাকটেরিয়ামারা সৃষ্টি রোগ অ্যাস্টিবায়োটিক প্রয়োগের মাধ্যমে নিরাময় করা যায়। কিন্তু ভাইরাস সংক্রমিত রোগের জন্য অদ্যাবধি কোনো চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয় নি। এসব রোগের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, রোগ সৃষ্টির আদর্শ পরিবেশ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকলে রোগের প্রদুর্ভাব কমানো যেতে পারে। গবাদিপশুতে ভাইরাসজনিত রোগ অতি দ্রুত সংক্রমিত ও সম্প্রসারিত হয়।

এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে গৃহপালিত পশুর ক্ষুরারোগ, বসন্ত ও জলাতঙ্ক রোগের কারণ, লক্ষণ, রোগ নির্ণয় ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ২.১ ক্ষুরারোগ

এ পাঠ শেষে আপনি –

- ক্ষুরারোগ কী তা বলতে পারবেন এ রোগের কারণ লিখতে পারবেন।
- ক্ষুরারোগ কীভাবে পশুতে সংক্রমিত হয় বিকাশ লাভ করে তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ক্ষুরারোগের লক্ষণ, রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- ক্ষুরারোগের ক্ষতিকর প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।



ক্ষুরারোগ সকল বিভিন্ন ক্ষুরবিশিষ্ট প্রাণীতে দেখা যায়।

ক্ষুরারোগ কী?

ক্ষুরারোগ একটি অতিতীব্র প্রকৃতির সংক্রামক ভাইরাসজনিত রোগ। এ রোগ সকল বিভিন্ন ক্ষুরবিশিষ্ট (Cloven Footed) প্রাণীতে দেখা যায়। এ রোগে অক্রান্ত পশুর মুখ ও পায়ে ঘা হবার ফলে খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না এবং খুড়িয়ে হাঁটে। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই এ রোগ দেখা যায়। তবে, বাংলাদেশের গর্ষতে ক্ষুরারোগের প্রদুর্ভাব খুব বেশি।

রোগের কারণ (Cause)

ফুট অ্যান্ড মাউথ ডিজিজ (Foot and Mouth Disease) নামক এক প্রকার ভাইরাস এ রোগ সৃষ্টি করে। সে কারণে ইংরেজিতে ক্ষুরারোগকে এফ.এম.ডি. (FMD) বলে। এ ভাইরাসের মোট ৭টি টাইপ রয়েছে। এগুলোর নাম এ (A), ও (O), সি (C), স্যাট-১ (SAT-1), স্যাট-২ (SAT-2), স্যাট-৩ (SAT-3) এবং এশিয়া-১ (ASIA-1)। বাংলাদেশে ও এবং এশিয়া-১ টাইপের ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বেশি।

রোগ সংক্রমণ (Disease Transmission)

ক্ষুরারোগ অত্যন্ত সংক্রামক হওয়ায় কোনো এলাকায় এ রোগ দেখা দিলে একশত ভাগ পশুই তাতে আক্রান্ত হয়। রোগাক্রান্ত পশুর মধ্যে শতকরা ২ ভাগ বয়ক্ষ ও ২০ ভাগ বাচ্চা মারা যায়। তবে, তৈরুরপে রোগ দেখা দিলে শতকরা ৫০ ভাগ পশুও মারা যেতে পারে।

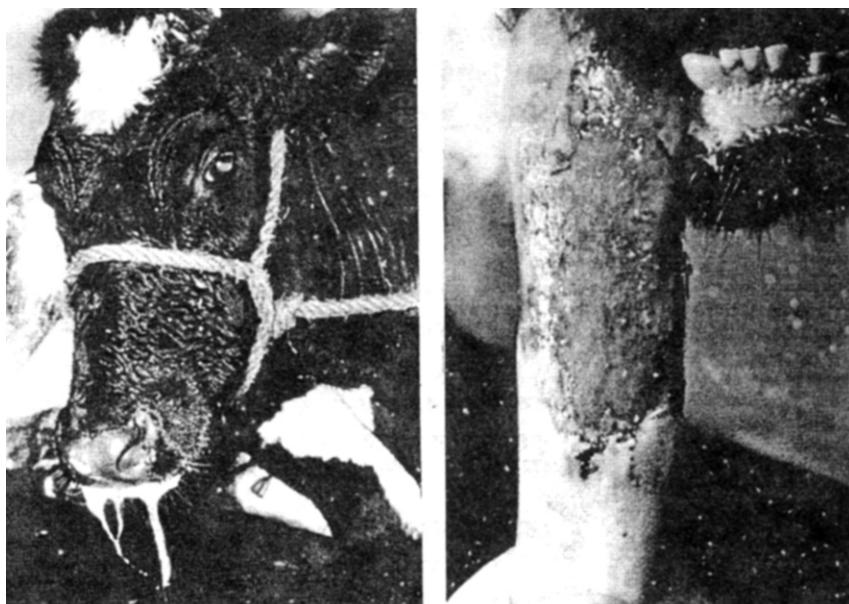
আক্রান্ত পশুর দুধ, মল, প্রস্তাব, বীর্য প্রভৃতির মাধ্যমে ভাইরাস পরিবেশে প্রত্যাগমন করে।

গরুতে এ রোগের প্রাদুর্ভাব খুব বেশি। তবে ছাগল, ভেড়া, শূকর প্রভৃতি পশুতেও এ রোগ দেখা যায়। আক্রান্ত ছাগল ও ভেড়া থেকে সহজেই এ রোগ গরুতে সংক্রমিত হতে পারে। নিরাময়প্রাপ্ত গরু ১–৮ বৎসর পর্যন্ত এ রোগের পুনরাক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে। কম বয়স্ক সকল পশুতে এ রোগের প্রকোপ সর্বাধিক।

ক্ষুরারোগের জীবাণু খাদ্য ও শ্বাসপ্রশ্বাসের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে। বায়ুপ্রবাহের মাধ্যমে এ রোগের জীবাণু সক্রিয় অবস্থায় ৫০ কিলোমিটার দূরত্ব পর্যন্ত চলে যেতে পারে। সংক্রমণের পরপরই জীবাণু রক্ত প্রবাহ, দুধ এবং লালার মধ্যে প্রবেশ করে। সংক্রমিত পশুর দুধ, মল, প্রস্তাব, বীর্য প্রভৃতির মাধ্যমে ভাইরাস আবার পরিবেশে ফিরে আসে। আক্রান্ত পশুর শতকরা ৫০ ভাগ রোগ নিরাময়ের পর শরীরে ভাইরাস বহন করে। এসব পশু থেকেও সুস্থ পশুতে রোগের বিস্তার ঘটতে পারে। ক্ষুরারোগের ভাইরাস বীর্যের মধ্যে প্রবেশ করার কারণে ভাইরাস বহনকারী ষাঁড় ক্রিম প্রজননের জন্য অত্যন্ত বিপদজনক। কারণ, এসব ষাঁড় থেকে সংগৃহীত বীর্য ক্রিম প্রজননে ব্যবহার করলে এ রোগ মহামারী আকারে দেখা দিতে পারে।

রোগের বিকাশ (Pathogenesis)

ক্ষুরারোগের ভাইরাস শরীরে অনুপ্রবেশ করার পর যথপোয়ুক্ত জায়গাসমূহ অর্থাৎ মুখগহ্বর ও জিহ্বার বহিরাবরণী, বিভিন্ন ক্ষুরের মধ্যবর্তী স্থান, ওলান ও ওলানের বাটে সম্প্রসারিত হয়। পরে এসব স্থানে রোগের চিহ্ন দেখা দেয়। সংক্রমণের ১–৮ দিনের মধ্যে এ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। আক্রান্ত পশুর শতকরা ৭৫ ভাগের মুখে এবং ২৫ ভাগের ক্ষুরে এ রোগের লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। ক্ষুরারোগ সব ঝুরুতেই দেখা যায়। তবে, বর্ষার শেষে এবং শরৎকালে এ রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়।



চিত্র ২৫ (ক, খ) : ক্ষুরারোগে আক্রান্ত গরুতে রোগলক্ষণ
ক—মুখ দিয়ে অতিরিক্ত লালা নির্গমন ও খ—ফোক্ষা ফেটে গিয়ে জিহ্বায় ক্ষত

রোগের লক্ষণ (Clinical Signs)

ক্ষুরারোগের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণসমূহ নিম্নরূপ—

- ◆ আক্রান্ত পশুর শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায় এবং তা সাধারণত $40^{\circ}-41.1^{\circ}$ সে. ($108^{\circ}-106^{\circ}$ ফা.) এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

ক্ষুরারোগ হলে পশুর শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। মুখ ও পায়ে ঘা হয়। খাদ্য গ্রহণে অনিহা ও মুখ থেকে সুতাকৃতির লালা নির্গত হয়। বাচ্চুরে এ রোগের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত বেশি।

- ◆ মুখে ক্ষত থাকার কারণে পশু খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না। ফলে ক্ষুধামন্দা দেখা দেয় এবং মুখে তীব্র বেদনাযুক্ত প্রদাহ শুরু হয়।
- ◆ মুখ থেকে অতিরিক্ত লালা নির্গমণ ঘটে এবং তা প্রায়শ সুতাকৃতি অবস্থায় ঝুলতে থাকে।
- ◆ পরবর্তীতে মুখ ও জিহ্বায় ফোক্ষা দেখা দেয়। চরিশ ঘন্টার মধ্যে এসব ফোক্ষা ফেটে বেদনাযুক্ত কাঁচা ঘায়ে পরিণত হয়। এ কারণে পশু হেতে পারে না। এসব ঘা শুকাতে প্রায় এক সপ্তাহ সময় লাগে।
- ◆ একই সময় এ রোগের লক্ষণ দুই ক্ষুরের ম্যাধ্ববর্তী স্থান (Cleft) এবং ক্ষুর-ত্বকের সংক্রমণে (Coronet) দেখা যায়। ক্ষতস্থানে ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের ফলে আরও জটিল হয়। ফলে আক্রান্ত পশু খুঁড়িয়ে হাঁটে। এ পর্যায়ে পায়ের নিচের অংশ ফুলে যায় এবং উক্ত স্থান গরম ও বেদনাদায়ক হয়।
- ◆ খাদ্য গ্রহণে অনিহা ও অক্ষমতার কারণে আক্রান্ত পশুর দৈহিক ওজন দ্রুত হ্রাস পায়। এ রোগ থেকে সেড়ে ওঠতে অন্তত ৬ মাস সময় লাগে।
- ◆ আক্রান্ত পশু দুঃখবর্তী হলে দুধের পরিমাণ অস্বাভাবিকভাবে হ্রাস পায়।
- ◆ অন্তরিক্ষ পশুতে এ রোগের তীব্রতা বয়স্ক পশুর চেয়ে অনেক বেশি।
- ◆ এ থেকে নিরাময়প্রাণ পশুর শাসকষ্ট, রক্ষণ্যতা এবং পরিবেশগত উচ্চ তাপমাত্রায় অসহিষ্ণুতা পরিলক্ষিত হয়।

রোগ নির্ণয় (Diagnosis)

আক্রান্ত পশুতে রোগের লক্ষণ ও উপসর্গসমূহ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুরারোগ নির্ণয় করা যায়। এসব লক্ষণ ও উপসর্গসমূহের মধ্যে অতিরিক্ত দৈহিক তাপমাত্রা, মুখগহর ও দুই ক্ষুরের সংযোগস্থলে প্রথমে ফোক্ষা এবং পরে ঘা, খোঢ়ানো এবং মুখ থেকে লালা পড়া উল্লেখযোগ্য। গরুর ভেসিকুলার স্টেমাটিটিস (Vesicular Stomatitis) রোগেও ক্ষুরারোগের ন্যায় মুখে ও পায়ে ফোক্ষা দেখা দেয়। তবে, আমাদের দেশে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বিরল।

চূড়ান্ত রোগ নির্ণয়ের জন্য গবেষণাগারে কম্প্লিমেন্ট ফিক্সেশন টেস্ট (Complement Fixation Test) করা হয়। এছাড়া আক্রান্ত পশুর ক্ষত থেকে সংগৃহীত নমুনা গিনিপিগে অনুপ্রবেশ করানো হলে যদি ৭–৮ দিনের মধ্যে অনুপ্রবেশ স্থান ও মুখে ফোক্ষা দেখা দেয় তাহলে ক্ষুরারোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।

চিকিৎসা (Treatment)

ভাইরাসজনিত রোগ বলে ক্ষুরারোগের কোনো কার্যকর চিকিৎসা নেই। তবে, ক্ষতস্থানসমূহ ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য স্থানীয়ভাবে জীবাণুনাশক এবং সাধারণভাবে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা যেতে পারে। পায়ের ক্ষতস্থানে সালফানিলামাইড পাউডার ব্যবহার করা যেতে পারে। আক্রান্ত পশুকে পরিষ্কার ও শুকনো স্থানে রাখতে হবে, তরল খাবার দিতে হবে এবং প্রয়োজন হলে নলের সাহায্যে খাওয়াতে হবে।

জটিলতা (Complications)

ক্ষুরারোগে আক্রান্ত পশুতে গর্তপাত, ওলানপ্রদাহ, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগ হতে পারে।

রোগ নিয়ন্ত্রণ (Control)

- ◆ পৃথিবীর অনেক দেশ ক্ষুরারোগমুক্ত। এসব দেশের মধ্যে ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড উল্লেখযোগ্য। এসব দেশে হঠাতে কোনো স্থানে ক্ষুরারোগ দেখা দিলে আক্রান্ত পশুকে মেরে মাটির নিচে পুতে রাখা হয়। আমাদের দেশে এ রোগের প্রাদুর্ভাব ব্যাপক বলে অনুরূপ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

পৃথিবীর অনেক দেশ, যেমন—
ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন,
ফিনল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড
ক্ষুরারোগমুক্ত।

- ◆ রাসায়নিক বিক্রিয়ার তারতম্য, সূর্যরশ্মি ও তাপ প্রয়োগের মাধ্যমে সহজেই এ ভাইরাস নিষ্কায় হয়।
- ◆ গবাদিপশুর চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কারণ, আক্রান্ত পশু একস্থান থেকে অন্যস্থানে চলাচলের ফলে রোগ বিস্তারলাভ করে।
- ◆ সঙ্গনিরোধ বা কোয়ারেন্টাইন (Quarantine) ব্যবস্থা যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে হবে। এ ব্যবস্থা ছাড়াই সীমান্তবর্তী দেশ ভারত থেকে প্রতিদিন অসংখ্য গরু বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করায় এ রোগ নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হয়ে পড়েছে।
- ◆ আক্রান্ত পশুকে সুস্থ পশু থেকে আলাদা করে রাখতে হবে যেন সুস্থ পশুতে এ রোগের বিস্তার নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- ◆ আক্রান্ত পশুর আবাসস্থল (গোয়াল ঘর) ২% সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড অথবা ৪% সোডিয়াম কার্বনেটস্লারা পরিষ্কার করতে হবে।
- ◆ এ রোগে মৃত পশুকে মাটির নিচে পুতে রাখতে হবে। কারণ, মৃতদেহ মুক্তস্থানে ফেলে রাখলে এ রোগের ভাইরাস সহজেই অন্যান্য পশুতে সংক্রমিত হয়। টিকা প্রয়োগের মাধ্যমে গবাদিপশুকে ক্ষুরারোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা যায়। এ রোগের টিকা নির্ধারিত মাত্রায় পশুর গলকম্বলের ত্বকের নিচে ইনজেকশন আকারে দেয়া হয়। টিকাগ্রাণ্ড পশু ৪–৬ মাস পর্যন্ত ক্ষুরারোগ প্রতিরোধ করতে পারে, অর্থাৎ প্রতি ৬ মাস অন্তর এ রোগের টিকা প্রদান করতে হবে। চার মাসের কম বয়সের পশুকে এ টিকা দেয়া হয় না। গর্ভবতী গাভীকে ক্ষুরারোগের টিকা দেয়া যায়।

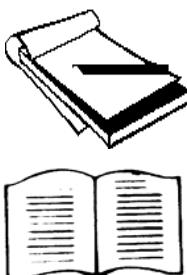
প্রতি দুই মাস অন্তর
ক্ষুরারোগের টিকা নির্ধারিত
মাত্রায় পশুর গলকম্বলের
ত্বকের নিচে ইনজেকশন
আকারে দেয়া হয়।

ক্ষুরারোগ থেকে সেড়ে উঠা
পশুর উৎপাদন ক্ষমতা, গর্ভধারণ
ক্ষমতা ইত্যাদি কমে যায়।

ক্ষতিকর প্রভাব (Bad Effects)

- ◆ ক্ষুরারোগের প্রাদুর্ভাব বাংলাদেশে ব্যাপক। প্রতি বছর অসংখ্য পশু এ রোগে আক্রান্ত হয়। এদের মধ্যে অনেক পশু, বিশেষ করে বাচ্চুর, মারা যায়।
- ◆ এ রোগের কারণে দীর্ঘদিন পশুকে কৃষিকাজে ব্যবহার করা যায় না। ফলে কৃষি উৎপাদন ব্যতৃত হয়।
- ◆ দৈহিক ওজনহ্রাস পাওয়ায় মাংসের উৎপাদন কমে যায়। দুঃখবতী গাভীর দুধ উৎপাদন কমে যায়। কাজেই এ রোগের কারণে প্রথম পর্যায়ে কৃষক এবং পরবর্তীতে জাতীয় অর্থনীতিতে বিকল্প প্রভাব পড়ে।
- ◆ এ রোগের কারণে পশুর গর্ভধারণ ক্ষমতা লোপ পেতে পারে, এমনকী গর্ভপাত হতে পারে যা কৃষকের জন্য খুবই ক্ষতিকর।

অনুশীলন (Activity) ৪ গৰুতে ক্ষুরারোগের লক্ষণ ও ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে লিখুন।



সারমর্ম ৪ ক্ষুরারোগ একটি অতি তীব্র প্রকৃতির সংক্রামক ভাইরাসজনিত রোগ। এ রোগ সকল বিভক্ত ক্ষুরবিশিষ্ট পশুতে দেখা যায়। আক্রান্ত পশুর মুখ ও পায়ে ঘা হয় এবং মুখ থেকে সুতাকৃতির লালা নির্গত হয়। দৈহিক তাপমাত্রা $40.0^{\circ}-41.1^{\circ}$ সেলসিয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এ রোগে পশু খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না এবং খুড়িয়ে হাঁটে। বয়স্ক পশু অপেক্ষা বাচ্চুরে এ রোগের মৃত্যুর হার বেশি। রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাস প্রধানত খাদ্য ও শ্বাসনালির মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে। আক্রান্ত পশুর লক্ষণ দেখে এ রোগ নির্ণয় করা যায়। তবে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয়ের জন্য গবেষণাগারে নমুনা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। ক্ষুরারোগের কোনো কার্যকর চিকিৎসা নেই। তবে ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমের জটিলতা প্রতিরোধের জন্য মুখ ও পায়ের ক্ষতস্থানে জীবাণুনাশক প্রয়োগ ও অ্যাস্টিবায়োটিক ব্যবহার করা যেতে পারে। টিকা প্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষুরারোগ প্রতিরোধ করা যায়। ক্ষুরারোগগত পশুর দৈহিক ওজন ও দুধ উৎপাদন কমে যায়। এছাড়া কর্মক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার কারণে কৃষি উৎপাদন ব্যতৃত হয়।



পাঠোভর মূল্যায়ন ২.১

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. ক্ষুরারোগ কী জাতীয় জীবাণুমারা সৃষ্টি হয়?

- i) ব্যাকটেরিয়া
- ii) ভাইরাস
- iii) মাইকোপ্লাজমা
- iv) রিকেটিশিয়া

খ. ক্ষুরারোগের ক্ষত চিহ্ন কোথায় দেখা যায়?

- i) গলকম্বল ও বুকে
- ii) ঘাড় ও পিঠে
- iii) মুখ ও পায়ে
- iv) শিং ও কানে

২। সত্য হলে ‘স’ এবং মিথ্যা হলে ‘মি’ লিখুন।

ক. ক্ষুরারোগে বাচুর বেশি মারা যায়।

খ. কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে ক্ষুরারোগ মহামারী আকার ধারণ করে।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. ক্ষুরারোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর নাম _____ এন্ড মাউথ ডিজিজ ভাইরাস।

খ. _____ মাসের কম বয়স্ক পশুতে ক্ষুরারোগের টিকা দেয়া হয় না।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. ক্ষুরারোগের লক্ষণ পায়ের কোন্ অংশে দেখা যায়?

খ. ক্ষুরারোগের টিকা পশুর শরীরের কোন্ স্থানে দেয়া হয়?

পাঠ ২.২ গবাদিপশুর বসন্ত



এ পাঠ শেষে আপনি –

- গবাদিপশুর বসন্ত কী এবং কী কারণে এ রোগ হয় তা বলতে পারবেন।
- এ রোগ কীভাবে সংক্রমিত এবং বিকশিত হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বসন্তের লক্ষণ, রোগ নিরূপণ, চিকিৎসা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আলোচনা করতে পারবেন।
- এ রোগের ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ লিখতে পারবেন।



গরু ও মহিষের বসন্ত রোগ (Cow and Buffalo Pox)

গরু ও মহিষের বসন্ত মৃদু অনিষ্টকারী ভাইরাসজনিত সংক্রামক রোগ। এ রোগে আক্রান্ত পশুর ওলান এবং বাটে বসন্তের গুটি দেখা যায়। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এ রোগের উপস্থিতি রয়েছে। তবে, উন্নত দেশসমূহে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বিরল। আমাদের উপমহাদেশে, বিশেষ করে বাংলাদেশ ও ভারতে, এ বসন্তের প্রকোপ বেশি এবং অনেক সময় এ রোগ মহামারী আকারে দেখা দেয়।

রোগের কারণ

গরুর বসন্ত ভাইরাস (Cow Pox Virus) এবং মহিষের বসন্ত ভাইরাস (Buffalo Pox Virus) সংক্রমণে যথাক্রমে গরু ও মহিষে এ রোগ সৃষ্টি হয়। তাছাড়া ঘোড়ার বসন্ত ভাইরাস (Horse Pox Virus) ও গুটি বসন্ত ভাইরাস (Small Pox Virus) গরুমহিষে সংক্রমিত হলেও বসন্তসদৃশ্য রোগ সৃষ্টি হতে পারে।

সংক্রমণ

- ◆ গরু ও মহিষের বসন্ত মৃদু প্রকৃতির ছোঁয়াচে রোগ। এ রোগ প্রধানত দুঃখবতী গাভীতে হয়ে থাকে। দুঃখ খামারের কোনো গাভীতে এ রোগ দেখা দিলে অন্ত সময়ের মধ্যেই তা খামারের সকল গাভীতে সংক্রমিত হয়।
- ◆ আক্রান্ত দুঃখবতী গাভী দোহনের পর দুধ দোহনকারীর হাতের মাধ্যমে এ রোগ সুস্থ গাভীতে সংক্রমিত হয়। দোহন যন্ত্রের মাধ্যমেও এ রোগ অতি দ্রুত বিস্তারলাভ করে।
- ◆ ঘোড়ার বসন্তের ভাইরাস গবাদিপশুতে সংক্রমিত হলে গরু ও মহিষের বসন্তের ন্যায় রোগ দেখা দিতে পারে।
- ◆ গুটি বসন্তের টিকা গ্রাহণকারী ব্যক্তি দুধ দোহন করলে তার মাধ্যমে গাভীতে এ রোগ সংক্রমিত হতে পারে।
- ◆ দুধের বাটে কোনোরূপ ক্ষত থাকলে গরু ও মহিষের বসন্তের ভাইরাস দেহে প্রবেশ করতে পারে।

রোগের বিকাশ

গরু ও মহিষের বসন্তের ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করার পর ৩–৭ দিন পর্যন্ত সুপ্তাবস্থায় থাকে। অতঃপর শরীরে মৃদু জ্বর ও ক্ষুধামন্দা দেখা দিতে পারে। বাট এবং বাটসংলগ্ন ওলানে লাল দাগ বা ফুসকুড়ি উঠে এবং এগুলো ৭ দিনের মধ্যে ফোক্ষাতে পারিণত হয়। এ ফোক্ষার মধ্যে লাল, নীল বা হলদে বাদামি রঙের রস জমা থাকে। ফোক্ষার এ রস ক্রমান্বয়ে পুঁজে পরিণত হয়। এ পর্যায়ে ফোক্ষার কেন্দ্র নিচু এবং এর চারপাশ উঁচু থাকে। অতঃপর ফোক্ষার উপর শক্ত আবরণ পড়ে। এ আবরণ ১৫ দিনের মধ্যে খসে পড়ে এবং আক্রান্ত পশু ত্রুমাস্থে আরোগ্য লাভ করে।

সরাসরি সংস্পর্শ, দোহনকারী
ও দোহনযন্ত্রের মাধ্যমে বসন্ত
ছড়ায়।

গরু ও মহিষের বসন্তের
ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করার
পর ৩–৭ দিন পর্যন্ত সুপ্তাবস্থায়
থাকে।

বসন্ত প্রধানত দুঃখবতী গাভীতে দেখা যায়।

রোগের লক্ষণ

- ◆ বসন্ত প্রধানত দুঃখবতী গাভীতে দেখা যায়। আক্রান্ত গাভীর ওলান ও বাটে বসন্তের গুটি দেখা দেয়। তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে এসব গুটি উরু, মলদ্বার এবং যৌনমুখের চারপাশে বিস্তৃত হতে পারে। এসব গাভী থেকে দুধ গ্রহণকারী বাচ্চুরের মুখের চারপাশে এ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে। ঘাঁড়ে কখনও বসন্ত দেখা দিলে অভিক্ষেপের ত্বকে সীমাবদ্ধ থাকে।
- ◆ আক্রান্ত গাভীর বাট ও ওলানে হলুদাত বাদামি অথবা লাল রঙের অনধিক দুই সেন্টিমিটার ব্যাসবিশিষ্ট মামড়ি দেখা দেয়। সাধারণত ২ সঙ্গাহের মধ্যে এসব চিহ্ন বিলুপ্ত হয় এবং পশু আরোগ্য লাভ করে। তবে, কখনও কখনও এ রোগ থেকে পরিত্রাণ পেতে মাসাধিককাল সময় লাগে।
- ◆ বাটে ব্যাথা অনুভূত হওয়ায় গাভী দুধ দোহনে বাধা দেয়।
- ◆ বসন্তের ফলে গাভীর ওলানপ্রদাহ দেখা দিতে পারে।
- ◆ আক্রান্ত গাভীতে দুধ দোহনের কারণে দোহনকারীর হাতে, বাহ্যে এবং মুখমণ্ডলে এ রোগের লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

রোগ নির্ণয়

রোগের লক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে গরু ও মহিষের বসন্ত সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যেতে পারে। তবে সিউডোকাউ পক্র (Pseudocow Pox), বোভাইন আলসারেটিভ মেমিলাইটিস (Bovine Ulcerative Mammilitis), পেপিলোমা (Papilloma) প্রভৃতি রোগে বসন্তসদৃশ লক্ষণ দেখা দিতে পারে। আক্রান্ত পশুর বাট ও ওলানের ক্ষতস্থান থেকে সংগৃহীত নমুনা গবেষণাগারে পরীক্ষা করে এ বসন্তের ভাইরাস চিহ্নিত করা যায়। এ রোগের ভাইরাস মূরগির জ্বরে বংশবৃদ্ধি করালে গাঢ় লাল রঙের ‘পক লিশন (Pock Lesion)’ তৈরি করে।

চিকিৎসা

ভাইরাসজনিত রোগ হওয়ায় গরু ও মহিষের বসন্তের কোনো কার্যকর চিকিৎসা নেই। তবে ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের মাধ্যমে জটিলতা সৃষ্টি রোধকলে স্থানীয়ভাবে জীবাণুনাশক এবং সাধারণভাবে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা যেতে পারে। দোহনের পূর্বে ১০% সালফাথায়াজল মলম অথবা ৫% সালফাথায়াজল ও ৫% স্যালিসাইলিক অ্যাসিডের সংমিশ্রণে প্রস্তুত মলম বাটে ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়।

রোগ নিয়ন্ত্রণ

গরু ও মহিষের বসন্ত নিয়ন্ত্রণ করা বেশ কষ্টকর। গরু ও মহিষের বসন্তের বিরুদ্ধে কোনো ফলপ্রস্থু টিকা নেই। তবে আক্রান্ত পশু পরবর্তী কয়েক বছরের জন্য রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়।

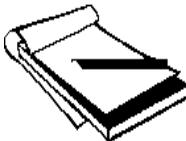
ক্ষতিকর প্রভাব

প্রথমেই বলা হয়েছে, গরু ও মহিষের বসন্ত একটি কম ক্ষতিকর ভাইরাসজনিত রোগ। এ রোগে আক্রান্ত গাভীর দুধ তেমন একটা হাস পায় না। তবে, বাটের ক্ষত কাঁচা থাকা অবস্থায় বেদনার কারণে অনেক সময় দুধ দোহনে বাধা দেয়। এ রোগের কারণে দুধ খাওয়ার অনুপযোগী হয় না। এ বসন্তের জটিলতা হিসেবে ওলানপ্রদাহ দেখা দিতে পারে। এক্ষেত্রে দুধ উৎপাদন ব্যতীত হয়।

ভাইরাসজনিত রোগ হওয়ায় গরু ও মহিষের বসন্তের কোনো কার্যকর চিকিৎসা নেই। তবে ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের মাধ্যমে জটিলতা সৃষ্টি রোধকলে স্থানীয়ভাবে জীবাণুনাশক এবং সাধারণভাবে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা যেতে পারে। দোহনের পূর্বে ১০% সালফাথায়াজল মলম অথবা ৫% সালফাথায়াজল ও ৫% স্যালিসাইলিক অ্যাসিডের সংমিশ্রণে প্রস্তুত মলম বাটে ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়।

গরু ও মহিষের বসন্ত নিয়ন্ত্রণ করা বেশ কষ্টকর। গরু ও মহিষের বসন্তের বিরুদ্ধে কোনো ফলপ্রস্থু টিকা নেই।

গরু ও মহিষের বসন্ত একটি কম ক্ষতিকর ভাইরাসজনিত রোগ। এর জটিলতা হিসেবে ওলানপ্রদাহ দেখা দিতে পারে।



অনুশীলন (Activity) ১ গুরু ও মহিষের বসন্ত নিয়ন্ত্রণের জন্য আপনি কী কী পদ্ধা অবলম্বন করবেন?

ছাগল ও ভেড়ার বসন্ত একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ। এ রোগের ফলে ছাগল ও ভেড়ার ত্বকের মধ্যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এশিয়া, আফ্রিকা এবং উত্তর-পূর্ব ইউরোপের ছাগল ও ভেড়ায় এ রোগ বেশ দেখা দেয়। ছাগলের বসন্ত রোগের সুষ্ঠিকাল (Incubation Period) হলো ৫–১৪ দিন এবং ভেড়ার মধ্যে এ রোগের সুষ্ঠিকাল ৪–৮ দিন। উভয় প্রকার পশুতে এ রোগের লক্ষণ একই। এ রোগ মড়ক আকারে দেখা দেয়।

ছাগল ও ভেড়ার বসন্ত রোগ (Goat and Sheep Pox)

ছাগল ও ভেড়ার বসন্ত একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ। এ রোগের ফলে ছাগল ও ভেড়ার ত্বকের মধ্যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এশিয়া, আফ্রিকা এবং উত্তর-পূর্ব ইউরোপের ছাগল ও ভেড়ায় এ রোগ বেশ দেখা দেয়। ছাগলের বসন্ত রোগের সুষ্ঠিকাল (Incubation Period) হলো ৫–১৪ দিন এবং ভেড়ার মধ্যে এ রোগের সুষ্ঠিকাল ৪–৮ দিন। উভয় প্রকার পশুতে এ রোগের লক্ষণ একই। এ রোগ মড়ক আকারে দেখা দেয়।

রোগের কারণ

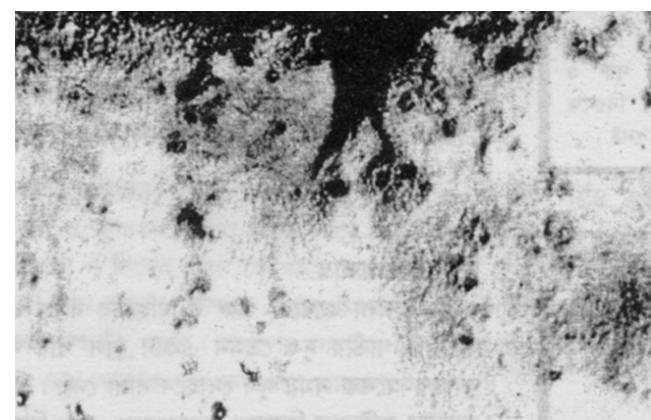
Goat Pox Virus এবং Sheep Pox Virus যথাক্রমে ছাগল ও ভেড়ার বসন্ত রোগের একমাত্র কারণ।

সংক্রমণ

- ◆ বাতাসের মাধ্যমে এ রোগের জীবাণু একস্থান হতে অন্যস্থানে ছড়ায়। তাছাড়া শ্বাসপ্রশ্বাসের ফলেও সংক্রমিত হয়।
- ◆ সুস্থ পশু অসুস্থ পশুর সংস্পর্শে আসলে সংক্রমিত হয়।
- ◆ কীট- পতঙ্গের মাধ্যমেও এ রোগের জীবাণু অসুস্থ পশু থেকে সুস্থ পশুতে ছড়তে পারে।



চিত্র ২৬ : ভেড়ার মুখ্যমন্ডলে বসন্তের ক্ষত



চিত্র ২৭ : ভেড়ার দেহে বসন্তের ক্ষত

রোগের লক্ষণ

- ◆ জুর এবং বিভিন্ন ধরনের অসুবিধা পরিলক্ষিত হয়।
- ◆ চোখের পাতা ফুলে যায় এবং নাক দিয়ে পানি ঝরে।
- ◆ দেহের বিভিন্ন লোমবিহীন স্থানে, বিশেষ করে চোয়াল, কান, ওলান, লেজের নিচে, লালচে গুটি দেখা যায়।
- ◆ নাকের বহিভাগে, মুখ গহবরে ক্ষত দেখা দেয়।
- ◆ চামড়ার উপরের অংশ উর্তে যায় এবং শক্ত স্ক্যাব (Scab) সৃষ্টি হয়।

রোগ নির্ণয়

- ◆ রোগের লক্ষণ দেখে।
- ◆ আক্রান্ত পশুর চামড়ার গুটি থেকে নমুনা সংগ্রহ করে Direct Flourescent Antibody Test এর মাধ্যমে ভাইরাস শণাক্ত করা যায়।

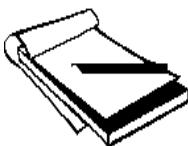
প্রতিরোধ

- ◆ টিকাবীজ প্রয়োগে— লাইভ এবং ইনঅ্যাকটিভেটেড বসন্ত টিকাবীজ ছাগল ও ভেড়ায় সুস্থ অবস্থায় প্রয়োগ করলে এ রোগ হয় না। তবে, লাইভ টিকাবীজ ইনঅ্যাকটিভেটেড টিকাবীজের চেয়ে অধিক ফলপ্রসু। তাই লাইভ টিকাবীজ ব্যবহার করাই শ্রেয়।
- ◆ যেসব উপায়ে এ রোগ সংক্রমিত হয়ে থাকে সেসব উৎস প্রতিহত করলে এ রোগ না হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- ◆ আক্রান্ত পশুকে সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ বা সঙ্গনিরোধ করা (Quarantine)।
- ◆ এ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া পশুকে মাটির নিচে পুঁতে ফেলতে হবে।

চিকিৎসা

- ◆ যেহেতু বসন্ত ভাইরাসজনিত রোগ তাই এর কোনো সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই। তবে, মাধ্যমিক ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণ রোধ করার জন্য যে কোনো উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- ◆ চামড়ার ক্ষতস্থানে যে কোনো সালফানিলামাইড মলম ব্যবহার করা যেতে পারে।

অনুশীলন (Activity) ৪ গৱাদিপশুর ভাইরাসজনিত রোগ সেহেতু এর কোনো সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই। তবে, মাধ্যমিক ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণ রোধ করার জন্য যে কোনো উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করা যেতে পারে।



সার্বর্ম ৪ গৱাদিপশু ও মহিষের বসন্ত একটি মৃদু প্রকৃতির ভাইরাসজনিত সংক্রামক রোগ। এ রোগে প্রধানত দুঃখবতী গাভী আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত গাভীর ওলান ও বাটে বসন্তের গুটি দেখা যায়। দোহনকারীর হাত ও দোহন যন্ত্রের মাধ্যমে এ রোগ অন্যান্য পশুতে ছাড়িয়ে পড়ে। রোগলক্ষণ পর্যবেক্ষণ ও গবেষণাগারে নমুনা পরীক্ষার মাধ্যমে গৱাদিপশু ও মহিষের বসন্ত নিরূপণ করা হয়। এ রোগের কোনো কার্যকর চিকিৎসা নেই। এ বসন্ত প্রতিরোধ করার কোনো ফলপ্রসু টিকাও এ পর্যন্ত আবিস্কৃত হয় নি। তবে এ রোগ থেকে নিরাময়প্রাপ্ত গাভী পরবর্তী কয়েক বছরের জন্য রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা লাভ করে। কিন্তু, ছাগল ও ভেড়ার বসন্ত একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ। এ রোগে ছাগল ও ভেড়ার লোমবিহীন স্থান, যেমন— চোয়াল, কান, ওলান ও লেজের নিচে লালচে গুটি দেখা যায়। গৱাদিপশু ও মহিষের বসন্তের মতোই এ রোগ শণাক্ত করা যায়। এ রোগ প্রতিরোধের জন্য দুধরণের ফলপ্রসু টিকা রয়েছে।



পাঠোভর মূল্যায়ন ২.২

১। **সঠিক উত্তরে পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।**

ক. গরু ও মহিষের বসন্তের জীবাণু পশুর শরীরে কতদিন পর্যন্ত সুষ্ঠাবস্থায় থাকে?

- i) ৭ দিন
- ii) ১৫ দিন
- iii) ২৯ দিন
- iv) ৪১ দিন

খ. দোহনকারীর শরীরের কোথায় বসন্তের লক্ষণ দেখা যায়?

- i) পিঠে
- ii) মাথায়
- iii) হাতে
- iv) নিতম্বে

২। **সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।**

ক. গরু ও মহিষের বসন্ত হলে শরীরের তাপমাত্রা অত্যধিক বেড়ে যায়।

খ. বসন্ত রোগে আক্রান্ত পশু দুধ দোহনে বাধা দেয় না।

৩। **শূন্যস্থান পূরণ করুন।**

ক. দোহনকারীর _____ মাধ্যমে গরু ও মহিষের বসন্ত সংক্রমিত হয়।

খ. বসন্ত রোগের বিরুদ্ধে কোনো ফলপ্রসূ _____ নেই।

৪। **এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।**

ক. শাঁড়ের শরীরের কোথায় বসন্ত রোগের লক্ষণ দেখা যায়?

খ. মুরগির অঙ্গে বসন্ত রোগ কী চিহ্ন তৈরি করে?

পাঠ ২.৩ জলাতক্ষ



এ পাঠ শেষে আপনি –

- জলাতক্ষ কী তা বলতে পরবেন এবং এ রোগের বিস্তৃতি ও কারণ আলোচনা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন পশুতে কীভাবে জলাতক্ষ রোগ সংক্রমিত হয় ও বিকাশলাভ করে তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- জলাতক্ষ রোগে আক্রান্ত পশুর লক্ষণ ও মৃত্যুর কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- জলাতক্ষ রোগ নির্ণয়ের বিভিন্ন পদ্ধতি ও পরিণতি সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- জলাতক্ষ রোগ নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন কৌশল ও পদ্ধা বর্ণনা করতে পারবেন।



জলাতক্ষ কী?

জলাতক্ষ (Rabies) একটি মারাত্মক ভাইরাসজনিত রোগ। মানুষসহ সকল উষ্ণ রক্তবাহী (Warm Blooded) পশু এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। তবে, প্রাকৃতিক পরিবেশে কুকুর, বিড়াল, শৃঙ্গাল, গরু, মাংসাশি বন্যপ্রাণী, বাদুড় প্রধানত বেশি আক্রান্ত হয়। পাগলা কুকুরের দংশনে সৃষ্ট এ রোগে পশুর কেন্দ্রীয়মাঝুত্ত্ব আক্রান্ত হয়। পশু উন্নাদ ও আক্রমণাত্মক হয় এবং পরবর্তীতে উর্ধমুখী অবশতা বা প্যারালাইসিস (Paralysis) দেখা দেয়। এ রোগে অন্তনালিন উপরে অবস্থিত গহ্বর অর্থাৎ গলবিল বা ফ্যারিঙ্সের (Pharynx) পেশির শিথিলতার কারণে পানি গ্রহণ করতে পারে না। এমতাবস্থায়, আক্রান্ত পশু পানি দেখলে ভয় পায় বলে এ রোগের নাম দেয়া হয়েছে জলাতক্ষ বা হাইড্রোফোবিয়া (Hydrophobia)।

রোগের বিস্তৃতি

জলাতক্ষ পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই পাওয়া যায়। তবে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, যুক্তরাজ্য, হাওয়াই দ্বীপপুঁজে এ রোগের প্রাদুর্ভাব নেই বললেই চলে।

রোগের কারণ

রেবিস নামক এক প্রকার ভাইরাস এ রোগ সৃষ্টি করে। এ ভাইরাস বুলেট আকৃতির। এর দুটো প্রধান টাইপ রয়েছে। যথা – স্ট্রিট ভাইরাস ও ফিলাডেলিপিয়া ভাইরাস। স্ট্রিট ভাইরাস প্রাকৃতিক পরিবেশে রোগের সৃষ্টি করে। এ ভাইরাস খুবই বিপদজনক। পক্ষান্তরে, ফিলাডেলিপিয়া ভাইরাস গবেষণাগারে তৈরি করা হয়। স্ট্রিট ভাইরাস পুনঃগুণন মুরগির জ্বরের মধ্যে বংশবৃদ্ধির ফলে ফিলাডেলিপিয়া ভাইরাসে পরিণত হয়। এ ভাইরাসের রোগ সৃষ্টির ক্ষমতা কম বলে প্রতিষেধক বা টিকা তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়।

সংক্রমণ

আক্রান্ত অথবা ভাইরাস বহনকারী পশু অন্য কোনো পশুকে কামড় দিলে যে ক্ষত সৃষ্টি হয় সে ক্ষতস্থানে সদ্য নির্গত লালার মাধ্যমে ভাইরাস শরীরের প্রবেশ করে। আমাদের দেশে প্রধানত পাগলা কুকুরের কামড়ে জলাতক্ষ রোগ বিস্তারলাভ করে। বাদুড় এ রোগের জীবাণু বহন করে এবং কোনো পশুকে কামড়ালে সে পশু জলাতক্ষ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। বাদুড় এ ভাইরাস কেন্দ্রীয়মাঝুত্ত্ব আক্রমণ না করেই শরীরে ভাইরাস বহন করে এবং অন্য কোনো পশুকে কামড় দিলে সহজেই এ রোগ সংক্রমিত হয়। বন্যপ্রাণীর মধ্যে নেকড়ে, হায়েনা, বানর, বেজি, কাঠবিড়ালী প্রভৃতির মাধ্যমেও এ রোগের বিস্তার ঘটে। শ্বাসনালি ও পৌষ্টিকনালির মাধ্যমে এ রোগ ছড়াতে পারে।

গ্রীষ্মের শেষে এবং শরৎকালে জলাতক্ষ রোগের প্রকোপ বেশি। কারণ, এ সময় কুকুরসহ বন্যপ্রাণীর প্রজননের উদ্দেশ্যে তৎপর থাকে বিধায় এদের আচরণ অত্যন্ত ক্ষীণ ও হিংস্র হয়। গবাদিপশু থেকে

রেবিস নামক এক প্রকার ভাইরাস জলাতক্ষ সৃষ্টি করে।
এ ভাইরাস বুলেট আকৃতির।

আমাদের দেশে প্রধানত পাগলা কুকুরের কামড়ে জলাতক্ষ রোগ বিস্তারলাভ করে।

গ্রীষ্মের শেষে এবং শরৎকালে জলাতক্ষ রোগের প্রকোপ বেশি।

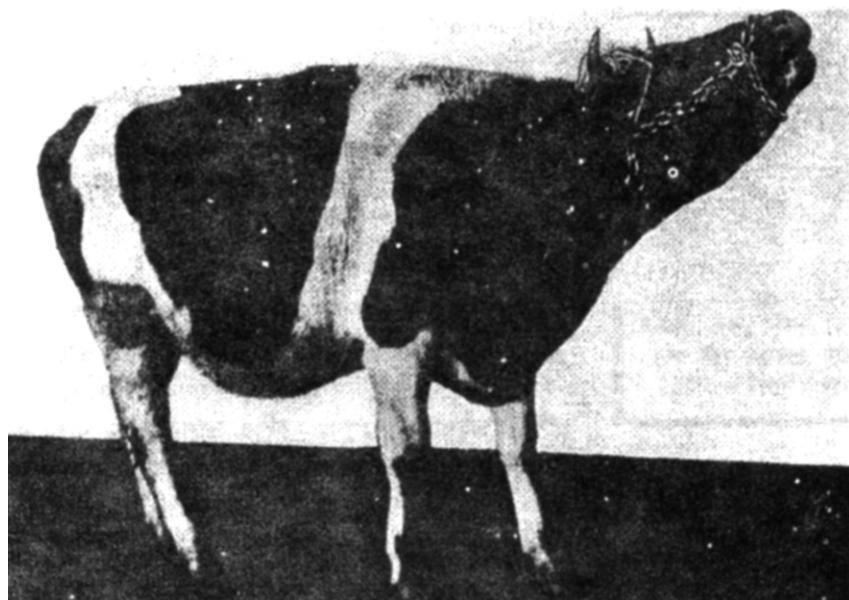
জলাতক্ষ রোগের বিস্তার কদাচিং ঘটে। তবে, নগ্ন ক্ষতযুক্ত হাতম্মারা আক্রান্ত পশুর মুখ পরীক্ষাকালে ক্ষতস্থান লালার সংস্পর্শে আসলে এ রোগ সংক্রমিত হতে পারে।

রোগের বিকাশ

ভাইরাস বহনকারী লালা ক্ষতস্থানে অবস্থিতম্মায়ুর সংস্পর্শে আসে এবং এর মাধ্যমে ভাইরাস কেন্দ্রীয়ম্মায়ুতন্ত্রে পৌঁছে। গবেষণার মাধ্যমে দেখা গেছে, ক্ষতস্থান থেকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে মেরামজ্জুতে পৌঁছে এবং ৪-৫ দিনের মধ্যে এর কলাতে সংক্রমিত হয়। মেরামজ্জুতে পৌঁছার পর ভাইরাস উর্ধম্মথে যাত্রা করে মন্তিক্ষে পৌঁছে। এখান থেকেম্মায়ুর মাধ্যমে ভাইরাস লালাগ্রাহিতে প্রবেশ করে।

রোগের লক্ষণ

গবাদিপশুর মধ্যে গরুই সর্বাপেক্ষা বেশি আক্রান্ত হয়। জলাতক্ষে আক্রান্ত প্রাণী কামড়ানোর পর গরুতে সাধারণত ৩ সপ্তাহের মধ্যে রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। তবে, অধিকাংশ প্রজাতির পশুতে লক্ষণ প্রকাশের জন্য ২ সপ্তাহ থেকে কয়েকমাস পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। সকল প্রজাতির পশুই সাধারণত একই প্রকার লক্ষণ প্রদর্শন করে। এ রোগে আক্রান্ত পশুর আচরণে লক্ষণীয় পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। সাধারণত লক্ষণ প্রকাশের প্রথমদিকে উত্তেজনা ও পরে শিথিলতা দেখা দেয়। শারীরিক তাপমাত্রার কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় না। মুখ থেকে লালা নির্গত হয়, ঘন ঘন প্রস্রাব করে এবং পুরুষ পশুতে সাময়িকভাবে অতিরিক্ত যৌনানুভূতি দেখা দেয়। লক্ষণ অনুযায়ী জলাতক্ষ প্রধানত দুই প্রকারের হয়ে থাকে। যথা— শিথিল রূপ ও উত্তেজিত রূপ।



চিত্র ২৮ : জলাতক্ষ রোগে আক্রান্ত একটি গরু

শিথিল রূপ (Paralytic Form) : এ প্রকৃতির জলাতক্ষে গলা এবং চাবানোর জন্য ব্যবহৃত পেশি অবশ্য হয়ে যায়। মুখ থেকে প্রচুর লালা নির্গত হয় ও গলধকরণ ক্ষমতা লোপ পায়। কুকুরের নিচের চোয়াল ঝুলে পড়ে এবং কদাচিং দণ্ডন করে। পরবর্তীতে সারা শরীর অবশ্য হয়ে যায় এবং কয়েক ঘন্টার মধ্যেই মৃত্যু ঘটে।

গরু হাঁটার সময় পিছনের পায়ের স্বাভাবিক ছন্দ হারিয়ে যায়, লেজ নিশ্চল হয়ে পড়ে এবং ডান অথবা বামে স্থানচ্যুত হয়। পিছনের পায়ের অনুভূতি কমে যায় এবং দুর্বলতার কারণে হঠাতে মাটিতে

লুটিয়ে পড়তে পারে। মুখ থেকে সুতাকৃতির লালা নির্গত হয় এবং মিটিতে লুটিয়ে পড়ার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে এবং লক্ষণ দেখা দেয়ার ৬-৭ দিনের মধ্যে গরু মারা যায়।

উভেজিত ধরনের জলাতকে
আক্রান্ত প্রাণী কান্ডজন
হারিয়ে ফেলে এবং অত্যন্ত
উভেজিত ও আক্রমণাত্মক

উভেজিত রূপ (Furious Form) : এ ধরনের জলাতকে আক্রান্ত প্রাণী কান্ডজন হারিয়ে ফেলে এবং অত্যন্ত উভেজিত ও আক্রমণাত্মক হয়। এসব পশুর চক্ষুতারা প্রসারিত হয় এবং সকল প্রকার ভয়ভািতি লোপ পায়। এ অবস্থায় কোনো অবস্থার লক্ষণ দেখা যায় না। আক্রান্ত কুকুর লক্ষণ প্রকাশের পর সাধারণত ১০ দিনের বেশি বাঁচে না। তবে, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত রাস্তাঘাটে মানুষ, গরু, অন্যান্য পশু এমনকী চলত বস্তকে দংশন করে। এ পর্যায়ে আক্রান্ত পশু বিঠা, খড়, লাঠি, পাথর ইত্যাদি অথাদ্য বস্তু খাওয়ার চেষ্টা করে। এ রোগের আরও বিকাশলাভের সাথে সাথে পেশির সমন্বয়হীনতা এবং খিঁচুনি পরিলক্ষিত হয়। অবশেষে সারা শরীর অবশ হয়ে পড়ে এবং পশু মারা যায়।

গরুর ক্ষেত্রেও অনেকটা একই ধরনের লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। আক্রান্ত পশু অতিরিক্ত সতর্ক হয়, শব্দ ও নড়াচড়াতে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখায়। কখনও কখনও অন্য পশু বা কোনো বস্তকে আক্রমণ করে এবং উচ্চস্বরে হাস্বা হাস্বা করে। আক্রান্ত সাঁড় অতিরিক্ত যৌনানুভূতির কারণে অন্য পশু অথবা অপ্রাণী বস্তুর উপর বাঁপিয়ে পড়ে। এ ধরনের লক্ষণ প্রদর্শনের ২৪-৪৮ ঘন্টার মধ্যে অবশতার কারণে পশু হঠাতে করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং কয়েক ঘন্টার মধ্যে মারা যায়।

কেন্দ্রীয়মাঝুতত্ত্ব থেকে দংশন স্থানের দূরত্বের তারতম্যের কারণে
রোগলক্ষণ প্রকাশের সময় প্রভাবিত হয়।

মানুষের ক্ষেত্রে পাগলা কুকুরে দংশনের ৩০-৬০ দিনের মধ্যে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। তবে দংশনের পর সর্বনিম্ন ২ সপ্তাহ এবং সর্বোচ্চ ২ বৎসর পরও এ রোগের লক্ষণ দেখা দিতে পারে। কেন্দ্রীয়মাঝুতত্ত্ব থেকে দংশন স্থানের দূরত্বের তারতম্যের কারণে রোগলক্ষণ প্রকাশের সময় প্রভাবিত হয়। আক্রান্তস্থান মাথার নিকট হলে রোগলক্ষণ তাড়াতাড়ি প্রকাশ পায়। আবার পিছনের পায়ের নিচের অংশ দংশিত হলে রোগলক্ষণ দেখা দিতে বিলম্ব হয়। জলাতক রোগে আক্রান্ত মানুষে প্রথমে মাথা ব্যাথা, ক্ষুধামন্দা ও বমিভাব পরিলক্ষিত হয়। গলা শুকিয়ে আসে, অতিরিক্ত ত্বক অনুভূত হয় অথচ পানি পানে অনিহা দেখা দেয়। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে উভেজনা ও শারীরিক অবশতা দেখা দেয় এবং এরপ লক্ষণ দেখা দেয়ার ২-৬ দিনের মধ্যে আক্রান্ত পশু মারা যায়।

মৃত্যুর কারণ

দংশনের পর ভাইরাসমাঝুতত্ত্বের মাধ্যমে যতই উর্ধ্মুখে উঠতে থাকে ততইমাঝুকোষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং ফলশ্রুতিতে শরীরে অবশতা পরিলক্ষিত হয়। এ জীবাণুর আক্রমণ মস্তিষ্কে পৌছলে উন্নাদনা, উভেজনা, ক্ষিপ্রতা ও খিঁচুনি দেখা দেয়। মস্তিষ্কে শ্বসন কাজের জন্য নির্ধারিতমাঝুকোষসমূহ ধ্বংস হলে শ্বসনকার্য বন্ধ হয়ে পশু মারা যায়।

রোগ নির্ণয়

জলাতক রোগ নির্ণয় করা বেশ কঠিন এবং বিপদসংকুল। কেননা এ রোগ মানুষে সংক্রমিত হতে পারে। আক্রান্ত পশুর লক্ষণ দেখে সাধারণত রোগ নির্ণয় করা হয়। তবে, মালিক অথবা পালক কর্তৃক পাগলা কুকুরে দংশনের অভিযোগ থাকলে এ রোগ সম্পর্কে অনেকটা নিশ্চিত হওয়া যায়। দংশনকারী কুকুরবিড়ালকে ১০ দিন পর্যন্ত আটক রাখা হলে যদি জলাতকের লক্ষণ দেখা দেয় তাহলে উক্ত প্রাণী মেরে তার মস্তিষ্ক গবেষণাগারে পরীক্ষা করে এ রোগের উপস্থিতি নির্ণয় করা যায়। ফ্লোরোসেন্ট অ্যান্টিবডি স্টেইনিং টেকনিক (Fluorescent Antibody Staining Technique) এর মাধ্যমে কয়েক ঘন্টার মধ্যে এ রোগ নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করা যায়। এক্ষেত্রে মৃত পশুর মস্তিষ্কের হিপোক্যাম্পাস (Hippocampus) অথবা মেডুলা অবল্যাংগটা (Medulla Oblangata) থেকে ইমপ্রেশন স্মিয়ার (Impression Smear) তৈরি করা হয়।

রোগের পরিণতি

জলাতক একটি মারাত্মক জীবনহরণকারী রোগ। এ রোগের লক্ষণ একবার দেখা দিলে অবধারিত পরিণতি মৃত্যু।

চিকিৎসা

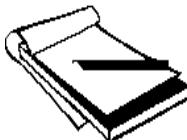
জলাতক্ষ ভাইরাসজনিত রোগ হওয়ায় এর কোনো কার্যকর চিকিৎসা নেই। তবে, দংশনের পরপরই ক্ষতস্থান ২০% কোমল সাবান পানি উত্তমরূপে ধৌত করলে উপকার পাওয়া যায়। রোগের লক্ষণ দেখা দেয়ার পর টিকার কোনো কার্যকারিতা থাকে না। তবে, জলাতক্ষ আক্রান্ত কুকুর কোনো পশুকে দংশন করলে অনতিবিলম্বে এ রোগের প্রতিষেধক ব্যবহার করে জীবন রক্ষা করা যায়।

রোগ নিয়ন্ত্রণ

রাস্তাঘাটের যাবতীয় বেওয়ারিশ কুকুরবিড়াল মেরে ফেলতে হবে। সকল পোষা কুকুরবিড়ালকে যথারীতি প্রতিষেধক দিতে হবে। বনেজঙ্গে অবস্থানরত সংক্রমণকারী পাণী, যেমন— মেকড়ে, হায়েনা, বানর, শিয়াল, বেজি, কাঠবিড়ালী যথাসম্ভব মেরে ফেলতে হবে। ইউরোপে বন্যপ্রাণীর মধ্যে শিয়াল ৮৫% রোগ সংক্রমিত করে। আমাদের দেশেও এ রোগ বিস্তারে কুকুরের পরেই শিয়ালের স্থান। কাজেই এ রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য শিয়াল নিধন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটা একটা দুরহ কাজ বিধায় এ রোগের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ অনেকটা অসম্ভব।

এদেশে জলাতক্ষ নিয়ন্ত্রণ করতে অবিলম্বে বিদেশ থেকে আগত কুকুরবিড়ালের জন্য কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন।

টিকা প্রয়োগের মাধ্যমে জলাতক্ষের বিস্তার সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়।



জলাতক্ষ নিয়ন্ত্রণের জন্য অবিলম্বে বিদেশ থেকে আগত কুকুরবিড়ালের জন্য কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন। এ ব্যবস্থায়, বিদেশ থেকে আসা সকল কুকুরবিড়ালকে ৩–৬ মাস পর্যন্ত পৃথকভাবে রাখা হয়। এ সময়ের মধ্যে জলাতক্ষ রোগের লক্ষণ না দেখা দিলে ঐসব পশুকে দেশের অভ্যন্তরে নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়। দ্বিপরাষ্ট্রের জন্য কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থা কার্যকর। কিন্তু যেসব দেশের মধ্যে সাধারণ স্থলসীমা বিদ্যমান সেসব দেশে এ ব্যবস্থা রোগ নিয়ন্ত্রণে তেমন ভূমিকা রাখে না। টিকা প্রয়োগের মাধ্যমে এ রোগের বিস্তার সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বাংলাদেশে জলাতক্ষ রোগের জন্য দুপ্রকার টিকা বা ভ্যাকসিন রয়েছে। লেপ (LEP = Low Embryo Passage) টিকা কুকুরে ও হেপ (HEP = High Embryo Passage), টিকা গবাদিপশুতে প্রয়োগ করা হয়। এসব টিকা প্রয়োগ করলে পশু এক বৎসর পর্যন্ত জলাতক্ষ রোগ প্রতিরোধ করতে পারে।

অনুশীলন (Activity) : জলাতক্ষ রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য আপনি কী কী কোশল গ্রহণ করবেন তা খাতায় লিখুন।

সারমর্ম : জলাতক্ষ একটি মারাত্মক ভাইরাসজনিত সংক্রমক রোগ। এ রোগের লক্ষণ একবার প্রকাশ পেলে মৃত্যু অবধারিত। মানুষসহ সকল উষ্ণ রক্তবাহী পশু জলাতক্ষ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এ রোগ প্রধানত পাগলা কুকুরশিয়ালের দংশনে সংক্রমিত হয়। আক্রান্ত পশু প্রথমে উত্তেজিত ও আক্রমণাত্মক হয়। পরবর্তীতে উত্তরমুখী প্যারালাইসিসের কারণে পশু নিশ্চল হয়ে পড়ে এবং এক পর্যায়ে মৃত্যুবরণ করে। পাগলা কুকুরে কামড়ানোর অভিযোগ ও আক্রান্ত পশুর লক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে এ রোগ নির্ণয় করা যায়। লক্ষণ প্রকাশের পর এ রোগের কোনো চিকিৎসা নেই। তবে, কুকুরে কামড়ানোর পরপরই অ্যান্টির্যাবিস ভ্যাকসিন প্রয়োগের মাধ্যমে জলাতক্ষ রোগ প্রতিরোধ করা যায়। রাস্তাঘাটের কুকুরশিয়াল নিধন ও নিয়মিত টিকা প্রদানের মাধ্যমে এ রোগের বিস্তার অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।



পাঠোভর মূল্যায়ন ২.৩

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. জলাতক্ষ ভাইরাস শরীরে প্রবেশের পর কোন বিশেষ অংশে আক্রমণ করে?

- i) মাংশপেশি
- ii) অঙ্কোষথলি
- iii) কেন্দ্রীয়স্থায়ুতন্ত্র
- iv) ফুসফুস

খ. জলাতক্ষ রোগে আক্রান্ত পশুর পরিণতি কী হয়?

- i) পাগল হয়
- ii) দীর্ঘজীবী হয়
- iii) আরোগ্য লাভ করে
- iv) অবধারিত মৃত্যু

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. বিড়াল জলাতক্ষ বিস্তারে প্রধান ভূমিকা পালন করে।

খ. জলাতক্ষ রোগে নিম্নমুখী প্যারালাইসিস দেখা দেয়।

৩। শূণ্যস্থান পূরণ করুন।

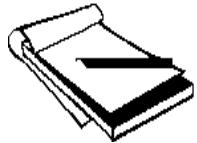
ক. _____ ব্যবহার করে জলাতক্ষ রোগের বিস্তার নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

খ. গবেষণাগারে তড়িৎ রোগ নির্ণয় পদ্ধতির নাম _____ অ্যান্টিবডি স্টেইনিং টেকনিক।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. জলাতক্ষ ভাইরাসের প্রধান দুটো টাইপের নাম কী?

খ. জলাতক্ষ রোগের প্রধান দুটো রূপের নাম কী?



চৃড়ান্ত মূল্যায়ন – ইউনিট ২

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন

- ১। ক্ষুরারোগ কী?
- ২। গরুতে কীভাবে ক্ষুরারোগ বিকাশলাভ করে?
- ৩। কীভাবে আক্রান্ত গরুতে ক্ষুরারোগ নির্ণয় করা হয়?
- ৪। ক্ষুরারোগের নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিসমূহ লিখুন।
- ৫। ক্ষুরারোগের কারণে কৃষক কীভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হন?
- ৬। গরু ও মহিষের বসন্ত রোগের বৈশিষ্ট্য কী?
- ৭। গরু ও মহিষের বসন্ত কীভাবে পশুতে সংক্রমিত হয়?
- ৮। ছাগল ও ভেড়ার বসন্তের লক্ষণসমূহ বর্ণনা করুন।
- ৯। কীভাবে ছাগল ও ভেড়ার বসন্ত রোগের চিকিৎসা করবেন?
- ১০। জলাতক্ষ নামকরণের ভিত্তি কী?
- ১১। জলাতক্ষ রোগের কারণ বর্ণনা করুন।
- ১২। জলাতক্ষের শিথিল ও উত্তেজিত রূপের বৈশিষ্ট্য লিখুন।
- ১৩। জলাতক্ষের ফলে কীভাবে পশুর মৃত্যু হয়?
- ১৪। কীভাবে জলাতক্ষ রোগ নির্ণয় করা হয়?
- ১৫। জলাতক্ষ রোগ নিয়ন্ত্রণের উপায়সমূহ সংক্ষেপে লিখুন।



উত্তরমালা – ইউনিট ২

পাঠ ২.১

- | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|-----------------------------|-----------|
| ১। ক. ii | ১। খ. iii | ২। ক. স | ২। খ. স | ৩। ক. ফুট | ৩। খ. চার |
| ৪। ক. দুই ক্ষুরের মধ্যবর্তী স্থান এবং ক্ষুর-ত্বকের সন্ধিস্থলে | | | | ৪। খ. গলকম্বলের ত্বকের নিচে | |

পাঠ ২.২

- | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|----------|----------|-------------|------------|
| ১। ক. i | ১। খ. iii | ২। ক. মি | ২। খ. মি | ৩। ক. হাতের | ৩। খ. টিকা |
| ৪। ক. অভকোষথলির ত্বকে | ৮। ক. পক লিশন (Pock Lesion) | | | | |

পাঠ ২.৩

- | | | | | | |
|-------------------------|----------|------------------------|----------|------------|-------------------|
| ১। ক. iii | ১। খ. iv | ২। ক. মি | ২। ক. মি | ৩। ক. টিকা | ৩। খ. ফ্লোরেসেন্ট |
| ৪। ক. স্ট্রিট ও ফিস্তাড | | ৪। খ. শিথিল ও উত্তেজিত | | | |

ইউনিট ৩ গবাদিপশুর ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রামক রোগ

ইউনিট ৩ গবাদিপশুর ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রামক রোগ

গবাদিপশুর বিভিন্ন সংক্রামক রোগের মধ্যে ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ (Bacterial Diseases) অন্যতম। ব্যাকটেরিয়া অতি ক্ষুদ্র এককোষী অণুবীক্ষণিক জীবাণু। গঠন অনুযায়ী এরা বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। যেমন— গোলাকার বা কক্ষাস (Coccus), দণ্ডাকৃতির বা ব্যাসিলাস (Bacillus), বাঁকা দণ্ডাকৃতির বা কমা আকৃতির অর্থাৎ ভিব্রিওস (Vibrios), প্যাঁচানো বা স্পাইরোকিটস (Spirochaetes) ইত্যাদি। কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়ার কোষপ্রাচীরে সুতার মতো ফ্লাজেলা (Flagella) বা পিলাই (Pili) থাকে। ব্যাকটেরিয়া মানুষসহ বিভিন্ন পশুপাখির দেহে আশ্রয় নিয়ে জীবনধারণ করে এবং আশ্রয়দাতা বা পোষকের দেহে বিভিন্ন ধরনের রোগ সৃষ্টি করে। গবাদিপশু বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়াস্থারা আক্রান্ত হতে পারে। এতে এদের উৎপাদন করে যায়। অনেক সময় মারাও যায়। ফলে কৃষক বা খামারি তথা দেশের প্রভূত আর্থিক ক্ষতি হয়। আমাদের দেশের গবাদিপশুর ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগের মধ্যে বাদলা, গলাফোলা, তড়কা, কলিব্যাসিলোসিস, সালমোনেলোসিস, ম্যাস্টাইটিস, যক্ষা, ফুট-রট, এন্টারোট্রিমিয়া, ধনুষ্টংকার, জোনস ডিজিজ ইত্যাদি প্রধান। সঠিক সময়ে সঠিকভাবে চিকিৎসা করতে পারলে অনেক রোগই ভালো হয়ে যায়। তবে, কৃষকের গোয়ালে বা খামারে যেখানে পশুপালন করা হয় সেখানে স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা রক্ষা করলে, পশুকে পর্যাপ্ত পুষ্টি প্রদান করলে এবং নির্ধারিত সময়ে টিকা প্রদান করলে এদের বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগব্যাধি প্রতিরোধ করা যায়।

এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে বাচ্চুরের ব্যাকটেরিয়াজনিত বিভিন্ন সংক্রামক রোগ, গবাদিপশুর বাদলা, গলাফোলা এবং তড়কা রোগ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ৩.১ বাচ্চুরের ব্যাকটেরিয়াজনিত বিভিন্ন সংক্রামক রোগ

এ পাঠ শেষে আপনি –

- বাচ্চুরের বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রামক রোগের নাম বলতে পারবেন।
- বাচ্চুরের নাভেল ইল বা জয়েন্ট ইল রোগ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে পারবেন।
- বাচ্চুরের ডিপথেরিয়া রোগ এর চিকিৎসা ও প্রতিরোধ বর্ণনা করতে পারবেন।



বাচ্চুরের বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া-জনিত রোগের মধ্যে সালমোনেলোসিস, নাভেল ইল, বাদলা, ডিপথেরিয়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

নাভেল ইল রোগের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রথমে নাভিতে ও পরে শরীরের বিভিন্ন সঞ্চিতে প্রদাহের সৃষ্টি হবে।

বাচ্চুরের ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ

বাচ্চুর বহু ধরনের ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হতে পারে। তবে, সবগুলো রোগই বাচ্চুরের মৃত্যুর কারণ হয় না। কিন্তু, কিছু কিছু রোগে যে কোনো বয়স এবং জাতের বাচ্চুর আক্রান্ত হতে পারে যা বাচ্চুরের মৃত্যুরও কারণ হতে পারে। বাচ্চুরের বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগের মধ্যে কলিব্যাসিলোসিস বা সাদা পায়খানা, সালমোনেলোসিস, নাভেল ইল বা জয়েন্ট ইল, বাদলা, ডিপথেরিয়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কলিব্যাসিলোসিস ও সালমোনেলোসিস অঞ্চল বয়স্ক বাচ্চুরের এবং বাদলা বড় বাচ্চুরের প্রাণসংহারী রোগ। এ রোগগুলো তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে, কলিব্যাসিলোসিস ও সালমোনেলোসিস সম্পর্কে পাঠ ৬.৩ এবং বাদলা রোগ সম্পর্কে পাঠ ৩.২ এ বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে বিধায় এ পাঠে এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো না। এ পাঠে শুধু নাভেল ইল ও বাচ্চুরের ডিপথেরিয়া রোগ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

নাভেল ইল বা জয়েন্ট ইল (Navel III/Joint III)

এটি বাচ্চুরের একটি সংক্রামক রোগ। এ রোগের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রথমে নাভিতে (Navel) প্রদাহ (Inflammation) হবে এবং পরে শরীরের বিভিন্ন সঞ্চি বা জয়েন্টে, বিশেষ করে পায়ের সঞ্চিগুলোতে, প্রদাহের সৃষ্টি হবে। এ রোগ এদেশে বিক্ষিপ্ত আকারে দেখা যায়। এতে কোনো মড়ক লাগে না।

নবজাত বাচ্চা জন্মের কয়েকদিনের মধ্যেই আক্রান্ত হতে পারে। গরুমহিমের বাচ্চুর ছাড়াও ঘোড়া, ভেড়া ও ছাগলের বাচ্চা এতে আক্রান্ত হতে পারে।

রোগের কারণ

বেশ কয়েক প্রকারের ব্যাকটেরিয়ার কারণে এ রোগ হতে পারে। তবে, বাচ্চুর প্রধানত *Streptococcus pyogenes* (স্ট্রেপটোকক্সাস পায়োজেনিস)স্থারা আক্রান্ত হয়। এছাড়াও এ রোগের জন্য দায়ী অন্যান্য ব্যাকটেরিয়াগুলো হচ্ছে *Streptococcus genitalium* (স্ট্রেপটোকক্সাস জেনিটালিয়াম), *Escherichia coli* (ইক্সেরিশিয়া কলাই), *Corynebacterium pyogenes* (করাইনেব্যাকটেরিয়াম পায়োজেনিস), *Sphingomonas necrophorus* (স্ফিংগোমনাস নেক্রোফোরাস) প্রভৃতি।

রোগ সংক্রমণ

গাতীর জরায়ুর নিঃসরণস্থারা কল্পিত পরিবেশ থেকে রোগজীবাণু বাচ্চুরের ভেজা নাভি বা নাভির ক্ষত দিয়ে সহজেই দেহে প্রবেশ করে।

রোগের বিকাশ

নাভিতে প্রবেশের পর জীবাণু সেখানে বংশবৃদ্ধি করে ও নাভিপ্রদাহ বা ওমফ্যালাইটিসের (Omphalitis) সৃষ্টি করে। এরপর জীবাণু রক্তে মিশে ব্যাকটেরিমিয়ার (Bacteremia) সৃষ্টি করে। বাচ্চার বয়স এক সন্তাহের কম হলে সেপ্টিসেমিয়া (Septicemia) হয়ে মারা যেতে পারে। কিন্তু, বাচ্চা বেঁচে থাকলে এবং রোগ কিছুটা দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতির হলে জীবাণু শরীরের বিভিন্ন সঞ্চিতে গিয়ে সঞ্চিপ্রদাহের (Arthritis) সৃষ্টি করে। এমনকী এগুলো মস্তিষ্কে গিয়ে মেনিঙ্গাইটিস (Meningitis) এবং হৃৎপিণ্ডে গিয়ে এন্ডোকার্ডাইটিসের (Endocarditis) সৃষ্টি করতে পারে।

রোগলক্ষণ

আক্রান্ত বাচ্চুরে নিম্নলিখিত রোগলক্ষণ দেখা যায়। যেমন—

- ◆ নাভি ফুলে যায়।
- ◆ নাভিতে ব্যাথা হয় ও তাতে পুঁজ জমে। বাচ্চুর নাভি চাটলে তা জটিল আকার ধারণ করতে পারে।
- ◆ জ্বর হতে পারে।
- ◆ ক্ষুধামন্দা দেখা দেয়।
- ◆ সঞ্চিপ্রদাহ হলে বিভিন্ন পায়ের এক বা একাধিক সঞ্চি বা গিট ফুলে যায়। বাচ্চুর খুঁড়িয়ে হাঁটে অথবা ব্যাথায় হাঁটতে পারে না।

রোগ নির্ণয়

নিম্নলিখিতভাবে এ রোগ নির্ণয় করা যায়। যেমন—

- ◆ রোগের ইতিহাস ও লক্ষণ পরীক্ষা করে।
- ◆ আক্রান্ত বাচ্চুরের নাভি বা অস্থিসঞ্চির ক্ষত থেকে নমুনা সংগ্রহ করে স্টেইন কালচারের (Stain Culture) মাধ্যমে এ রোগের সুনির্দিষ্ট জীবাণু পৃথক ও শণাক্ত করে।

চিকিৎসা

নিম্নলিখিতভাবে এ রোগের চিকিৎসা করা হয়। যেমন—

- ◆ ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে ড্রেসিং (Dressing) করতে হবে।
- ◆ পেনিসিলিন বা অন্য কোনো উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন (Broad Spectrum) অ্যান্টিবায়োটিক অথবা সালফোনেমেইড গ্রুপের ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে।

রোগের ইতিহাস ও লক্ষণ এবং
নাভি বা অস্থিসঞ্চির ক্ষত থেকে
নমুনা সংগ্রহ করে জীবাণু শণাক্ত
করে রোগ নির্ণয় করা যায়।

চিকিৎসার জন্য পেনিসিলিন বা
অন্য কোনো উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন
অ্যান্টিবায়োটিক
সালফোনেমেইড গ্রুপের ওষুধ
প্রয়োগ করতে হবে।

- ◆ অস্থিসন্ধি বা গিটের ব্যাথার জন্য অ্যাসপিরিন বা প্যারাসিটামল ট্যাবলেট খাওয়ানো যায় ।
- ◆ অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে নাভির ক্ষত পরিষ্কার করা যায় ।

রোগপ্রতিরোধ

এটি এমন একটি রোগ যা পশুর মালিক বা পালনকারী কিছুটা সাবধানতা অবলম্বন করলে প্রতিরোধ করা সম্ভব । তাছাড়া নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করলে সুফল পাওয়া যাবে । যেমন—

- ◆ স্বাস্থ্যসম্মত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে ।
- ◆ জন্মের পর বাচার নাভিতে টিক্কচার আয়োডিন বা টিক্কচার বেনজিন লাগাতে হবে ।
- ◆ গাভীর গর্ভফুল যেন বাচুরের সংস্পর্শে না আসে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে ।
- ◆ গাভী যাতে বাচুরের নাভি না চাটতে পারে তাই গাভীর মুখে মুখবন্ধনি বা ঠুসি পড়িয়ে দিতে হবে ।

বাচুরের ডিপথেরিয়া রোগ (Calf Diphtheria)

বাচুরের ডিপথেরিয়া একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ । স্বরযন্ত বা ল্যারিংস (Larynx) এবং গলবিল বা ফ্যারিংসের (Pharynx) প্রদাহকে ডিপথেরিয়া বলে । এটি প্রধানত অক্সিবয়ক্ষ বাচুরে হয় । অনেক সময় জন্মের তৃতীয় দিন থেকে দেখা দিতে পারে । এতে স্বরযন্ত ও গলবিলের মিউকোসার উপর একটি পচনশীল বা নেক্রোটিক (Necrotic) আবরণী পড়ে । ফলে লুমেন ছোট হয়ে আসে এবং শ্বাস নিতে অসুবিধা হয় । চিকিৎসা না করলে ২-৭ দিনের মধ্যে বাচুর মারা যেতে পারে । অনেক সময় জীবাণু ব্রক্ষাস (Bronchus) ও ফুসফুসে গিয়ে ব্রক্ষোনিউমেনিয়া (Bronchopneumonia) এবং টক্সিমিয়া (Toxemia) বা রক্তদুষ্টি সৃষ্টি করতে পারে । ফলে বাচুর মারা যেতে পারে ।

রোগের কারণ

Spherophorus necrophorus বা *Fusiformis necrophorus* নামক ব্যাকটেরিয়ামারা বাচুরের ডিপথেরিয়া রোগ হয় । কিন্তু, মানুষের ডিপথেরিয়া হয় *Corynebacterium diphtheri* (করাইনেব্যাকটেরিয়াম ডিপথেরি) নামক ব্যাকটেরিয়ামারা । তবে, উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষত দেখতে প্রায় একই রকম ।

রোগলক্ষণ

বাচুরের ডিপথেরিয়া রোগে নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখা যায় । যেমন—

- ◆ ৩৯.৫°-৪১.১° সে. (১০৩°-১০৬° ফা.) জ্বর হয় ।
- ◆ জ্বরের সঙ্গে ব্যাথাযুক্ত কাশি হয়, মুখ দিয়ে লালা বের হয় ও নাক দিয়ে শ্লেষ্মা পড়ে ।
- ◆ অস্থিরতা দেখা দেয় ।
- ◆ শ্বাসকষ্ট হয় এবং নাক ও মুখ দিয়ে দুর্গন্ধ বের হয় ।
- ◆ বাইরে থেকে গলবিল ফোলা দেখা যেতে পারে যা আঙ্গুল দিয়ে টিপলে বাচুর ব্যাথা পায় ।

রোগ নির্ণয়

নিম্নলিখিতভাবে বাচুরের ডিপথেরিয়া রোগ নির্ণয় করা যায় । যেমন—

- ◆ মুখের ভিতর নেক্রোটিক বা পচনশীল ক্ষত দেখে এবং বিশ্রী গন্ধ শুঁকে কিছুটা অনুমান করা যায় ।
- ◆ আক্রান্ত ক্ষত থেকে স্মিয়ার (Smear) নিয়ে স্টেইন করে জীবাণু দেখা যায় ।
- ◆ কালচার করা যায় ।

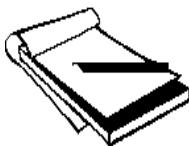
চিকিৎসা

সোডিয়াম সালফাপাইরিডিন, সালফাপাইরিডিন, সালামেথাজিন প্রভৃতি সালফোনেমাইড গ্রুপের ওষুধের যে কোনো একটি নির্ধারিত মাত্রায় ইনজেকশন আকারে প্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। এছাড়া উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে, সব ক্ষেত্রেই ওষুধের পুরো কোর্স শেষ করতে হবে।

রোগপ্রতিরোধ

নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মেনে চললে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়। যথা—

- ◆ স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে বাচ্চুর পালন করা।
- ◆ পশুর ঘর নিয়মিত জীবাণুনাশক ওষুধ দিয়ে ধূয়ে দিতে হবে।



অনুশীলন (Activity) : বাচ্চুরে রোগসূষ্টিকারী বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়ার বৈজ্ঞানিক নামের একটি তালিকা তৈরি করুন। (বি.দ্র.: বৈজ্ঞানিক নাম সবসময় ইংরেজিতে লিখবেন এবং লেখার নিচে দাগ দিবেন। অর্থাৎ underline করবেন। যেমন— Escherichia coli)।



সারমর্ম : বাচ্চুর বহু ধরনের ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হতে পারে। তবে, সব রোগই বাচ্চুরের মৃত্যুর কারণ হয় না। বাচ্চুরের বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগের মধ্যে কলিব্যাসিলোসিস, সালমোনেলোসিস, বাদলা, নাভেল বা জয়েন্ট ইল, ডিপথেরিয়া প্রভৃতি প্রধান। কলিব্যাসিলোসিস, সালমোনেলোসিস, নাভেল ইল, ডিপথেরিয়া প্রভৃতি সাধারণত অল্প বয়স্ক বাচ্চুরকে আক্রান্ত করে। আর বাদলায় আক্রান্ত হয় বয়স্ক বাচ্চুর। রোগের ইতিহাস, লক্ষণ প্রভৃতি জেনে রোগ নির্ণয় করতে হয় এবং সে অনুযায়ী চিকিৎসা করলে সুফল পাওয়া যায়। খামারে স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং চিকাদানের মাধ্যমে বাচ্চুরের অনেক ধরনের ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ সহজেই প্রতিরোধ করা যায়।



পাঠোভর মূল্যায়ন ৩.১

- ১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।
- ক. বাচ্চুরের ডিপথেরিয়া রোগের জন্য দায়ী কোন্টি?
- i) *Spherophorus necrophorus*
 - ii) *Fusiformes necrophorus*
 - iii) *Corynebacterium diphtheri*
 - iv) i ও ii এ উল্লেখিত জীবাণুগুলো
- খ. *Streptococcus pyogenes* কোন্ রোগ সৃষ্টি করে?
- i) নাভেল ইল
 - ii) সালমোনেলাসিস
 - iii) কলিব্যাসিলোসিস
 - iv) বাদলা
- ২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।
- ক. ডিপথেরিয়া রোগে বাচ্চুরের $39^{\circ}-42^{\circ}$ সে. জ্বর হতে পারে।
- খ. নাভেল ইল রোগে গিট ফুলে না।
- ৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।
- ক. নাভেল ইল রোগের জীবাণু মন্তিকে _____ সৃষ্টি করতে পারে।
- খ. অঙ্গোপচারের মাধ্যমে নাভির _____ পরিষ্কার করা যায়।
- ৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।
- ক) নাভিপ্রদাহকে কী বলে?
- খ) বাচ্চুরের ডিপথেরিয়া এবং মানুষের ডিপথেরিয়া রোগের মধ্যে মিল কোথায়?

পাঠ ৩.২ বাদলা রোগ



এ পাঠ শেষে আপনি –

- বাদলা রোগ কী তা বলতে পারবেন।
- বাদলা রোগের কারণ উল্লেখ করতে পারবেন।
- বাদলা রোগের বিস্তৃতি, সংক্রমণ, বিকাশ ও লক্ষণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাদলা রোগ নির্ণয়, এর চিকিৎসা ও প্রতিরোধ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।



বাদলা রোগ কী?

বাদলা রোগ বাড়স্ত বয়সের রোমস্থক পশুর একটি তীব্র প্রকৃতির ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রামক রোগ। এটি মাটিবাহিত রোগ, তবে ছোঁয়াচে নয়। এ রোগে প্রধানত পশুর পা আক্রান্ত হয় ও আক্রান্ত স্থান কালো হয়ে যায়। তাই একে ইংরেজিতে ব্ল্যাক লেগ (Black Leg) বলে। এছাড়াও এ রোগকে ব্ল্যাক কোয়ার্টার (Black Quarter), কোয়ার্টার ইভিল (Quarter Evil) বা কোয়ার্টার ইল (Quarter III) নামে অভিহিত করা হয়। এ রোগটি সাধারণত বর্ষাকালে হয় বলে বাংলাদেশে এটিকে বাদলা রোগ বলে। প্রধানত বাড়স্ত বয়সের গরু ও ভেড়াই এতে বেশি আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত পশুর সপ্তগ্রাহক পেশিতে (Skeletal Muscle) পচনশীল (Necrotizing) বা গ্যাংগ্রেনাস (Gangrenous) প্রকৃতির প্রদাহের সৃষ্টি হয়। এ স্থান হতে জীবাণুর বিষ রক্তে মিশে মারাত্মক ধরনের টক্সিমিয়ার (Toxemia) সৃষ্টি করে। ফলে অধিকাংশ পশু মারা যায়। ক্ষতস্থানে গ্যাস সৃষ্টি হয়, যা টিপলে পচ পচ, ভজ্জ ভজ্জ, কর কর বা পুর পুর শব্দ অনুভূত হয়।

রোগের কারণ

Clostridium Chauvoer (ক্লোস্ট্রিডিয়াম চৌভিয়াই) নামক এক ধরনের বড় আকৃতির গ্রাম পজেটিভ ব্যাকটেরিয়া এ রোগের কারণ।

রোগের বিস্তৃতি ও সংক্রমণ

বিশ্বের প্রায় সব দেশেই রোমস্থক পশুতে বাদলা রোগ দেখা যায়। সাধারণত ৬ মাস থেকে ২ বছর বয়সের গরু এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। বাংলাদেশে এটি প্রধানত গরুর রোগ হিসেবেই চিহ্নিত। সাধারণত বাড়স্ত বয়সের মোটাজাপ পশুই বেশি আক্রান্ত হয়। এ রোগ মাটিবাহিত অর্থাৎ মাটি এ রোগের জীবাণুর আধার। রোগজীবাণুস্থারা দুষ্পুর খাদ্য ও পানির মাধ্যমে গরুতে এ রোগ সংক্রমিত হয়। আর ভেড়াতে লেজকাটা, খেঁজা করা, লোম কাটা, প্রসবকালীন ক্ষত প্রভৃতির মাধ্যমে জীবাণু প্রবেশ করে।

রোগের বিকাশ

স্পোর (Spore) অবস্থায় এ রোগের জীবাণু পশুদেহে সংক্রমিত হয়। অন্তের নলাকার গ্রস্তিতে (Intestinal Crypts) বাতাসবিহীন অবস্থায় (Anaerobic Condition) পচনশীল পদার্থের উপস্থিতিতে এ জীবাণু স্পোর থেকে ভেজিটেটিভ ব্যাকটেরিয়ায় রূপান্তরিত হয়। পরবর্তীতে এ জীবাণু রক্ত প্রবাহে প্রবেশ করে। যেহেতু এ জীবাণু পুরু মাংসপেশির প্রতি আসক্ত তাই পাছা, পা, ঘাড় ও ক্ষেপের পেশিতে অবস্থান নেয়। মাংসে ল্যাকটিক অ্যাসিড (Lactic Acid) বা অন্য কোনো কারণে যখন বাতাসবিহীন অবস্থার সৃষ্টি হয়, তখন এ ব্যাকটেরিয়াগুলো দ্রুত বংশবৃক্ষ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে টক্সিন বা বিষ নিঃসরণ করে। এ বিষ স্থানীয়ভাবে মাংসপেশির মৃত্যু ঘটায়, সেগুলো ছিঁড়ে যায় এবং সিরোহিমোরেজিক প্রদাহের (Sero-haemorrhagic) সৃষ্টি হয়। সেখানে মাংসের পুকোজের গাঁজন বা ফারমেটেশনের (Fermentation) ফলে অ্যাসিড ও গ্যাসের সৃষ্টি হয়। কিছু টক্সিন রক্তে মিশে শরীরের বিভিন্ন অংশে চলে যায় এবং টক্সিমিয়ার সৃষ্টি করে যার ফলে অধিকাংশ পশু মারা যায়।

সাধারণত ৬ মাস থেকে ২ বছর বয়সের গরু এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয়।

বাদলা রোগে টক্সিমিয়ার কারণে পশু মারা যায়।

রোগের লক্ষণ

আক্রান্ত পশুতে অতিতীব্র এবং তীব্র প্রকৃতির রোগ হতে পারে।

অতিতীব্র প্রকৃতির রোগে
আক্রান্ত পশু হঠাতে করে পড়ে
মারা যায়।

- ◆ আক্রান্ত পশু হঠাতে করে পড়ে মারা যায়। তবে, অনেক সময় পশু ১–২ ঘন্টা বাঁচতে পারে।
- ◆ পশু কিছু খাবে না।
- ◆ দেহে 80° – 81.7° সে. (108° – 109° ফা.) জ্বর থাকবে।
- ◆ লোম খাড়া হবে।
- ◆ অবসাদগ্রস্থ দেখা যাবে।
- ◆ পেটে গ্যাস জমবে।
- ◆ মুখবদ্ধনি বা মাজল (গাঁষব) শুক্র থাকবে।
- ◆ চোখ ও নাক দিয়ে পানি পড়তে পারে।
- ◆ পিঠ কুঁজো হবে।
- ◆ হাঁটতে চাবে না এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই মারা যাবে।

তীব্র প্রকৃতির রোগে—

- ◆ অতিতীব্র প্রকৃতির রোগের লক্ষণ ছাড়াও মাংসপেশি আক্রান্ত হওয়ায় পশু হাঁটতে পারবে না, খুঁড়িয়ে হাঁটবে। এটি এ রোগের কার্ডিনাল (Cardinal) বা রোগ শনাক্তকারী চিহ্ন।
- ◆ আক্রান্ত মাংসপেশি স্ফীত, গরম ও ব্যাথাপূর্ণ হবে।
- ◆ আক্রান্ত এ ফোলা মাংসপেশি টিপলে পচ পচ, ভজ ভজ বা পুরপুর শব্দ অনুভূত হবে।
- ◆ শেষ অবস্থায় এ ফোলা মাংসপেশি ঠান্ডা ও ব্যাথাহীন হয় এবং পশু এত দুর্বল হয়ে পড়ে যে উঠতে পারে না।
- ◆ লক্ষণ প্রকাশের ১৮–৭২ ঘন্টার মধ্যে পশুর মৃত্যু ঘটে।
- ◆ মৃত্যুর পূর্বে দেহের তাপচ্রাম পায়।

রোগ নির্ণয়

- ◆ রোগে আক্রান্ত হওয়ার ইতিহাস অর্থাৎ আক্রান্ত হওয়া ৬ মাস থেকে ২ বছর বয়সের স্বাস্থ্যবান গরু এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ, যেমন— জ্বর, ঝোঁড়ানো ও আক্রান্ত পেশি টিপলে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শব্দ অনুভূত হওয়া ইত্যাদি থেকে প্রাথমিকভাবে রোগ নির্ণয় করা যায়।
- ◆ সুনির্দিষ্টভাবে রোগ নির্ণয়ের জন্য আক্রান্ত স্থানের পেশি সুচ দিয়ে ছিদ্র করে সেখানকার তরল অংশ (ফ্লুইড) নিয়ে স্মিয়ার গ্রামস স্টেইন করে গ্রাম পজেটিভ ব্যাকটেরিয়া শনাক্ত করা যায়। আবার আক্রান্ত স্থানের ফ্লুইড বা পেশির টুকরো বাতাসবিহীন কালচার মিডিয়ায় কালচার করে জৈবরাসায়নিক (Biochemical) পরীক্ষার মাধ্যমে জীবাণু শনাক্ত করা যায়।

চিকিৎসা

- ◆ লক্ষণ প্রকাশের সাথে সাথে এ রোগের চিকিৎসা করতে হবে। বিলম্বে করলে ওষুধে কাজ হবে না।
- ◆ আক্রান্ত পশুর শিরা বা ত্বকের নিচে ১০০–২০০ মি.লি. হিসেবে অ্যান্টিব্যাক লেগ সিরাম ইনজেকশন করতে হবে।
- ◆ অ্যান্টিসিরাম প্রয়োগ করার পর বা না পাওয়া গেলে নিম্নের যে কোনো একটি অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করলে সুফল পাওয়া যাবে। যেমন—
ক. প্রথমে ক্রিস্টালিন পেনিসিলিন ১০–২০ লাখ ইউনিট শিরায় মধ্যে ইনজেকশন
করলে দ্রুত কাজ আরম্ভ হয়। এরপর ১০–২০ লাখ ইউনিট প্রোকেইন

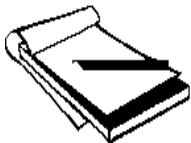
পেনিসিলিনের অর্ধেক আক্রান্ত পেশিতে ও বাকি অর্ধেক সুস্থ মাংসের মধ্যে দৈনিক হিসেবে ৫-৭ দিন ইনজেকশন করতে হবে।

খ. প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ৩-৫ গ্রাম হিসেবে টেট্রাসাইক্লিন প্রত্যেহ একবার করে ৫ দিন মাংসপেশিতে ইনজেকশন করলে সুফল পাওয়া যায়।

◆ জ্বর এবং ব্যাথা কমানোর জন্য প্যারাসিটামল বা নোভালজিন ট্যাবলেট খাওয়ানো যেতে পারে।

রোগপ্রতিরোধ

টিকা প্রদান এবং স্বাস্থ্যসম্মত বিধিব্যবস্থার মাধ্যমে বাদলা রোগ প্রতিরোধ করা যায়।



অনুশীলন (Activity) : অতিতীব্র ও তীব্র প্রকৃতির বাদলা রোগের লক্ষণের মধ্যকার পার্থক্যগুলো ছক আকারে লিপিবদ্ধ করুন।



সারমর্ম : বাদলা ৬ মাস থেকে ২ বছর বয়সের গরুর একটি ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রামক রোগ। *Clostridium chauvoei* নামক এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া এ রোগের কারণ। এ রোগের জীবাণু দেহের পুরু মাংসপেশিকে আক্রান্ত করে ও মাংসপেশির মৃত্যু ঘটায়। আক্রান্ত মাংসপেশিতে অ্যাসিড ও গ্যাসের সৃষ্টি হয়। আক্রান্ত স্থান কালো হয়ে যায়। টিপলে পুর পুর, পচ পচ বা ভজ্জ ভজ্জ শব্দ হয়। রোগটি অতিতীব্র ও তীব্র আকারে দেখা দিতে পারে। অতিতীব্র রোগে উক্তিমিয়ার কারণে পশু মারা যায়। লক্ষণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে পেনিসিলিন বা টেট্রাসাইক্লিন ইনজেকশন প্রয়োগে আক্রান্ত পশুকে সাড়িয়ে তোলা যায়। রোগ-প্রতিরোধের জন্য ৬ মাস অন্তর সুস্থ পশুকে টিকা দিতে হয়।



পাঠোভর মূল্যায়ন ৩.২

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. বাদলা রোগ কোন ধরনের সংক্রামক রোগ?

- i) মাটিবাহিত
- ii) পানিবাহিত
- iii) মাটি ও পানিবাহিত
- iv) বায়ুবাহিত

খ. কেমন ধরনের গরু বাদলা রোগে আক্রান্ত হয়?

- i) বাড়স্ত বয়সের রংগু গরু
- ii) বৃদ্ধ বয়সের গরু
- iii) বাড়স্ত বয়সের মোটাতাজা গরু
- iv) বাচ্চা বয়সের গরু

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. বাদলা রোগে সঞ্চালক পেশিতে গ্যাংথিনাস প্রকৃতির প্রদাহের সৃষ্টি হয়।

খ. বাদলা রোগের জীবাণু বাইপোলার গ্রাম নেগেটিভ।

৩। শুন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. *Clostridium* _____ নামক ব্যাকটেরিয়া বাদলা রোগের জীবাণু।

খ. মাংসপেশিতে _____ অবস্থায় ব্যাকটেরিয়া দ্রুত বৎসৃদ্ধি করে।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. বাদলা রোগের কার্ডিনাল চিহ্ন কী?

খ. বাদলা রোগে পশু কেন মারা যায়?

পাঠ ৩.৩ গলাফোলা রোগ

এ পাঠ শেষে আপনি –

- গলাফোলা রোগ কী তা বলতে পারবেন।
- গলাফোলা রোগের জীবাণুর বিভিন্ন সিরোটাইপের নাম লিখতে পারবেন।
- গলাফোলা রোগ সংক্রমণ, এর বিকাশ ও লক্ষণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- রোগ নির্ণয়ের পদ্ধতিসহ গলাফোলা রোগের চিকিৎসা ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা আলোচনা করতে পারবেন।



পৃথিবীতে গরু ও মহিষের যতগুলো মারাত্ক সংক্রমক রোগ রয়েছে গলাফোলা তাদের মধ্যে অন্যতম। রক্তদুষ্টি বা সেন্টিসেমিয়া, জ্বর, গলা ও গলকম্বল পানি বা ইডিমার (Ocdema) জন্য ফুলে যাওয়া, শ্বাসকষ্ট হওয়া, নাকমুখ দিয়ে পানির মতো তরল পদার্থ বের হওয়া এবং উচ্চ মৃত্যুহার এ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। রক্তদুষ্টি ও দেহের সকল সিরাম ও মিউকাস পর্দার নিচে অবস্থিত কৈশিকনালিসমূহ (Capillaries) থেকে রক্তপাত হয় বলে একে হিমোরেজিক সেন্টিসেমিয়া (Haemorrhagic Septicemia) বলে। এ রোগে গলা ও গলকম্বল ফুলে যায় বলে স্থানীয় ভাষায় একে গলাফোলা, ঘটু, গলাবেরা বা গলাফাঁস নামে ডাকা হয়। এছাড়াও এ রোগকে বারবোন (Burobone) বলা হয়। বৰ্ষাকালীন বৃষ্টিপাত এবং শীতকালীন বৃষ্টির সময় এ রোগের প্রাদুর্ভাব সাধারণত মড়ক আকারে দেখা দেয়। তবে, অন্যান্য সময়ও এ রোগ হতে পারে।

গলাফোলা রোগ কী?

পৃথিবীতে গরু ও মহিষের যতগুলো মারাত্ক সংক্রমক রোগ রয়েছে গলাফোলা তাদের মধ্যে অন্যতম। রক্তদুষ্টি বা সেন্টিসেমিয়া, জ্বর, গলা ও গলকম্বল পানি বা ইডিমার (Ocdema) জন্য ফুলে যাওয়া, শ্বাসকষ্ট হওয়া, নাকমুখ দিয়ে পানির মতো তরল পদার্থ বের হওয়া এবং উচ্চ মৃত্যুহার এ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। রক্তদুষ্টি ও দেহের সকল সিরাম ও মিউকাস পর্দার নিচে অবস্থিত কৈশিকনালিসমূহ (Capillaries) থেকে রক্তপাত হয় বলে একে হিমোরেজিক সেন্টিসেমিয়া (Haemorrhagic Septicemia) বলে। এ রোগে গলা ও গলকম্বল ফুলে যায় বলে স্থানীয় ভাষায় একে গলাফোলা, ঘটু, গলাবেরা বা গলাফাঁস নামে ডাকা হয়। এছাড়াও এ রোগকে বারবোন (Burobone) বলা হয়। বৰ্ষাকালীন বৃষ্টিপাত এবং শীতকালীন বৃষ্টির সময় এ রোগের প্রাদুর্ভাব সাধারণত মড়ক আকারে দেখা দেয়। তবে, অন্যান্য সময়ও এ রোগ হতে পারে।

রোগের কারণ

Pasteurella multocida (পাসচুরেলা মালটুসিডা) নামক গ্রাম নেগেটিভ, বাইপোলার ও ক্ষুদ্র কক্ষোয়েড (Coccoid) আকৃতির ব্যাকটেরিয়ার কয়েক প্রকার সিরোটাইপ এ রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী। যেমন—

১. *Pasteurella multocida* serotype 1 (Roberts)।
২. *Pasteurella multocida* serotype 6 B (Namieko) I 6 E (Murata)।
৩. *Pasteurella multocida* serotype E (Carter)।

রোগ সংক্রমণ

অনেক সুস্থ গরু ও মহিষের ন্যাসো-ফ্যারিংসে (Naso-pharynx) *Pasteurella multocida* জীবাণু বাস করে। তবে, এসব পশু ও জীবাণুর মধ্যে একটা সমতা (Equilibrium) থাকায় এরা রোগে আক্রান্ত হয় না। অর্থাৎ রোগজীবাণু যতটুকু ক্ষতিসাধন করে, পশুদেহ তা পুষিয়ে নেয়। কিন্তু এসব পশুর দেহে কোনো কারণে স্ট্রেস (Stress) বা চাপ পড়লে জীবাণু দ্রুত বংশবিস্তার করে এবং রক্তে প্রথমে ব্যাকটেরিয়া ও পরে এভেটক্সিন সৃষ্টি করে সেন্টিসেমিয়া ঘটায়। এছাড়াও নিম্নলিখিতভাবে এ রোগটি সুস্থ পশুতে সংক্রমিত হতে পারে। যেমন—

- ◆ রোগাক্রান্ত পশুর লালা, নাক নিঃস্তৃত পদার্থ ও মলমুত্ত্বাদিরয়ারা দুষ্ফিত খাদ্য ও পানির মাধ্যমে (তবে, অবশ্যই ২৪ ঘন্টার মধ্যে। কারণ, এরপর জীবাণু মারা যায়)।
- ◆ ব্যাকটেরিয়া অবস্থায় রক্তচোষক কীটপতঙ্গ ও আটালির মাধ্যমে।

রোগের বিকাশ

স্ট্রেস অবস্থায় জীবাণু ন্যাসো-ফ্যারিংস থেকে ফুসফুসে গিয়ে বংশবিস্তার করে এবং রক্তে মিশে। ফলে নিউমোনিক পাসচুরেলোসিসের (Pneumonic Pasteurellosis) সৃষ্টি হয়। এছাড়াও রোগাক্রান্ত পশুর লালা, নাক নিঃস্তৃত পদার্থ, মল ইত্যাদিয়ারা দুষ্ফিত খাদ্য ও পানির সাহায্যে দেহে প্রবেশ করে রক্তে

Pasteurella multocida নিউমোনিক এবং ইন্টেস্টিমাল পাসচুরেলোসিসের সৃষ্টি করে।

মিশে ব্যাকটেরিমিয়ার সৃষ্টি করে। রক্তে জীবাণু মরে গিয়ে যে এভেটক্সিনের সৃষ্টি করে তার কারণেই সেপ্টিসেমিয়া হয়। এ এভেটক্সিন রক্তের কৈশিকনালি ও অন্যান্য টিস্যু বিনষ্ট করে। ফলে দেহে হিস্টামিনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ও ইডিমা হয় বা পানি জমে। সে কারণে এ রোগে আক্রান্ত পশুর গলা ইডিমায় ফুলে যায় ও রক্তে সেপ্টিসেমিয়া হয়। কখনও কখনও এ রোগে পাকান্ত প্রদাহের সৃষ্টি হয়। ফলে ডায়ারিয়া দেখা দেয়। এ প্রকৃতির রোগকে ইনটেস্টিনাল পাসচুরেলোসিস (Intestinal Pasteurellosis) বলে।

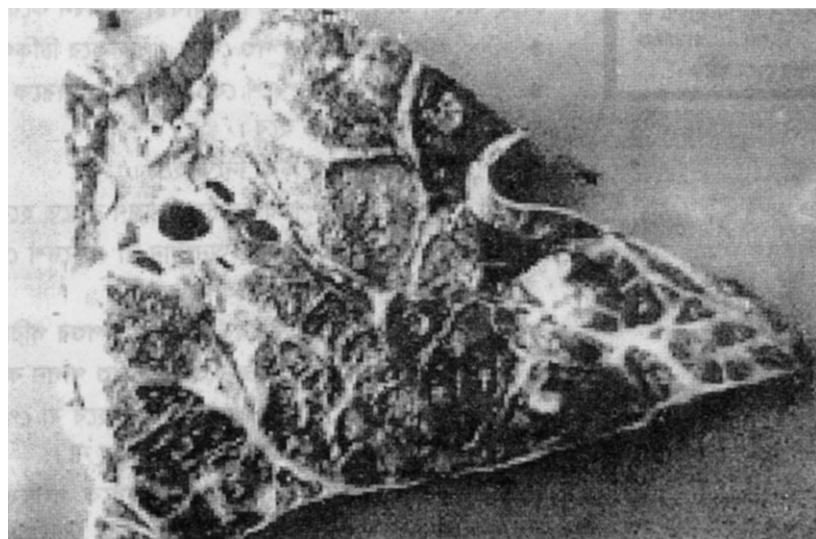
রোগের লক্ষণ

গলাফোলা রোগ অতিতীব্র ও তীব্র দুপ্রকৃতির হতে পারে।

অতিতীব্র প্রকৃতির রোগ : এ প্রকৃতির রোগে তড়কা রোগের মতো পশু হঠাতে করে পড়ে গিয়ে মারা যেতে পারে। কোনো কোনো পশু ৬–১২ ঘণ্টা পর মারা যেতে পারে। এক্ষেত্রে জ্বর, ক্ষুধামন্দা, নাক ও মুখ দিয়ে তরল পদার্থ পড়া, নিস্তেজ হওয়া, পাতলা পায়খানা করা প্রভৃতি দেখা যায়। অবশেষে পশু মারা যায়।

তীব্র প্রকৃতির রোগ : তীব্র প্রকৃতির রোগে আক্রান্ত পশুতে নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখা যায়। যেমন—

- ◆ দেহে $80.6^{\circ}-81.7^{\circ}$ সে. ($100^{\circ}-101^{\circ}$ ফা.) জ্বর ওঠে।
- ◆ পশু ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। বিম মেরে দাঁড়িয়ে বা শুয়ে থাকে।
- ◆ নাক দিয়ে পানি ও মুখ দিয়ে তরল পদার্থ পড়ে।
- ◆ ক্ষুধামন্দা দেখা দেয়।
- ◆ এভাবে ২৪ ঘণ্টা পার হলেই গলার নিচে ফুলতে থাকে। এ ফোলা ক্রমশ বুক এবং পেট পর্যন্ত যেতে পারে। কখনও কখনও চোয়াল ও কানের অংশও ফুলতে পারে।
- ◆ অনেক সময় পশুর জিহ্বা ফুলে যায় এবং তা লাল হয়। এ সময় এরা মুখ হা করে রাখে বা জিহ্বা বের হয়ে পড়ে। এসব ফোলা জায়গা শক্ত ও গরম থাকে, টিপলে পশু ব্যথা পায়, সুচ দিয়ে ছিদ্র করলে হলুদ বর্ণের তরল পদার্থ বের হয়।
- ◆ গলার এ স্ফীত অংশ স্বরযন্ত ও গলবিলের উপর চাপ দেয় বলে পশুর শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। তাই মুখ হা করে শ্বাস নেয়। শ্বাস ত্যাগের সময় গলার ভেতর ঘড় ঘড় শব্দ হয়, যা বেশ দূর থেকে শোনা যায়।
- ◆ পশুতে ফাইব্রিনাস ব্রক্সিনিউমেনিয়ার (Fibrinous Bronchopneumonia) সৃষ্টি হয়।



চিত্র ২৯ : গলাফোলা রোগে আক্রান্ত গরুর ফুসফুসে ফাইব্রিনাস ব্রক্সিনিউমেনিয়ার চিহ্ন

- ◆ পশু ধীরে ধীরে দুর্বল হতে থাকে ।
- ◆ জ্বর কমতে থাকে ।
- ◆ যেসব পশুর অন্তপ্রদাহ হয় তাদের পেটে ব্যথা হয় ও রক্তমিশ্রিত পাতলা পায়খানা করে ।
- ◆ শেষের দিকে পশু শুয়ে পড়ে ।
- ◆ নাক এবং মুখ দিয়ে পানির মতো তরল পদার্থ বের হয় ।
- ◆ তাপমাত্রা স্বাভাবিক হয়ে আসে ও পশু মারা যায় ।

রোগ নির্ণয়

নিম্নলিখিতভাবে গরুমহিষের গলাফোলা রোগ নির্ণয় করা যায় । যেমন—

- ◆ হঠাতে আবহাওয়ার পরিবর্তন, বর্ষা ও শীতকালীন বৃষ্টি, একটানা পরিশ্রম করানোর ইতিহাস এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ, যেমন— জ্বর, লালা ক্ষরণ, গলায় গরম ব্যাথাযুক্ত পানিপূর্ণ স্ফীতি ও শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি ।
- ◆ মৃত পশুর শরীরের ইতিমাযুক্ত অংশগুলো কাটলে হলুদ বর্ণের জেলির মতো তরল পদার্থ পাওয়া যায় । এ অংশের তুক লাল হতে পারে এবং অধঃতুকে বিন্দু বিন্দু ও ইকাইমোটিক প্রকৃতির রক্তপাত দেখা যায় । ফুসফুস ও লসিকাগ্রাস্তিতে ইতিমা ও পাকান্ত প্রদাহ থাকে ।
- ◆ সুনির্দিষ্টভাবে রোগ নিরূপণের জন্য মৃত পশুর হৃৎপিন্ডের রক্ত, ফুসফুস ও পুরাহার নমুনা এবং জীবিত রোগাক্রান্ত পশুর লালা ও রক্ত গ্রামস স্টেইন ও মিথাইলিন ব্লু দিয়ে স্টেইন করে গ্রাম নেগেটিভ, বাইপোলার দভাকৃতির ব্যাকটেরিয়া শণাক্ত করে এ রোগ নির্ণয় করা যায় ।

চিকিৎসা

রোগলক্ষণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে গলাফোলা রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয় ।

আক্রান্ত পশুর চিকিৎসা বিলম্বে হলে কোনো ওমুখে সুফল পাওয়া যায় না । তাই রোগলক্ষণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয় । এ রোগের চিকিৎসার জন্য সালফোনেমাইড, যেমন— সালফাডিমিডিন, ট্রাইমেথোপ্রিম-মেথোক্সোজল অথবা অ্যান্টিবায়োটিক, যেমন— অক্সিটেট্রাসাইক্লিন ইত্যাদি ব্যাবহারে সুফল পাওয়া যায় ।

রোগপ্রতিরোধ

এ রোগ নির্মূল করা প্রায় অসম্ভব বললেই চলে । কারণ, এ রোগের জীবাণু স্বাভাবিক অবস্থায় পশুর দেহে থাকে । তবে, নিম্নলিখিত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায় । যথা—

- ◆ অসুস্থ পশুকে সুস্থ পশু থেকে পৃথক করে চিকিৎসা করাতে হবে ।
- ◆ অসুস্থ পশুর সংস্পর্শে যেগুলো ছিল তাদেরকে অ্যান্টিসিরাম বা দীর্ঘস্থায়ী ট্রেসাইক্লিন দিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে ।
- ◆ অন্যান্য পশুকে টিকা দিতে হবে ।
- ◆ মড়কের সময় পশুর চলাচল নিয়ন্ত্রণ করাতে হবে ।
- ◆ পশুকে একস্থান থেকে অন্যস্থান বা একদেশ থেকে অন্যদেশে স্থানান্তরের সময় পর্যাপ্ত খাদ্য ও পানি সরবরাহ করাতে হবে ।
- ◆ হঠাতে আবহাওয়ার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পশুর পরিচর্যার ব্যবস্থা সেভাবে করাতে হয় ।
- ◆ শুক্র ও পরিক্ষার-পরিচ্ছন্ন অবস্থায় পশু পালন করাতে হবে ।
- ◆ মৃত পশুকে মাটিতে পুতে ফেলতে হবে বা পোড়াতে হবে । মাঠে ফেলে দেয়া চলবে না বা মুচি দিয়ে চামড়া ছাড়ানো উচিত হবে না ।
- ◆ বছরে কমপক্ষে একবার গরুমহিষকে গলাফোলা রোগের টিকা নির্ধারিত মাত্রায় প্রয়োগ করাতে হবে ।



অনুশীলন (Activity) ১ নিউমোনিক পাসচুরেলোসিস ও ইন্টেসিনাল পাসচুরেলোসিসের মধ্যকার পার্থক্য লিপিবদ্ধ করুন।

সারমর্ম ৪ গৱণ ও ঘনিষ্ঠের মারাত্মক রোগের মধ্যে গলাফোলা বা হিমোরেজিক সেপ্টিসেমিয়া অন্যতম। গলা ও গলকম্বল ফোলা এবং সেপ্টিসেমিয়ার কারণে এ রোগের এ নামকরণ। গলাফোলা রোগ *Pasteurella multocida* নামক ব্যাকটেরিয়ার কয়েক প্রকার সিরোটাইপস্নারা সংঘটিত হয়। এ রোগ অতিত্ব এবং তীব্র প্রকৃতির হতে পারে। সেপ্টিসেমিয়া, জ্বর, গলা ও গলকম্বল পানি বা ইডিমার জন্য ফুলে যাওয়া, শ্বাসকষ্ট হওয়া, নাকমুখ দিয়ে পানির মতো তরল পদার্থ বের হওয়া এবং উচ্চ মৃত্যুহার এ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। দ্রুত চিকিৎসা না করলে আক্রান্ত পশুকে বাঁচানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ রোগের চিকিৎসার জন্য সালফোনেমাইড বা অক্সিটেন্টাসাইক্লিনজাতীয় অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়। রোগপ্রতিরোধের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত বিধিব্যবস্থায় পশু পালন অপরিহার্য। তাছাড়া সুস্থ পশুকে বছরে কমপক্ষে একবার গলাফোলা রোগের টিকা দিতে হবে।



পাঠোভর মূল্যায়ন ৩.৩

১। **সঠিক উভরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।**

ক. গলাফোলা রোগে গলা কেন ফুলে?

- i) ইডিমার জন্য
- ii) পুঁজ জমার জন্য
- iii) গ্যাসের জন্য
- iv) কোনোটিই নয়

খ. *Pasteurella multocida* serotype E এর নাম কী?

- i) Roberts
- ii) Carter
- iii) Murata
- iv) Namieko

২। **সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।**

ক. গলাফোলা রোগে $80.6^{\circ}-81.7^{\circ}$ সে. জ্বর উঠে।

খ. গলাফোলা রোগের টিকা বছরে দুবার দিতে হয়।

৩। **শূণ্যস্থান পূরণ করুন।**

ক. গলার স্ফীতি অংশ _____ ও গলবিলের উপর চাপ দেয়।

খ. রক্তে *Pasteurella Multocida* মরে _____ সৃষ্টি করে।

৪। **এক কথা বা বাক্যে উভর দিন।**

ক. গলাফোলা রোগে কী কী প্রকৃতির লক্ষণ দেখা দেয়?

খ. পশুর ইডিমায়ুক্ত অংশগুলো কাটলে কেমন পদার্থ বের হয়?

পাঠ ৩.৪ তড়কা রোগ



এ পাঠ শেষে আপনি –

- তড়কা রোগ কী তা বলতে পারবেন।
- তড়কা রোগের কারণ, বিস্তার, সংক্রমণ ও বিকাশ লিখতে পারবেন।
- তড়কা রোগের লক্ষণ, রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা বর্ণনা করতে পারবেন।
- তড়কা রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।



তড়কা রোগ কী?

তড়কা রোগ পশুর ব্যাকটেরিয়া- জনিত অতিতীব্র প্রকৃতির রোগ। সেপ্টিসেমিয়া ও হঠাত মৃত্যু এ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ রোগে মানুষসহ যে কোনো ধরনের পশু আক্রান্ত হতে পারে। ইংরেজিতে এ রোগকে অ্যান্থ্রাক্স (Anthrax) বলে। আক্রান্ত পশু হঠাত মারা যেতে পারে। মৃত্যুর পর মৃতদেহে দ্রুত পচন ধরে এবং পেট ফুলতে থাকে। নাক, মুখ, প্রস্তাব ও পায়খানার রাস্তা দিয়ে কালো বর্গের (আলকাতরার মতো) রক্ত বের হতে থাকে। মৃতদেহে কাঠিন্য আসে না বা রাইগর মর্টিস (Rigor Mortis) হয় না। এটি এ রোগের জন্য রোগলক্ষণিক ক্ষত বা প্যাথোগনোমনিক লেশন (Pathognomonic Lesion)। ময়না তদন্তে পুরীহা অত্যন্ত স্ফীত, নরম এবং কয়লার মতো দেখায়। এজন্য অনেকে এ রোগকে চার্বন (Charbon) বা স্প্লেনিক ফিভার (Splenic Fever) বলে থাকেন।

রোগের কারণ

Bacillus anthracis (ব্যাসিলাস অ্যান্থ্রাসিস) নামক এক ধরনের গ্রাম পজেটিভ দভাকৃতির ব্যাকটেরিয়া তড়কা রোগের জন্য দায়ী। এ ব্যাকটেরিয়ার দেহে আবরণী বা ক্যাপসুল আছে। ক্যাপসুল ও জীবাণুর মধ্যে একটি স্পোর থাকে। এ স্পোর জীবাণুনাশক ওষুধ বা সাধারণ তাপে নষ্ট হয় না। স্পোর মাটিতে ৩০–৪০ বছর পর্যন্ত জীবিত থাকতে পারে। এ সময়ের মধ্যে কোনো পশু সেখানে চলাচল করলে এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এ জীবাণু যে বিষ নিঃস্তৃত করে তার তিনটি অংশ রয়েছে। এগুলো নিম্নরূপ—

- ক. উৎপাদক ১ : এটি পানি জমায় বা ইডিমার সৃষ্টি করে।
- খ. উৎপাদক ২ : এটি জীবাণুকে পোষকের দেহের কলা বা টিস্যুভেদ করতে সাহায্য করে।
- গ. উৎপাদক ৩ : এটি প্রাণসংহারী বা সংহারকারক।

রোগের বিস্তার

বিশ্বের প্রায় সব দেশে মানুষসহ পশুর এ রোগ হয়। তবে, কুকুর, বিড়াল ও আলজেরিয়ান জাতের ভেড়াতে এ রোগ হয় না। এদেশে যে কোনো রোগে মৃত পশুকে খোলা অবস্থায় ভাগাড়ে ফেলে রাখা হয়। ফেলে শবাহারি পশুপাথির মাধ্যমে রোগের জীবাণু ছড়ায় এবং মাটিতে স্পোর বিস্তারলাভ করে। এমতাবস্থায় খরার পর ব্যাপক বৃষ্টিপাত হলে এবং গরম ও স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়ায় এ জীবাণুর বিস্তার ঘটে। এছাড়া বন্যার পানির মাধ্যমেও এ জীবাণু ছড়াতে পারে।

রোগ সংক্রমণ

নিম্নলিখিতভাবে এ রোগের জীবাণু সংক্রমিত হতে পারে। যথা—

- ◆ প্রধানত দুষ্পুষ্ট খাদ্য ও পানি গ্রহণের মাধ্যমে।
- ◆ শ্বাসপ্রশ্বাসের মাধ্যমেও স্পোর সংক্রমিত হতে পারে।
- ◆ ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আক্রান্ত পশু থেকে সুস্থ পশুতে এ রোগ সংক্রমিত হয়।

- ◆ ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে রক্তচোষক কৌটপতঙ্গের মাধ্যমে আক্রান্ত পশু থেকে সুস্থ পশুতে এ জীবাণু সংক্রমিত হয়।
- ◆ আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলের মানুষ এ রোগের মড়কের সময় আক্রান্ত পশুর মৃত্যুর ভয়ের কারণে পশু জবাই করে মাংস খায়। এক্ষেত্রে মাংস কাটার সময় মানুষে জীবাণু সংক্রমিত হয়।
- ◆ এ রোগে মৃত পশুর সংস্পর্শে মানুষের রোগ হয়। মানুষের ত্বকে এ জীবাণু ম্যালিগন্যান্ট কারবাক্সেল (Malignant Carbuncle) রোগ সৃষ্টি করে।

রোগের বিকাশ

Bacillus anthracis জীবাণু সেপ্টিসেমিয়া ও ইডিমা সৃষ্টি করে এবং টিস্যুকে বিনষ্ট করে।

Bacillus anthracis জীবাণুর স্পোর দেহে সংক্রমিত হওয়ার পর শৈলীমিত বিল্লী দিয়ে প্রবেশ করে এবং ফ্যাগোসাইটের (Phagocyte) মাধ্যমে স্থানিক লসিকাগ্রাহ্তিতে এসে বংশবিস্তার করে। প্রবর্তীতে এরা লসিকাগ্রাহ্তি থেকে রক্তে পৌছে রক্তদুষ্টি বা সেপ্টিসেমিয়ার সৃষ্টি করে এবং দেহের প্রায় সকল টিস্যুকে আক্রান্ত করে। জীবাণু থেকে নিঃস্ত বিষ ইডিমা সৃষ্টি করে এবং টিস্যুকে বিনষ্ট করে। প্রধানত শক (Shock), তীব্র রিন্যাল অকার্যকারিতা ও কেন্দ্রীয়মাঝুতন্ত্রের মধ্যস্থতায় অস্তিম অক্সিজেন স্থল্যতায় পশুর মৃত্যু ঘটে।

রোগের লক্ষণ

রোমস্থক পশুতে এ রোগ প্রধানত দুপ্রকৃতির হয়ে থাকে। যথা—

অতি তীব্র প্রকৃতির রোগ : অধিকাংশ ক্ষেত্রে পশু কোনো লক্ষণ প্রকাশের পূর্বেই মারা যায়। তবে ১—২ ঘন্টা বেঁচে থাকলে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো দেখা যায়। যথা—

- ◆ জুর, পেশির কম্পন, শ্বাসকষ্ট, ঝিল্লীপর্দ্য রক্ত সংঘর্ষণ ইত্যাদি।
- ◆ অতঃপর অস্তিম খিচুনি দিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে পশুর মৃত্যু ঘটে।
- ◆ মৃত পশুর দেহের স্বাভাবিক ছিদ্রপথ, যেমন— মুখ, মলদার, যোনিপথ, নাসারক্তি প্রভৃতি দিয়ে আলকাতরার মতো কালচে রক্ত বের হয়।

মৃত পশুর দেহের স্বাভাবিক ছিদ্রপথে আলকাতরার মতো কালচে রক্ত বের হয়।

তীব্র প্রকৃতির রোগে আক্রান্ত পশু প্রায় ৪৮ ঘন্টা জীবিত থাকে। এ সময়ের মধ্যে নিম্নলিখিত লক্ষণ প্রকাশ পায়। যথা—

- ◆ $80^{\circ}-81.7^{\circ}$ সে. জুর ওঠে।
- ◆ শুধুমান্দা, বিস্তেজতা, পেটফাঁপা, দেহের ঝাঁকুনি, চোখের রক্তাভ পর্দা ইত্যাদি দেখা যায়।
- ◆ শ্বাসপ্রশ্বাস অগভীর ও দ্রুত হয় এবং হৃৎপিণ্ডের গতি বৃদ্ধি পায়।
- ◆ রক্তমিশ্রিত পাতলা পায়খানা হয়।
- ◆ অনেক সময় নাক, মুখ, প্রস্তাব ও মলদার দিয়ে রক্তক্ষরণ হয়।
- ◆ দুঃখবতী গাতী দুধ দেয়া কমিয়ে দেয় এবং দুধ হলুদ ও রক্তমিশ্রিত হয়।
- ◆ পাকান্ত আক্রান্তের ফলে ডায়ারিয়া ও রক্ত আমাশয় দেখা দেয়।
- ◆ গর্ভবতী গাতীর গর্ভপাত হয়।
- ◆ আক্রান্ত গরু একদিনের বেশি জীবিত থাকলে জিহ্বা, গলা, বুক, নাভি ও যোনিদ্বার ইডিমার কারণে স্ফীত দেখায়।

রোগ নির্ণয়

নিম্নলিখিতভাবে এ রোগ নিরূপণ করা যায়। যথা—

- ◆ গবাদিপশুর হঠাত মৃত্যুর ইতিহাস এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রোগলক্ষণ পরীক্ষা করে এ রোগ সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

গবাদি পশুর হঠাতে মৃত্যুর ইতিহাস
এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রোগলক্ষণ
পরীক্ষা করে তড়কা রোগ সম্পর্কে
ধারণা করা যায়।

সুনির্দিষ্টভাবে এ রোগ নির্ণয়ের জন্য আক্রান্ত পশুর কালো রক্ত ও স্থানিক ইডিমার ফ্লুইড নিতে হয়। এগুলো গ্রামস স্টেইন ও পলিক্রোম মিথাইল ব্রু স্টেইন করে *Bacillus anthracis* জীবাণু শণাক্ত করা যায়।

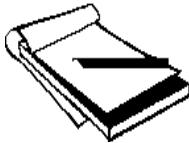
- ◆ মৃত পশুর দেহের বিভিন্ন পরিবর্তন দেখেও রোগ নির্ণয় করা যায়। যথা—
 - পচন দ্রুত শুরু হয় ও পেটফাঁপা থাকে।
 - দেহের স্বাভাবিক ছিদ্রপথ দিয়ে আলকাতরার ন্যায় কালো রক্ত বের হয় এবং রক্ত জমাট বাঁধে না।
 - মৃত্যুর পর অঙ্গপত্যঙ্গে কাঠিন্য আসে না বা রাইগর মরাটিস হয় না।
 - সমগ্র দেহে রক্তক্ষরণ, স্ফীত লসিকগ্রাস্তি, অস্তপ্রদাহ ও গ্যাসীয় পচন হয়।
 - পুরী স্ফীত থাকে এবং নরম ও কালো দেখায়।
- ◆ অ্যাসকলি প্রিসিপিটেশন টেস্টের (Ascoli Precipitation Test) মাধ্যমেও এ রোগের নিশ্চিত পরীক্ষা করা যায়।

চিকিৎসা

অ্যান্টিসিরাম, অ্যান্টিবায়োটিক এবং সালফোনেমাইড গ্রাপের ওষুধমারা চিকিৎসা করা সম্ভব। অ্যান্টিসিরাম দেয়ার পর অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে ৪/৫ দিন চিকিৎসা করতে হবে। কারণ, অ্যান্টিসিরাম শুধু জীবাণু সৃষ্টি বিষ নষ্ট করবে। কাজেই, জীবাণুকে মারার জন্য অ্যান্টিবায়োটিক বা সালফোনেমাইড গ্রাপের ওষুধের ব্যবহার প্রয়োজন। অ্যান্টিসিরাম না পাওয়া গেলে শুধু অ্যান্টিবায়োটিক বা সালফোনেমাইড গ্রাপের ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা যাবে।

রোগপ্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ

- ◆ আক্রান্ত পশুর চিকিৎসা করতে হবে। সুস্থ পশুকে টিকা প্রদান করতে হবে। বাংলাদেশে অ্যানথ্রাক্স স্পোর ভ্যাকসিন পাওয়া যায়। বছরে একবার নির্ধারিত মাত্রায় এ টিকা প্রয়োগ করতে হবে।
- ◆ স্বাস্থ্যসম্মত বিধিব্যবস্থার মাধ্যমে এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এজন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মেনে চলতে হবে। যথা—
 - এ রোগে মৃত পশুর কোনো ময়না তদন্ত বা কাটাছেঁড়া করা যাবে না। কারণ, জীবাণু বায়ুর সংস্পর্শে আসলেই স্পোরে পরিণত হয়। তাই মৃত পশুর দেহের সকল স্বাভাবিক ছিদ্রপথ তুলো দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে। এতে মরদেহ পচনের সাথে সাথে জীবাণুর মৃত্যু ঘটবে। তাছাড়া এ রোগে মৃত পশুকে ২ মিটার গভীর গর্তে পর্যাণ কলিচুন সহকারে মাটিচাপা দিতে হবে। মাটির উপরে কাঁটাজাতীয় কোনো গাছের ডাল পুতে দিতে হবে যেন সেখানে লোকজন বা পশু চলাচল না করে।
 - স্পোর সৃষ্টির পূর্বেই মৃত পশুর গোয়াল ঘরকে গরম ১০% সোডিয়াম হাইড্রোক্লাইড (60° সে.) দিয়ে ধোত করলে জীবাণুর মৃত্যু ঘটবে। তবে স্পোর সৃষ্টির সন্ধারণা থাকলে ঘন জীবাণুনাশক ওষুধ, যেমন— ৫% লাইজল বা ফরমালিন বা অন্য কোনো কার্যকরী জীবাণুনাশক ওষুধ নির্ধারিত মাত্রায় প্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।
 - আক্রান্ত পশুর সংস্পর্শের অন্যান্য সুস্থ পশুকে পৃথক করে হাইপারইমিউন সিরাম (Hyperimmune Serum) ইনজেকশন দেয়া যায়।
 - পশুজাত দ্রব্য, যেমন— বোন মিল আমদানির মাধ্যমে এ রোগের জীবাণু একদেশ থেকে অন্যদেশে ছড়াতে পারে। সুতরাং বোন মিল আমদানির ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা প্রয়োজন।



অনুশীলন (Activity) ১ বাদলা, গলাফোলা ও তড়কা রোগের মধ্যে প্রধান পার্থক্যগুলো হক আকারে লিপিবদ্ধ করুন।

সারমর্ম ১ তড়কা বা অ্যানথ্রাক্স রোগ পশুর ব্যাকটেরিয়াজনিত একটি অতিতীব্র প্রকৃতির সংক্রামক রোগ। *Bacillus anthracis* নামক গ্রাম পজিটিভ দণ্ডকৃতির ব্যাকটেরিয়ার কারণে এ রোগ হয়। সেপ্টিসেমিয়া এবং হঠাৎ মৃত্যু এ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ রোগে মৃত পশুর দেহে দ্রুত পচন ধরে এবং পেট ফুলতে শুরু করে। নাক, মুখ, প্রস্তাব ও পায়খানার রাস্তা দিয়ে আলকাতরার মতো কালো বর্ণের রক্ত বের হতে থাকে। মৃতদেহে কাঠিন্য আসে না এবং পীহা অত্যন্ত স্ফীত, নরম ও কালো থাকে। অ্যান্টিসিরাম, অ্যান্টিবায়োটিক এবং সালফোনেমাইড গ্রুপের ঔষধ দিয়ে এ রোগের চিকিৎসা করা যায়। স্বাস্থ্যসম্মত বিধিব্যবস্থা কঠোরভাবে পালন করে এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। টিকা প্রদানের মাধ্যমে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়।



পাঠোভ্র মূল্যায়ন ৩.৪

১। **সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।**

ক. তড়কা রোগে পশুর স্বাভাবিক ছিদ্রপথে কেমন রক্ত বের হয়?

- i) টকটকে লাল রক্ত
- ii) তাজা রক্ত
- iii) চকোলেট রঙের রক্ত
- iv) আলকাতরার মতো কালো রক্ত

খ. *Bacillus anthracis* জীবাণুর বিষের কোন্ অংশ সংহারকারক?

- i) উৎপাদক ১
- ii) উৎপাদক ২
- iii) উৎপাদক ৩
- iv) কোনোটিই নয়

২। **সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।**

ক. তড়কা রোগে মৃতদেহে কাঠিন্য আসে।

খ. তড়কা রোগের ব্যাকটেরিয়া, রক্তচোষক ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে ছড়াতে পারে।

৩। **শূন্যস্থান পূরণ করুন।**

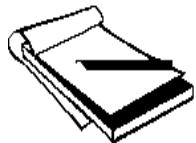
ক. তড়কা রোগ প্রধানত _____ খাদ্য ও পানির মাধ্যমে সংক্রমিত হয়।

খ. তড়কা রোগকে _____ বা স্পেনিক ফিভার বলে।

৪। **এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।**

ক. *Bacillus anthracis* মানুষের ত্বকে কী রোগ সৃষ্টি করে?

খ. তড়কা রোগে মৃত পশুকে কীভাবে মাটিচাপা দিতে হয়?



চূড়ান্ত মূল্যায়ন - ইউনিট ৩

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন

- ১। গবাদিপদ্ধর গুরুত্বপূর্ণ ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগের নাম লিখুন এবং এগুলোর মধ্যে অন্তর পাঁচটি রোগের জীবাণুর নাম উল্লেখ করুন।
- ২। বাচুরে কেন নাভেল/জয়েন্ট ইল রোগ হয়?
- ৩। বাচুরের ডিপথোরিয়া রোগ কী? এ রোগের লক্ষণগুলো লিপিবদ্ধ করুন।
- ৪। বাচুরের নাভেল ইল সৃষ্টিকারী জীবাণুগুলোর বৈজ্ঞানিক নাম লিখুন।
- ৫। বাদলা রোগের কারণ কী? কোন্ ধরনের পশু এতে বেশি আক্রান্ত হয়?
- ৬। কীভাবে বাদলা রোগ বিকাশলাভ করে?
- ৭। গলাফোলা রোগ কী? এ রোগের ব্যাকটেরিয়ার সিরোটাইপগুলোর নাম লিখুন।
- ৮। কীভাবে বাদলা রোগ নির্ণয় করা যায়?
- ৯। তীব্র প্রকৃতির তড়কা রোগের লক্ষণ বর্ণনা করুন।
- ১০। কীভাবে তড়কা রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করবেন?



উত্তরমালা - ইউনিট ৩

পাঠ ৩.১

- | | | | | | |
|---------------------|---------|-------------------------------|----------|--------------------|------------|
| ১। ক. iv | ১। খ. i | ২। ক. মি | ২। খ. মি | ৩। ক. ম্যানিনজাইটস | ৩। খ. ক্ষত |
| ৪। ক. ওফ্ফ্যালাইটিস | | ৪। খ. ক্ষত দেখতে থায় একই রকম | | | |

পাঠ ৩.২

- | | | | | | |
|------------|-----------------------------------------------|---------|----------|------------------|-------|
| ১। ক. i | ১। খ. iii | ২। ক. স | ২। খ. মি | ৩। ক. পয়ঃস্তুতি | ৩। খ. |
| বাতাসবিহীন | ৪। ক. পশু হাঁটতে পারবে না বা খুঁড়িয়ে হাঁটবে | | | টেক্সিমিয়ার | কারণে |

পাঠ ৩.৩

- | | | | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------------------|----------|-----------------|------------------|
| ১। ক. i | ১। খ. ii | ২। ক. স | ২। খ. মি | ৩। ক. স্বরয়স্ত | ৩। খ. এন্ডোট্রিন |
| ৪। ক. অতিতীব্র ও তীব্র প্রকৃতির | | ৪। খ. হলুদ বর্ণের জেলির মতো তরল পদার্থ | | | |

পাঠ ৩.৪

- | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|----------|-----------------------------------------|-------------------|--------------|
| ১। ক. iv | ১। খ. iii | ২। ক. মি | ২। খ. স | ৩। ক. দুষ্প্রিয়ত | ৩। খ. চারবোন |
| ৪। ক. ম্যালিগন্যান্ট কারবাক্সল | | | ৪। খ. কালিচুন সহকারে ২ মিটার গভীর গর্তে | | |

ইউনিট ৪

গবাদিপশুর সাধারণ পরজীবীজনিত রোগ

ইউনিট ৪ গবাদিপশুর সাধারণ পরজীবীজনিত রোগ

পরজীবীর ইংরেজি প্রতিশব্দ Parasite (প্যারাসাইট)। Para শব্দের অর্থ নিকটে বা সঙ্গে এবং Site শব্দের অর্থ অবস্থান। পরজীবী এক প্রকার ছোট প্রাণী যা অন্য বড় প্রাণীর আশ্রয়ে থেকে আশ্রয়দাতার শরীর হতে খাদ্য গ্রহণ করে বংশবিস্তার করে। পরজীবী যে প্রাণীতে আশ্রয় গ্রহণ করে তাকে পোষক (Host) বলে। গরুর যকৃতের পাতাকূমি *Fasciola hepatica* (ফ্যাসিওলা হেপাটিকা) পিস্তনালিতে অবস্থান করে রক্ত শোষণ করে বংশবিস্তার করে। এখানে গরু পোষক এবং *Fasciola hepatica* পরজীবী। পোষকের বাইরে পরজীবীর জীবনচক্রের লার্ভার স্তরগুলোর (Larval Stages) বৃদ্ধির জন্য যে পোষকের প্রয়োজন হয় তাকে মাধ্যমিক পোষক (Intermediate Host) বলে। সাধারণত পরজীবীকে দুভাগে ভাগ করা হয়। যেমন— ক. দেহাভ্যস্তরের পরজীবী ও খ. বহিঃপরজীবী। দেহাভ্যস্তরের পরজীবী (Endoparasite) দেহের ভিতরে অবস্থান করে। যেমন— যকৃতের পাতাকূমি, কেঁচোকূমি (*Ascaris* spp.)। পাতাকূমির লার্ভার স্তরগুলো শামুকের ভিতরে বৃদ্ধি পায়। সুতরাং শামুক মাধ্যমিক পোষক। বহিঃপরজীবী (Ectoparasite) পোষকের দেহের বাইরে অবস্থান করে। যেমন— উকুল (Lice), আটালি (Tick) ইত্যাদি। আমাদের দেশের প্রকৃতি ও পরিবেশ পরজীবীর দ্রুত বংশবৃদ্ধির অনুকূল। দেশের অধিকাংশ গবাদিপশু কোনো না কোনো পরজীবী কর্তৃক আক্রান্ত। দেশী জাতের গরুর চেয়ে উন্নত সংকর জাতের গরু পরজীবী গ্লারা বেশি আক্রান্ত হয়। এতে পশুর স্বাস্থ্যহানি হয় এবং দুধ, মাংস ও হালচাষের শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায়। বিভিন্ন কৌশলে এসব পরজীবী দমন করে গবাদিপশুর উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়।

এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে গবাদিপশুর দেহাভ্যস্তর ও বহিঃদেহের বিভিন্ন ধরনের পরজীবী প্রাণী, প্রেটোজোয়া প্রভৃতির গ্লারা সৃষ্টি অপকারিতা, রোগের লক্ষণ, চিকিৎসা, রোগ দমন ইত্যাদি বিষয়গুলো তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিকসহ আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ৪.১ গবাদিপশুর সাধারণ অন্তঃপরজীবীর পরিচিতি

এ পাঠ শেষে আপনি –

- গবাদিপশুর সাধারণ অন্তঃপরজীবীগুলোর পরিচয় বলতে পারবেন।
- গবাদিপশুর সাধারণ অন্তঃপরজীবী সৃষ্টি রোগের লক্ষণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- গবাদিপশুর সাধারণ অন্তঃপরজীবীজনিত রোগ দমনের কৌশল বর্ণনা করে লিখতে পারবেন।



অন্তঃপরজীবী

অন্তঃ পরজীবীকে এক কথায় কূমি (Worm or Helminth) বলে। কূমি দেখতে পাতা, ফিতা বা কেঁচোর মতো হতে পারে। পোষকে কূমির অবস্থান, ক্ষতির ধরন এবং কূমিনশক বাছাই ও তার প্রয়োগ কৌশল নির্ধারণের জন্য কূমি শণাক্তকরণ গুরুত্বপূর্ণ। গবাদিপশুর প্রায় সব কূমিকে দুটো পর্বে (Phylum) ভাগ করা হয়েছে। যথা— ক. প্লাটিহেলমিনথস্ (Platyhelminthes) ও খ. নেমাথেলমিনথস্ (Nemathelminthes)।



কূমি প্লাটিহেলমিনথস্ ও নেমাথেলমিনথস্ নামক দুটো পর্বে বিভক্ত।

প্লাটিহেলমিনথস্ এর ট্রেমাটোডা ও সিস্টোডা নামক দুটো শ্রেণীর কূমি গবাদিপশুর পরজীবী।

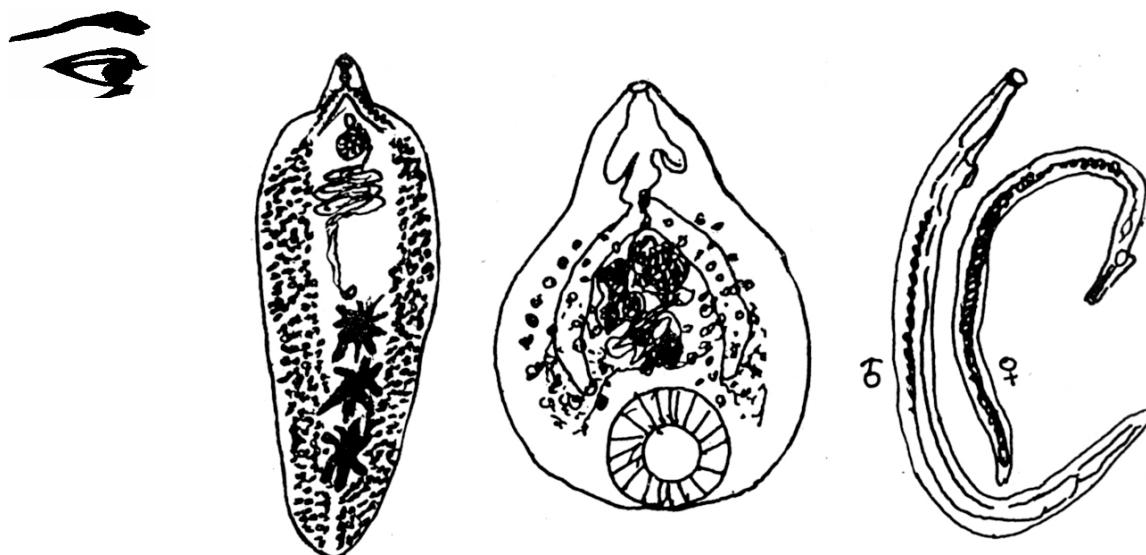
ক. প্লাটিহেলমিনথস্ (Platyhelminthes) : প্লাটিহেলমিনথস্ এর তিনটি শ্রেণীর (Class) মধ্যে টারবেল্লারিয়া (Turbellaria) প্রায় সম্পূর্ণ মুক্তভাবে বিচরণকারী (Free Living)। এরা গবাদিপশুর পরজীবী নয়। অন্য দুটো শ্রেণী, যেমন— ট্রেমাটোডা (Trematoda) অর্থাৎ পাতাকূমি ও সিস্টোডা (Cestoda) অর্থাৎ ফিতাকূমি গবাদিপশুর দেহাভ্যস্তরের পরজীবী।

খ. নেমাথেলমিনথস্ (Nemathelminths) : নেমাথেলমিনথস্ এর নেমাটোডা (Nematoda) শ্রেণীর কৃমিগুলো দেখতে গোল বলে এদেরকে গোলকৃমি (Roundworm) বলে।

পাতাকৃমি বা ট্রেমাটোড (Trematode)

ফ্লুক দেখতে পাতার মতো বলে এদের পাতাকৃমি বলে। রঞ্জ পান করে বলে এদেরকে লালচে দেখা যায়।

ট্রেমাটোড (Trematoda) শ্রেণীর কৃমিগুলোকে ট্রেমাটোড বলে। ট্রেমাটোডকে ইংরেজিতে ফ্লুক (Fluke) বলে যার অর্থ পাতাকৃমি। দেখতে পাতার মতো বলে একে পাতাকৃমি বলা হয়। অধিকাংশ পাতাকৃমি হালকা ঘিয়ে রঙের হয়ে থাকে। তবে, রঞ্জ পানের কারণে অনেক সময় লালচে দেখায়। এরা উপরিনিচে চ্যাপ্টা। এদের দুটা সাকার (Sucker) অর্থাৎ শোষক আছে। মুখের সাকারকে ওরাল সাকার (Oral Sucker) এবং দেহের তলদেশে অবস্থিত সাকারকে ভেন্ট্রাল সাকার (Ventral Sucker) বা অ্যাসিটাবুলাম (Acetabulum) বলে। সাকারের সাহায্যে পাতাকৃমি পোষকের অঙ্গে আটকে থাকে। ওরাল সাকারে অবস্থিত মুখের সাহায্যে খাদ্য গ্রহণের পর তা গলবিল বা ফ্যারিংস (Pharynx) হয়ে গলনালি বা ইসোফেগাসের (Oesophagus) ভিতর দিয়ে বন্ধ অন্তে (Blind Gut) প্রবেশ করে। অপাচ্য বা অ্যাচিট (Undigested or Unwanted) খাদ্য বমির মাধ্যমে বের করে ফেলে। এদের কোনো পায়ুপথ (Anus) নেই। সারণি ৬ এ গবাদিপশুর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পাতাকৃমির তালিকা দেয়া হয়েছে।

ক—*Fasciola* spp.খ—*Paramphistomum* spp.গ—*Schistosoma* spp.

চিত্র ৩০ (ক, খ, গ) : কয়েক প্রজাতির পাতাকৃমি

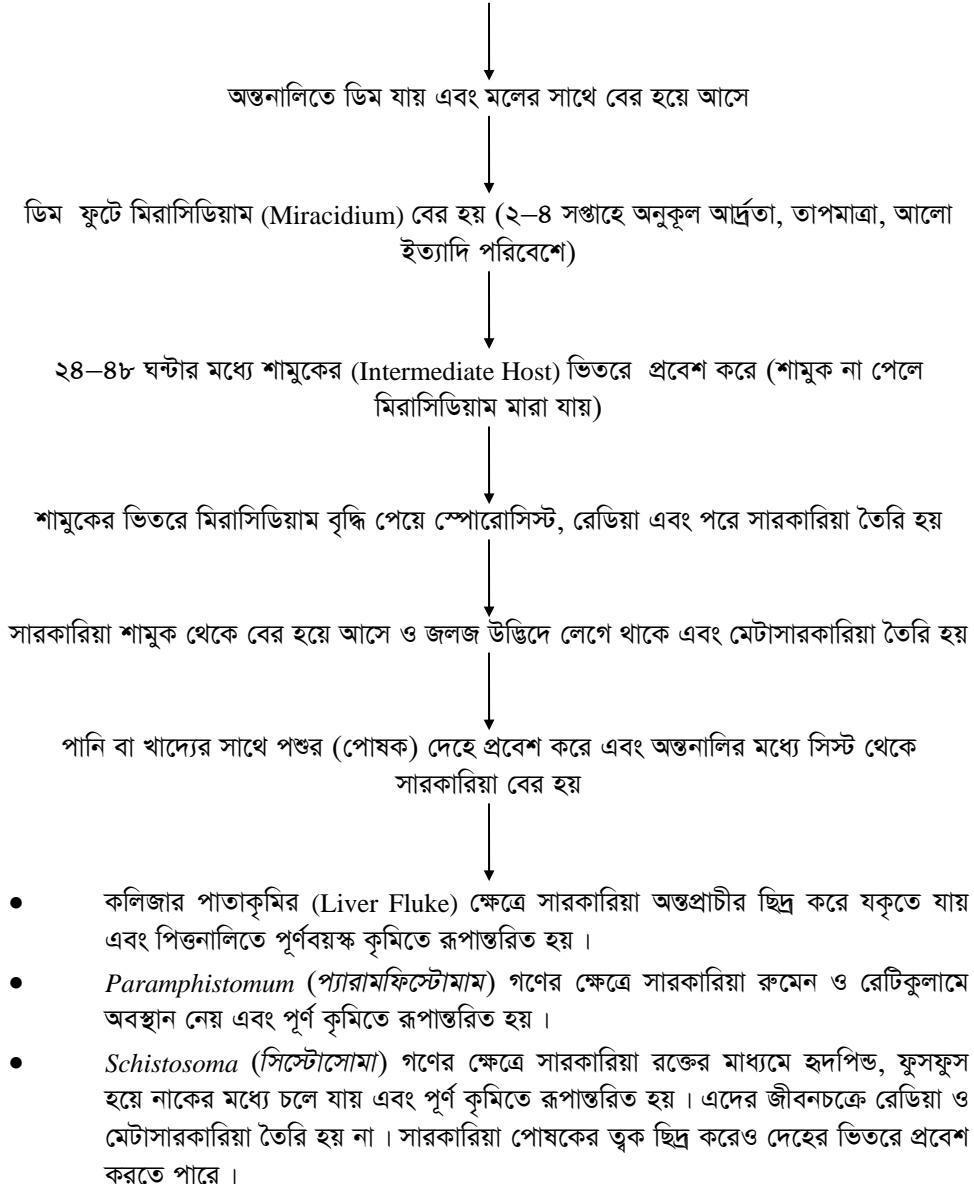
সারণি ৬ : গবাদিপশুর গুরুত্বপূর্ণ পাতাকৃমিসমূহ

ক্রমিক নং	পাতাকৃমির নাম	আক্রান্ত পশুর নাম	আক্রান্ত স্থান বা অবস্থান
১.	<i>Fasciola hepatica</i> (ফ্যাসিওলা হেপাটিকা)	গরু, ছাগল, ভেড়া	পিওনালি
২.	<i>Fasciola gigantica</i> (ফ্যাসিওলা জাইগান্টিকা)	গরু, মহিষ, ভেড়া	পিওনালি, যকৃত (কলিজা)
৩.	<i>Paramphistomum cervi</i> (প্যারামফিস্টোমাম সারভি)	গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া	রুমেন ও রেটিকুলাম

ক্রমিক নং	পাতাকৃমির নাম	আক্রান্ত পশুর নাম	আক্রান্ত স্থান বা অবস্থান
৮.	<i>Schistosoma bovis</i> (সিস্টেসোমা বভিস)	গরু, মহিষ, ছাগল, তেড়ো	পোটাল ও মেসেন্টেরিক শিরা
৫.	<i>Schistosoma nasalis</i> (সিস্টেসোমা ন্যাজালিজ)	গরু, মহিষ, ছাগল, তেড়ো	নাক

পাতাকৃমির জীবনচক্র (Life Cycle)

পূর্ণবয়স্ক কৃমি পোষকের যে অঙ্গে (Organ) বসবাস করে (যেমন— পিত্তনালি, পাকস্থলী, নাকের মধ্যে)
সেখানে ডিম পাড়ে

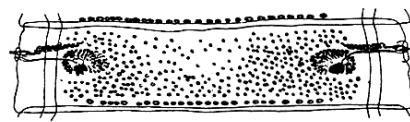
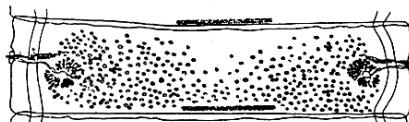


ফিতাকৃমি বা সিস্টোড (Cestode)

সিস্টোডা (Cestoda) শ্রেণীর কৃমিগুলোকে সিস্টোড বলে। সিস্টোডা বা ফিতাকৃমিকে জার্মান ভাষায় Bund Worm বলে যার অর্থ Ribbon বা ফিতা। এ কৃমি লম্বা, চ্যাপ্টা এবং ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত।

ফিতাকৃমি ফিতার মতো
অনেকগুলো অংশে বিভক্ত।
এদের ক্ষেপণের রোস্টেলাম
কাঁটাযুক্ত হয়, ৪টি সাকার এবং
গলার পর প্রোগ্লোটিড যা পৃষ্ঠা
পেলে ডিমের থলের পরিণত হয়।

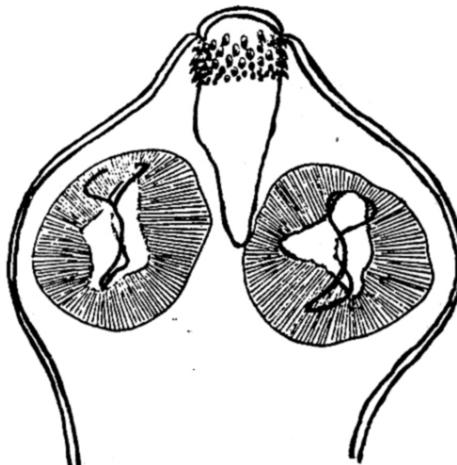
প্রতিটি ছোট অংশকে সেগমেন্ট (Segment) বা প্রোগ্লোটিড (Proglottid) বলে। কৃমির শরীরকে
দুভাগে ভাগ করা হয়। যথা— ক. ক্ষেপণেক্ষ (Scolex) বা মাথা ও খ. ধড় বা স্ট্ৰোবিলা (Strobila)।
ক্ষেপণেক্ষের অগ্রভাগে ভিতরে ঢুকানো কাঁটাযুক্ত (Hooks) অংশকে রোস্টেলাম (Rostallum) বলে।
এর চারদিকে চারটি সাকার (Sucker) আছে। সাকারগুলো সাধারণত কাঁটাযুক্ত হয়। ক্ষেপণেক্ষের
নিচের প্রান্তের মসৃণ অংশকে গলা বা নেক (Neck) বলে। প্রতিটি প্রোগ্লোটিডে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়
প্রজনন অঙ্গ অবস্থিত। পূর্ণবয়স্ক একটি প্রোগ্লোটিড ডিমের থলের মতো কাজ করে। গবাদিপশুর মলের
সঙ্গে ভাতের দানার মতো দেখতে পূর্ণবয়স্ক প্রোগ্লোটিড বের হয়ে আসে।



ক—*Moniezia benedini*

খ—*Moniezia expansa*

চিত্র ৩১ (ক, খ) : *Moniezia benedini* ও *Moniezia expansa* প্রজাতির ফিতাকৃমির দুটো প্রোগ্লোটিড



ক

চিত্র ৩২ (ক, খ) : *Dipylidium Caninum* প্রজাতির ফিতাকৃমির ক্ষেপণেক্ষ (ক) ও প্রোগ্লোটিড (খ)



চিত্র ৩৩ : প্রাণ্বয়স্ক *Echinococcus granulosus* প্রজাতির ফিতাকৃমি

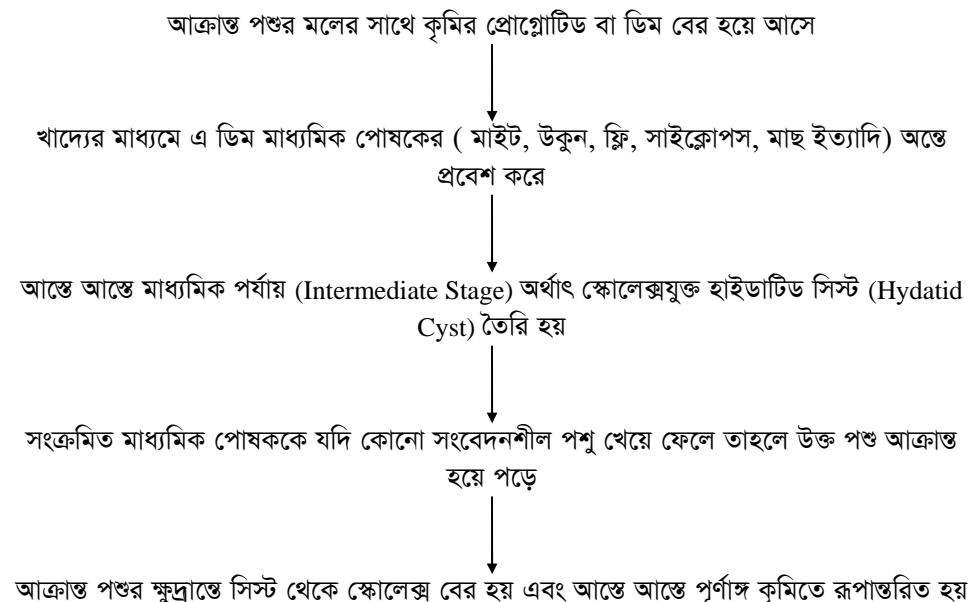
প্রতিটি পূর্ণবয়স্ক প্রোগ্লোটিড বহু ডিমে ভর্তি থাকে। ডিমের ভিতরটি ছয় হকবিশিষ্ট বলে একে হেক্সাকান্থ ডিম (Hexacanth Egg) বলে। সারণি ৭ এ গবাদিপশুর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ফিতাকৃমির নাম ও অবস্থান দেখানো হয়েছে।

সারণি ৭ : গবাদিপশুর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ফিতাকৃমি

ক্রমিক নং	ফিতাকৃমির নাম	আক্রান্ত পশুর নাম	আক্রান্ত স্থান বা অবস্থান
১.	<i>Moniezia expansa</i> (মনিজিয়া এক্সপ্লানসা)	গরু, ছাগল, ভেড়া	শুদ্ধান্ত
২.	<i>Moniezia benedeni</i> (মনিজিয়া বেনেডেনি)	মূলত গরু	শুদ্ধান্ত
৩.	<i>Avitellina centripunctata</i> (অ্যাভিটেলিনা সেন্ট্রিপন্টাটা)	গরু, ছাগল, ভেড়া	শুদ্ধান্ত
৪.	<i>Dipylidium caninum</i> (ডাইপাইলিডিয়াম ক্যানিনাম)	কুকুর, বিড়াল	শুদ্ধান্ত
৫.	<i>Diphyllobothrium latum</i> (ডাইফাইলোবোথ্রিয়াম ল্যাটাম)	কুকুর, বিড়াল, শুকর	শুদ্ধান্ত
৬.	<i>Echinococcus granulosus</i> (ইকাইনোকক্স গ্রানুলোসাস)	মূলত কুকুর	শুদ্ধান্ত

ফিতাকৃমির জীবনচক্র

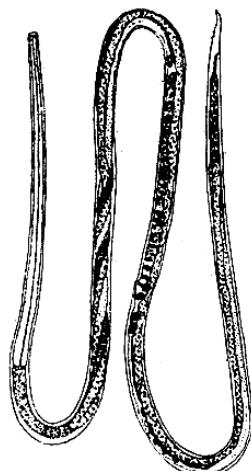
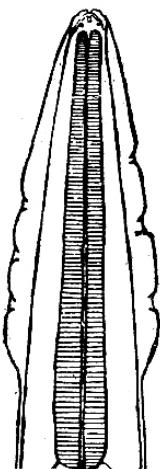
প্রায় প্রতিটি ফিতাকৃমির জীবনচক্র মোটামুটি একই রকম। নিম্নে ফিতাকৃমির জীবনচক্র দেখানো হলো—



গোলকৃমি বা নেমাটোড (Nematode)

নেমাটোডকে গোলাকৃমি বলা হয়। এরা মুক্তভাবে বা পরজীবী হয়ে জীবনধারণ করে। এদের স্তুপুরূষ আলাদা।

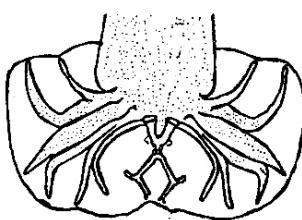
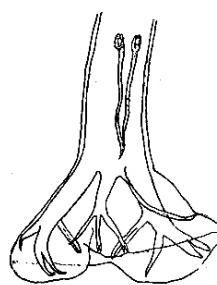
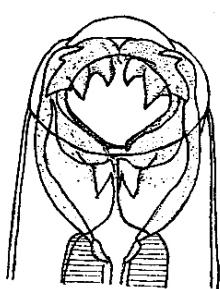
নেমাথেলিমিনথস্ (Nemathelminthes) পর্বের নেমাটোডা (Nematoda) শ্রেণীভুক্ত গোলকৃমি দুভাবে জীবন ধারণ করে। ক. মুক্তাবস্থায় (Free Living) এবং খ. পরজীবী (Parasite) হিসেবে নেমাটোডা (Nematoda) শ্রেণীর কৃমিগুলোকে নেমাটোড বলে। কেঁচের মতো গোল দেখায় বলে এদেরকে গোলকৃমি বলে। শরীরের চামড়ার (Cuticle) ভিতরে টিউবের আকারের রেচনাস তরল পদার্থে ভেসে থাকে। এ কৃমির সামনের অংশে কাঁটার মতো দুটো পেপিলি (Papillae) থাকে যাকে গলার পেপিলি (Cervical Papillae) এবং লেজের দিকে অনুরূপ দুটো পেপিলিকে লেজের পেপিলি (Caudal Papillae) বলে। লেজের পাতার ন্যায় চ্যাপ্টা অঙ্কে বাসা (Bursa) বলে। সামনের প্রান্তে মুখ, মুখের পরে গলনালি বা খাদ্যনালি (Oesophagus), এরপর ক্ষুদ্রান্ত (Intestine) এবং এর শেষ প্রান্তে পায়ুপথ (Anal Pore) অবস্থিত। স্তু কৃমির যোনির ভাঁজ বা ভালভাল ফ্ল্যাপ (Vulval Flap) এবং পুরুষ কৃমির স্পিকুল (Spicule) হলো যৌনাঙ্গ। অধিকাংশ গবাদিপশুর গোলকৃমি ডিম দেয়। সারণি ৮ এ গবাদিপশুর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গোলকৃমির তালিকা দেয়া হয়েছে।



ক

খ

চিত্র ৩৪ (ক, খ) : *Toxocara canis* (ক) ও *Strongyloides* spp. (খ) প্রজাতির নেমাটোড



ক

খ

গ

চিত্র ৩৫ (ক, খ, গ) : *Ancylostoma caninum* এর উপরের অংশ (ক), *Bunostomum* spp. এর নিচের অংশ (খ) এবং *Cooperia* spp. এর নিচের অংশ (গ)

সারণি ৮ : গবাদিপশুর গুরুত্বপূর্ণ গোলকৃমি

ক্রমিক নং	গোলকৃমির নাম	আক্রান্ত পশুর নাম	আক্রান্ত স্থান বা অবস্থান
১.	<i>Parascaris equorum</i> (পারাস্কারিস ইকুরাম)	যোড়া	ক্ষুদ্রান্ত
২.	<i>Neoascaris vitulorum</i> (নিওঅস্কারিস ভাইটুলোরাম)	গরু, মহিষ	ক্ষুদ্রান্ত
৩.	<i>Toxocara canis</i> (টোকোকারা ক্যানিস)	কুকুর	ক্ষুদ্রান্ত
৪.	<i>Haemonchus contortus</i> (হেমোনকাস কন্টর্টাস)	গরু, ছাগল, ভেড়া	পাকস্থলী
৫.	<i>Strongyloides papillosum</i> (স্ট্রন্জাইলয়েডিস প্যাপিলোসাস)	গরু, ছাগল, ভেড়া	ক্ষুদ্রান্ত
৬.	<i>Strongylus equinus</i> (স্ট্রন্জাইলাস ইকুইনাস)	যোড়া	সিকাম, কোলন
৭.	<i>Ancylostoma caninum</i> (অ্যানকাইলোটোমা ক্যানিনাম)	কুকুর, শিয়াল	ক্ষুদ্রান্ত
৮.	<i>Bunostomum phlebotomum</i> (বুনোস্টোমাম ফ্লেবোটোমাম)	গরু	ডিওডেনাম
৯.	<i>Thelazia rhodesii</i> (থেলাজিয়া রোডেসি)	গরু, ছাগল, ভেড়া	চোখ
১০.	<i>Cooperia punctata</i> (কুপেরিয়া পাঙ্কটাটা)	গরু	ক্ষুদ্রান্ত

গোলকৃমির জীবনচক্র

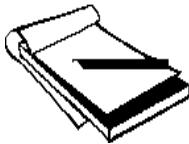
গোলকৃমির ডিম মলের সাথে বাইরে এসে L_1 লার্ভা ফুটে। এ L_1 পরিণত হয়ে L_2 হয়ে লার্ভায় পরিণত হয়ে গবাদিপশুকে আক্রান্ত করে।

গবাদিপশুর প্রায় সব গোলকৃমির ডিম মলের সাথে বের হয়ে মাটির উপর পড়ে। তাপ ও আর্দ্ধতার ওপর নির্ভর করে ১-৩ দিনের মধ্যে ডিম থেকে প্রথম স্তরের লার্ভা (L_1) বেরিয়ে এসে মাটির মধ্যে বা গোবরে অবস্থান করে। L_1 লার্ভা ২-৩ দিনের মধ্যে রূপান্তরিত (Moult) হয়ে দ্বিতীয় স্তরের লার্ভায় (L_2) পরিণত হয় এবং অনুরূপভাবে ২-৩ দিনে তৃতীয় স্তরের লার্ভা (L_3) বা ইনফেক্টিভ লার্ভা মাটিতে বা ঘাসের গোড়ায় অবস্থান করতে থাকে। তাপ, আলো, আর্দ্ধতা ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে এরা ঘাসের ডগায় উঠে আসে এবং এ ঘাস থেয়ে গবাদিপশু আক্রান্ত হয়। এভাবে Stomach Worm (স্টমাক ওয়ার্ম), *Haemonchus* (হেমোনকাস), *Mecistocirrus* (মেসিস্টোসিরাস), *Ostertagia* (ওস্টেরটেজিয়া), *Trichostrongylus* (ট্রাইকোস্ট্রন্জাইলাস) এবং ক্ষুদ্রান্তের কৃমি *Oesophagostomum* (ইসোফেগোস্টোবামাম), *Strongyloides* (স্ট্রন্জাইলয়েডিস) গণের বিভিন্ন প্রজাতি ঘারা গবাদিপশু আক্রান্ত হয়।

কেঁচো কৃমির অর্থাৎ *Toxocara (Neoascaris) vitulorum* এর ডিম মলের সাথে বাইরে এসে ডিমের মধ্যেই L_1 লার্ভা L_2 তে পরিণত হয় এবং L_2 যুক্ত ডিম থেয়ে গবাদিপশু আক্রান্ত হয়। এ L_2 থেকে L_3 হয়ে L_4 গাভীর মাংসে সুপ্তবস্থার (Dorment) থেকে গর্ভবস্থার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। গর্ভবস্থার শেষের দিকে মায়ের জরায়ুতে (Womb) বা জন্মের পর দুধের সাথে লার্ভা ঘারা নতুন জন্মানো বাচ্চুর আক্রান্ত হয়ে থাকে। এ কৃমি বাচ্চুরের ক্ষুদ্রান্তে অবস্থান করে। গবাদিপশুর বক্রকৃমি বা হুকওয়ার্মের (Hookworm) L_3 শরীরের চামড়া ভেদ করে ভিতরে প্রবেশ করে। ফাইলেরিয়া ধরনের গোলকৃমির জীবনচক্র পরোক্ষ (Indirect)। *Stephanofilaria assamensis* (স্টেফানোফাইলেরিয়া আসামেনিসিস) প্রজাতির গোলকৃমিও একপ্রকার ফাইলেরিয়া। *Musca codusence* (মাক্ষা কনডুসেন্স) প্রজাতির মাছি এর ভেষ্টর (Vector) বা মাধ্যমিক পোষক। মাছি কৃমি আক্রান্ত ঘা থেকে L_1 লার্ভা রক্ত

বা রসের সাথে খেয়ে ফেলে। মাছির ভিতর (Humpsore) এটি L₃ তে বৃদ্ধি পায়। মাছি রক্ত বা রস খাওয়ার সময় L₃ নতুন ঘায়ে সংক্রমিত হয়ে হাম্পসোর বা চুটে বা গজে ঘায়ের সৃষ্টি করে।

অনুশীলন (Activity) : পাতা, ফিতা ও গোলকূমির জীবনচক্রের মধ্যকার পার্থক্যগুলো খুঁজে বের করে খাতায় লিখুন।



সারমর্ম ৪ দেহাভ্যন্তরের পরজীবীকে এক কথায় কৃমি বলে। কৃমি মূলত তিন ধরনের। যথা—
পাতাকূমি (Trematode), ফিতাকূমি (Cestode) ও গোলকূমি (Nematode)। এ তিন ধরনের কৃমির
চেহারাগত বেশ পার্থক্য রয়েছে। তাছাড়া এদের জীবনচক্রও বেশ পার্থক্য রয়েছে। এসব কৃমির
অনেকেই মূল বা স্থায়ী পোষককে আক্রান্ত করার পূর্বে মাধ্যমিক পোষকের দেহে অবস্থান করে
বৃদ্ধিপ্রাণ হয়। এসব কৃমি সাধারণত ডিম পাড়ে। ডিম থেকে লার্ভা ও লার্ভা থেকে পূর্ণাঙ্গ কৃমিতে
পরিণত হয়। এ তিন ধরনের কৃমিই গবাদিপশুর উৎপাদনস্থাসে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।



পাঠ্যতত্ত্ব মূল্যায়ন ৪.১

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. দেহাভ্যন্তরের পৰজীবীকে এক কথায় কী বলে?

- i) ফ্লুক
- ii) কৃমি
- iii) প্লাটিহেলমিনথস্
- iv) নেমাখেলমিনথস্

খ. মেটাসারকারিয়া কী?

- i) সঁতারকাটা সারকারিয়া
- ii) লেজওয়ালা সারকারিয়া
- iii) এনসিস্টেড সারকারিয়া
- iv) ইনফেক্ষ্টিভ সারকারিয়া

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. *Schistosoma* গণের পাতাকুমিৰ স্বীপুৱন্ত আলাদা হয়।

খ. লিভাৰ ফ্লুকেৱ এনসিস্টেড সারকারিয়াকে মেটাসারকারিয়া বলে।

৩। শূন্যস্থান পূৰণ কৰুন।

ক. ফিতাকুমিৰ রোস্টেলামেৰ চারদিকে চারটি _____ আছে।

খ. ঘাসেৱ সাথে _____ খেয়ে গবাদিপশু আক্রান্ত হয়।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তৰ দিন।

ক. *Stephanofilaria assamensis* প্রজাতিৰ কৃমিৰ মাধ্যমিক পোষক কী?

খ. গৰ্ভাবস্থাৰ শেষেৱ দিকে মায়েৰ জৰাযুতে বা জন্মেৱ পৰ দুধেৱ সাথে কোন্ কৃমিৰ লাৰ্ভা প্লারা বাচ্চুৰ আক্রান্ত হয়ে থাকে?

পাঠ ৪.২ গবাদিপশুর সাধারণ অস্তঃপরজীবীজনিত রোগ



এ পাঠ শেষে আপনি –

- গবাদিপশুর অস্তঃপরজীবীর অপকারিতা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- গবাদিপশুর অস্তঃপরজীবীজনিত রোগের লক্ষণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- গবাদিপশুর অস্তঃপরজীবীর প্রকোপ বৃদ্ধির কারণ লিখতে পারবেন।
- কীভাবে গবাদিপশুর অস্তঃপরজীবীজনিত রোগ প্রতিরোধ করা যায় তা বুঝিয়ে লিখতে পারবেন।
- গবাদিপশুর অস্তঃপরজীবীজনিত রোগের চিকিৎসা সম্পর্কে আলোচনা করতে পাবেন।



পরজীবীর অপকারিতা

বাংলাদেশের আবহাওয়া ও পরিবেশ কৃমির বংশবিস্তারের পক্ষে অনুকূল। দেশের অধিকাংশ গবাদিপশু পুষ্টিহীনতার শিকার। পুষ্টিহীন গবাদিপশুতে কৃমির আক্রমণ বেশি হয়। তাই এদেশের অধিকাংশ গবাদিপশু কোনো না কোনো কৃমি ফ্লারা আক্রান্ত। আক্রান্ত হলেই গবাদিপশু রোগে ভুগবে তা নয়, অন্য যে কোনো কারণে স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়লে রোগ সৃষ্টির সুযোগ বৃদ্ধি পায়। গবাদিপশু কৃমি রোগে আক্রান্ত হলে উৎপাদন ব্যহত হয়, এমনকী আক্রান্ত প্রাণী মারাও যেতে পারে। গবাদিপশু নানা প্রজাতির কৃমি ফ্লারা আক্রান্ত হলেও অন্ত কিছু সংখ্যক কৃমি এদের উৎপাদনে বাঁধার সৃষ্টি করে। এদেরকে সাধারণত পাতাকৃমি, ফিতাকৃমি ও গোলকৃমি এ তিনি ভাগে ভাগ করা হয়। প্রধানত গোলকৃমি ও পাতাকৃমি গবাদিপশুকে আক্রমণ করে দুধ, মাংস ইত্যাদি উৎপাদনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। আক্রান্ত পশু দুর্বল হয়ে পড়ায় জমি কর্ষণ ও পরিবহণ কাজ ব্যহত হয়। এছাড়া আক্রান্ত গবাদিপশুর চামড়ার মূল্যমানও কমে যায়। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, গাড়ী বিভিন্ন পরজীবী ফ্লারা আক্রান্ত হওয়ার ফলে দৈনিক আধা লিটার দুধ কম দেয় এবং আক্রান্ত গরু প্রতি বছর ১১ কেজি হারে মাংস উৎপাদন কম দেয়।

অপকারিতার ধরন

অস্তঃপরজীবী আক্রান্ত গবাদিপশুতে নিম্নলিখিত অপকার করে থাকে। যথা—

- ◆ অস্ত্র, যকৃতসহ বিভিন্ন অঙ্গে রক্তক্ষরণ ঘটায়।
- ◆ রক্তপান রক্তশূন্যতার সৃষ্টি করে।
- ◆ অস্ত্রনালি বন্ধ করে বাচ্চুরের মৃত্যু ঘটায়।
- ◆ প্যারাসাইটিক গ্যাস্ট্রো-এন্টারাইটিস বা পাতলা পায়খানা উপসর্গের সৃষ্টি করে।
- ◆ আক্রান্ত অস্ত্রের বিল্লির শোষণ ক্রিয়া বন্ধ করে দেয়।
- ◆ শ্বাসপ্রশ্বাসে বিষ্ণ সৃষ্টি করে।
- ◆ যকৃত, ফুসফুস এবং মাংসের ভিতর ক্ষত সৃষ্টি খাওয়ার ফলে অনুপযুক্ত করে তোলে।
- ◆ চামড়ায় ক্ষত সৃষ্টি করে চামড়ার মান ও মূল্য উভয়ই কমিয়ে দেয়।
- ◆ আক্রান্ত পশুর মল, নাকের শ্লেষ্মা ফ্লারা পরিবেশে কৃমির ডিম ছড়ানোর মাধ্যমে পরবর্তী বংশধরদের কৃমিতে আক্রান্ত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়।

গবাদিপশুর পরজীবীজনিত প্রধান প্রধান রোগের লক্ষণ

প্যারাফিস্টেমিয়াসিস (Paramphistomiasis)

সাধারণত বয়স্ক গরুতে এ রোগ বেশি হয়। অপ্রাপ্তবয়স্ক *Paramphistomum Spp.* (প্যারাফিস্টেমায়) গণের পাতাকৃমি পশুর রুমেনে অবস্থান করে এ রোগের সৃষ্টি করে। আক্রান্ত হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে ক্ষুধামন্দা দেখা দেয়। পিপাসা বৃদ্ধি পায়। চার সপ্তাহ ধরে পানিকূণ্ডতায় ভোগে ও পাতলা পায়খানা শুরু হয়। ক্ষুধামন্দা ও পাতলা পায়খানার কারণে পশু দুর্বল হয়ে পড়ে। পিছনের পা পায়খানায় মেঝে থাকে। সামান্য রক্তকূণ্ডতাও দেখা দিতে পারে। মারাত্মক অসুস্থ

কৃমি পশুর যকৃত, ফুসফুস, পাচনতন্ত্র ইত্যাদি আক্রমণ করে স্বাভাবিক ক্রিয়ায় বাঁধা দেয়।

প্যারাফিস্টেমিয়াসিসে পাতলা পায়খানা হবে এবং পায়খানার মধ্যে অপ্রাপ্তবয়স্ক কৃমি দেখা যাবে।

অবস্থাতেও গরু তিনি সপ্তাহ পর্যন্ত বেঁচে থাকে। এ সময় মলের সাথে রক্তসহ অপ্রাপ্তবয়স্ক কৃমি বেরিয়ে আসতে পারে। গাভীর দুধ উৎপাদন করে যায়। হালচাষের শক্তি হ্রাস পায়। আক্রান্ত অন্তর্বয়স্ক গরুর শতকরা ৩০ ভাগ পর্যন্ত মারা যেতে পারে।

ফ্যাসিওলিয়াসিস (Fascioliasis)

ফ্যাসিওলিয়াসিসে রক্তশূন্যতা, দুর্গন্ধিযুক্ত পাতলা পায়খানা ও বেট্টল জ হয় এবং ওজন কমে যায়।

এক বছরের বেশি বয়সের গবাদিপশুতে এ রোগ দেখা যায়। *Fasciola* গণের এ কলিজা কৃমি পিণ্ডনালির গায়ে লেগে থেকে রক্ত শোষণ করে রক্তশূন্যতার সৃষ্টি করে। দৃশ্যমান বিল্লি ফ্যাকাশে দেখায়। চোয়ালে পানি জমে পানির পোটলা বা বোটল জ (Bottle Jaw) তৈরি হয়। পশুর খাদ্য পরিবর্তন দক্ষতা করতে থাকে ফলে ওজন কমে যায়। রুগ্নী অনেকদিন ধরে ভুগতে থাকলে দুর্গন্ধিযুক্ত পাতলা মলত্যাগ করে। গাভীর দুধ উৎপাদন করে যায়, হালচাষের শক্তি হ্রাস পায়। আক্রান্ত গবাদিপশু বিনা চিকিৎসায় রোগে ভুগে ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে মারা যায়।

অন্তের সিস্টেসোমিয়াসিস (Enteric Schistosomiasis)

অন্তের সিস্টেসোমিয়াসিসে রক্তকুন্যতা প্রকট হবে এবং পায়খানায় রক্তযুক্ত শ্লেংগা দেখা যাবে।

বয়স্ক গবাদিপশুতে এ রোগের প্রকোপ বেশি। *Schistosoma* গণের পাতাকৃমি মেসেন্টেরিক শিরা (Mesenteric Vein) ও পোর্টাল শিরার (Portal Vein) ভিতরে অবস্থান করে রক্ত শোষণ করে এবং বুটি (Nodule) সৃষ্টি করে। বুটির ফলে অন্তের প্রদাহ হয়। আক্রান্ত পশু পানির মতো পাতলা পায়খানা করে। রোগীর দেহের ওজন দিন দিন কমতে থাকে। পানিশূন্যতা ও রক্তশূন্যতায় ভোগে। পায়খানার সাথে রক্তযুক্ত পিছিল পদার্থ বা শ্লেংগা (Mucus) থাকে। চোখ কোটরে চুকে যায়। পিপাসা বেড়ে যায়।

নাগেশ্বরি বা ন্যাজাল সিস্টেসোমিয়াসিস (Nasal Schistosomiasis)

গরুর নাকের ভিতরের শিরায় *Schistosoma nasalis* নামক পাতাকৃমি অবস্থান করায় প্রথমে ছোট ছোট লাল দানার মতো দেখা যায়। নাক হতে সবসময় সাদা ঘন শ্লেংগা বের হতে থাকে। নাকের ঘা বাড়তে থাকে এবং পরে তা বড় হয়ে দেখতে ফুলকপির মতো আকৃতির ফোড়ার সৃষ্টি হয়। শ্বাসপ্রশ্বাসে বিল্লি সৃষ্টি হওয়ার ফলে শব্দ হয়। পরবর্তীতে দানা আরও বড় হয় এবং জোড়ে শ্বাস নিতে থাকলে দানা ফেঁটে নাক হতে রক্তমিশ্রিত শ্লেংগা বারতে থাকে। গরু পরিমাণমতো থেতে পারে না; দিন দিন ওজন কমে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং রক্তশূন্যতায় ভোগে। গাভীর দুধ উৎপাদন করে যায়। পশুর কর্মক্ষমতাও ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে।

মনিজিয়াসিস (Monieziasis)

অন্তর্বয়স্ক গবাদিপশু *Moniezia* গণের বিভিন্ন ফিতাকৃমি প্লারা আক্রান্ত হলে এ রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। চারণক্ষেত্রে অতিমাত্রায় মাইট, পিপড়া ইত্যাদি পতঙ্গ থাকলে গবাদিপশুতে এ কৃমির প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। বৃষ্টিপাত কর হলে সে বছর এ কৃমির প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। অতিমাত্রায় আক্রান্ত পশুর ক্ষুদ্রান্ত বন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং পেটে পীড়া হয়। হজমে বিল্লি ঘটে। শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি হ্রাস পায়। কৃশকায় হয়ে যায়। শরীরে পানি জমে, এমনকী রক্তশূন্যতাও দেখা দিতে পারে। পেট ফুলে যায়। মলের সাথে ভাতের মতো দেখতে কৃমির টুকরো অংশ বের হয়ে আসে।

অ্যাসকারিয়াসিস (Ascariasis)

অ্যাসকারিয়াসিস *Ascaris* বা কেঁচোকৃমিজনিত রোগ। বাচ্চা মাত্রগভৰে এ কৃমি প্লারা আক্রান্ত হয়। বাচ্চায় এ রোগের লক্ষণ একমাস বয়সের পূর্বে দেখা দেয়। ক্ষুদ্রামন্দা, ওজন কমে যাওয়া এবং পাতলা পায়খানা এ রোগের প্রাথমিক লক্ষণ। ক্ষুদ্রান্ত বন্ধ হওয়ার কারণে বাচ্চুর ভীষণ পেট ব্যাথায় পিঠ উঁচু করে ডাকতে থাকে। নিঃশ্বাসে টক গন্ধ বের হয়। এ রোগে ৭০% মহিষ বাচ্চুর এবং ৩০% গরুর বাচ্চুর বিনা চিকিৎসায় মারা যেতে পারে।

প্যারাসাইটিক গ্যাস্ট্রো-এন্টারাইটিস (Parasitic Gastro-enteritis or P.G.E.)

পরজীবীজনিত গ্যাস্ট্রো-এন্টারাইটিস রোগে আক্রান্ত পশুর পাতলা পায়খানা, রক্তকুন্যতা, ক্ষুধামন্দা হয় এবং স্বাভাবিক বৃদ্ধি বিঘ্নিত হয়।

গবাদিপশুর পাকস্থলীর চতুর্থ প্রকোষ্ঠ অর্থাৎ অ্যাবোমেসামে *Haemonchus*, *Mecistocerus*, *Ostertagia*, *Trichostrongylus* ইত্যাদি গণের বিভিন্ন প্রজাতির গোলকৃমি গ্লারা যে উদারাময়ের সৃষ্টি হয় তাকে পরজীবীজনিত বা প্যারাসাইটিক গ্যাস্ট্রো-এন্টারাইটিস বলে। এ রোগ ১-৪ বছর বয়সের গবাদিপশুতে বেশি হয়।

এ রোগে পশুর অন্তে বিভিন্ন খাদ্য উপাদান শোষণে ব্যাঘাত সৃষ্টি হওয়ায় এবং কৃমি রক্ত শোষণ করায় পশু অপুষ্টিতে ভোগে। ফলে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়। ডায়ারিয়ার কারণে দেহে পানিশূন্যতার সৃষ্টি হয়। ক্ষুধামন্দার কারণে খাদ্যে অর্ণচি হয় বলে দেহের বৃদ্ধি হ্রাস পায়। দুধ উৎপাদন কমে যায়। অনেক সময় কালো দুর্গন্ধযুক্ত মলত্যাগ করে। শরীরের ওজন কমে যায়। সাধারণত কচি ঘাস খাওয়া শুরু করার ৭-১৫ দিনের মধ্যে বা ১-২ মাস পর এ রকম ডায়ারিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব হয়।

হুকওয়ার্ম ডিজিজ (Bunostomiasis)

হুকওয়ার্ম রোগে আক্রান্ত পশুতে ক্রমবর্ধমান রক্তকুন্যতা, পাতলা পায়খানা ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে পানি জমে।

Bunostomum গণের কৃমি গবাদিপশুর ক্ষুদ্রাত্মে অবস্থান করে রক্ত শোষণ করে। আক্রান্ত পশুর রক্তশূন্যতা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। অল্লব্যক্ষ গবাদিপশুর পিছনের পা দুর্বল বা অবশ হয়ে যায়। স্বাভাবিক দৈহিক বৃদ্ধি লোপ পায়। ওজন কমতে থাকে। মাঝে মাঝে পাতলা পায়খানা করে এবং শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে পানি জমে।

হাম্পসোর (Humpsore)

হাম্পসোরে শরীরের যে কোনো স্থানের চামড়ায় ঘা হবে যা সর্বদা চুলকাবে এবং শীতে শুকাবে ও গরমের সময় বাড়বে।

পূর্ণবয়স্ক গরুর চামড়ার ক্ষত *Stephanofilaria* গণের পরজীবী গ্লারা আক্রান্ত হলে এ ক্ষতকে হাম্পসোর বা চুটে ঘা বলা হয়। শরীরের চামড়ার যে কোনো অংশের ক্ষতে এ পরজীবীর সংক্রমণ হতে পারে। তবে, চুটের আশেপাশে বেশি হয় তাই এর নাম হাম্পসোর। ঘা ১ সে.মি. থেকে ৮ সে.মি. পরিধি নিয়ে হতে পারে। গরু যে কোনো শক্ত খুঁটি বা গাছের সঙ্গে ঘা ঘষতে থাকে। কারণ ঘা সব সময় চুলকায়। এ ঘা গরমের সময় বেশি চুলকায় এবং শীতের সময় চটা ধরে। ঘা চুলকানোর কারণে হালটানার কাজে ব্যাঘাত ঘটে। ঠিকমতো খাদ্য গ্রহণ করে না। শরীর দিন দিন শুকিয়ে যায়। ওজন কমতে থাকে। গাভীর দুধ উৎপাদন কমে যায়।

পরজীবীজনিত রোগের প্রতিরোধ

প্রকোপ বৃদ্ধির কারণ

বিদেশী উন্নত জাত ও পুষ্টিহীন গবাদিপশু কৃমিরোগে বেশি আক্রান্ত হয়।

জাত ও পুষ্টি ৪ কৃমি রোগের প্রকোপ দেশী জাতের চেয়ে বিদেশী উন্নত জাতের গবাদিপশুতে বেশি। কারণ, উন্নত জাতের গবাদিপশু এদেশের পরিবেশে ও আবহাওয়ার সঙ্গে বেশি পরিচিত না এবং এরা অল্লদিন ধরে এখানকার রোগব্যাধির সংস্পর্শে এসেছে। সুতরাং বিদেশী উন্নত জাতের গবাদিপশুতে যে কোনো রোগবালাইয়ের প্রকোপ তুলনামূলক হারে বেশি। পুষ্টিহীন গবাদিপশুর রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কম এবং যত্রত্র চরে খায় বলে কৃমিরোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। দেশী গাভী থেকে কৃত্রিম প্রজননের ফলে উন্নত উন্নত জাতের বাছুর প্রয়োজনীয় পরিমাণ মায়ের দুধ পায় না। ফলে ক্ষুধা নিবারণের জন্য অল্ল বয়সেই ঘাস লতাপাতার জন্য বিচরণ করে এবং স্টমাকওয়ার্ম ও হুকওয়ার্ম গ্লারা আক্রান্ত হয়।

আবহাওয়া : আমাদের দেশের অনুকূল তাপমাত্রা, আপেক্ষিক আর্দ্রতা, ভূ-প্রকৃতি কৃমির দ্রুত বংশবিস্তারে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কৃমির জীবনচক্র এ পরিবেশে সহজেই দ্রুত শেষ হয়। কৃমির ডিম বা লার্ভা বহুদিন যাবত ঘাসের ডগায়, মাটিতে, গোবরে, কীটপতঙ্গে, এমনকী পানিতেও, অবস্থান করতে সক্ষম। আবার চারণভূমিতে পরিমাণের তুলনায় অধিক পরিমাণ গবাদিপশু বিচরণের ফলে সেখানে কৃমির লার্ভা বা ডিমের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। এ ধরনের মাঠে গবাদিপশু অল্ল সময় ঘাস খেয়েও অধিক পরিমাণ কৃমির লার্ভা গ্লারা আক্রান্ত হয়। দেশের নিম্নাঞ্চলের গবাদিপশুতে কৃমি আক্রমণের হার উচ্চ সমতলভূমির গবাদিপশুর তুলনায় বেশি।

এদেশের আবহাওয়া কৃমির বংশবিস্তারের জন্য অনুকূল। নিম্নাঞ্চলে কৃমি আক্রান্তের হার অধিক।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বন্যার পর নতুন জেগে উঠা ঘাস খাওয়ালে গবাদিপশু কৃমিতে বেশি আক্রান্ত হয়।

উন্নত জাতের বাচ্চুকে সময়মতো কৃমির চিকিৎসা দিলে মৃত হার কমে যায়।

পরিবেশ কৃমির লার্ভামুক রেখে এবং আক্রান্ত পশুর চিকিৎসা করে রোগের প্রকোপ কমানো সম্ভব।

লার্ভামূর্ণ মাঠে বয়ক্ষ এবং লার্ভামুক মাঠে বাচ্চুর আগে ছেড়ে কৃমির প্রকোপ কমানো যায়।

সকালবিকেলে পশু মাঠে না ছাড়লে এবং ঘাস কেটে শুকিয়ে খাওয়ালে কৃমির প্রকোপ কমে।

একইহানে পশুকে বেশিদিন ঘাস খাওয়ালে কৃমির প্রকোপ বাঢ়ে।

আক্রান্ত পশুকে রোগমুক্ত ও চারণভূমি লার্ভামুক রাখার জন্য কৃমির চিকিৎসা করতে হয়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন— খরা, অতিবৃষ্টি, বন্যা, জলোচ্ছাসের সময় খাদ্যাভাব হয়। ফলে গবাদিপশু অপুষ্টিতে ভোগার জন্য সহজেই কৃমি গ্লারা আক্রান্ত হয়। বন্যার পর সদ্য জেগে উঠা ঘাসের ডগায় কৃমির লার্ভা লেগে থাকে। এ ঘাস খাওয়ালে গবাদিপশুর কৃমিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। নতুন গজানো ঘাসে ফাইটো-হরমোনের পরিমাণ বেশি থাকার কারণে গবাদিপশুর অন্তের সুপ্ত লার্ভা প্রাচীর ভেদ করে বের হয় যা কার্তিক-অগ্রাহায়ণ মাসে পরজীবীজনিত পাচণতন্ত্রের প্রদাহ বা Parasitic Gastro-enteritis সৃষ্টি করে। অল্প বয়স্ক গবাদিপশু এ রোগে বেশি মারা যায়। গবাদিপশু যে কোনো কৃমিরোগে হেমেত্রিকালে ও বর্ষার শুরুতে বেশি আক্রান্ত হয়।

আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট : দেশের জনসাধারণের আর্থসামাজিক অবস্থার সাথে কৃমি সমস্যা জড়িত। একজন শিক্ষিত মানুষ পশু পালনের ক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করে উন্নত পদ্ধতিতে গবাদিপশুর খামার করে কৃমি দমন করতে পারেন। অথচ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন খামারির কাছে নতুন প্রযুক্তির অনুপ্রবেশ ঘটানো দুরহ কাজ। এক সময় দেশের কৃষকদের মধ্যে ধারণা ছিল যে, উন্নত জাতের বাচ্চুর বাঁচে না। ধারণাটি সম্প্রসারণ কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আজ অসত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

রোগ দমন কৌশল

কৃমিরোগ দমন অর্থ রোগ নির্মুল করা নয়। রোগ দমনের উদ্দেশ্য হচ্ছে গবাদিপশুর মধ্যে রোগের প্রকোপ কমানো এবং পরিবেশকে কৃমির লার্ভামুক রাখা ও গবাদিপশুকে লার্ভামুক পরিবেশ থেকে দূরে রাখা। গবাদিপশুকে সাধারণত তিনভাবে কৃমির আক্রমণ পরিহার করে পালন করা সম্ভব। যথা— ক. চারণভূমি বা আবাসস্থল কৃমির লার্ভামুক রেখে, খ. কৃমির লার্ভামুক পরিবেশে গবাদিপশু পালন করে এবং গ. কৃমিবাহক গবাদিপশুর চিকিৎসার মাধ্যমে।

ক. আক্রমণের পূর্বে কৃমির লার্ভা মাঠের ঘাস, পানি, কেঁচো, কীটপতঙ্গ বা মুক্তাবস্থায় বিরাজ করে। খাদ্যের সাথে বা শরীরের চামড়া ভেদ করে এ লার্ভা গবাদিপশুকে আক্রমণ করে। এ আক্রমণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিহার করা সম্ভব। স্বাস্থ্যবান গবাদিপশুর রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি এবং গ্রহণ করা কৃমির লার্ভা ধ্বংস করতে সক্ষম। কারণ, বয়ক্ষ গরুর রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাচ্চুরের চেয়ে বেশি। আবার কৃমিমুক্ত চারণভূমিতে আগে অল্পবয়ক বাচ্চুর গরু ছাড়তে হয়। এর ফলে চারণভূমিও আপাতত লার্ভামুক থাকে।

খ. কৃমির লার্ভা সকাল ও পড়স্ত বিকেলে ঘাসের ডগায় বেশি থাকে বলে এসময় গরুছাগল মাঠে না চরালে রোগের প্রকোপ কমে যায়। নিচু জলাভূমিতে গোবর ধোয়া পানির জন্য ভালো ঘাস হয়। এসব স্থানের ঘাসে কৃমির লার্ভাও বেশি থাকে বলে এ ঘাস কেটে শুকিয়ে খাওয়াতে হয়।

গ. একস্থানে গরুছাগলকে অনেকদিন ধরে ঘাস খাওয়ালে এখানে ঘাস কমে যাওয়ার কারণে এরা মাটিসহ ঘাস খায়। এর ফলে মাটিতে অবস্থিত লার্ভা থেয়ে ফেলে এবং গবাদিপশুর কৃমির প্রকোপে বেড়ে যায়। কৃমিনাশক গ্লারা চিকিৎসা পর সেখানে গরুছাগল ছাড়লে নতুন চারণভূমি লার্ভামুক রাখা সম্ভব।

অন্তঃপরজীবীজনিত রোগের চিকিৎসা

অন্তঃপরজীবীজনিত রোগে আক্রান্ত পশুর নিয়মিত চিকিৎসা করে রোগ দমন করাই উত্তম। দুটো উদ্দেশ্য নিয়ে কৃমি আক্রান্ত গবাদিপশুর চিকিৎসা করা হয়। যথা— ক. গবাদিপশু রোগমুক্ত করা ও খ. চারণভূমি কৃমির লার্ভামুক রাখা। চিকিৎসা একটি ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। উপরোক্ত উদ্দেশ্যে কৃমিনাশক প্রয়োগ করলে ওয়ুধ খরচও কম হয়।

কৃমি দমনের জন্য দুধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। ক. কৌশলগত ও খ. তাৎক্ষণিক পরিবর্তনগত। দেশের স্বাভাবিক আবহাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কৌশলগত চিকিৎসা সারাবছরের জন্য একটি কৃমি দমন পদ্ধতি। এ ব্যবস্থা ঝুতু পরিবর্তনের সাথে কৃমিরোগের প্রকোপের হার পরিবর্তনের ওপর নির্ভরশীল এবং একটি দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা। তাৎক্ষণিক চিকিৎসা ব্যবস্থা দেশের

অস্থাভাবিক আবহাওয়া পরিবর্তনের ওপর নির্ভরশীল। কৃমি দমনের পরিকল্পনা কৃমির প্রজাতি, আক্রান্ত পশুর সংখ্যা, জাত ও বয়স, আবহাওয়ার পরিবর্তন, কৃমিনাশক ওষুধের শ্রেণী, কার্যকারিতা, মাত্রা ও প্রয়োগ সংখ্যা, কৌশলগত বা তাৎক্ষণিক প্রয়োগ সবকিছুকে বিবেচনায় রেখে তবেই গ্রহণ করতে হয়। এখানে গবাদিপশুতে প্রয়োগ করা যায় এমনকিছু কৃমিনাশক ও তার সেবন/প্রয়োগবিধি দেয়া হয়েছে।

গবাদিপশুর কৃমিনাশক

নিম্নের যে কোনো একটি কৃমিনাশক নির্ধারিত মাত্রায় গবাদিপশুতে ব্যবহার করে কৃমির চিকিৎসা করা যায়। যেমন—

ফ্যাসওলিয়াসিসের চিকিৎসা—

- ক. Triclabendazole (ট্রাইক্লাবেনডাজল) : ১০ মিলিগ্রাম/কেজি দৈহিক ওজনের জন্য।
- খ. Nitroxynil (নাইট্রোক্সিনিল) : ১৫ মিলিগ্রাম/কেজি দৈহিক ওজনের জন্য।

প্যারাফিস্টোমিয়াসিসের চিকিৎসা—

- ক. Niclosamide (নিক্লোসেমাইড) : ১৫০ মিলিগ্রাম/কেজি দৈহিক ওজনের জন্য।
- খ. Oxcyclozanide (অক্সিক্লোজানাইড) : ১৫–২০ মিলিগ্রাম/কেজি দৈহিক ওজনের জন্য।

সিস্টোমিয়াসিসের চিকিৎসা—

- ক. Prazequentel (প্রাজিকুরোনটেল) : ২৫ মিলিগ্রাম/কেজি দৈহিক ওজনের জন্য। ৩–৫ সপ্তাহ পর একইভাবে পুনঃচিকিৎসা করা প্রয়োজন হয়।

গোলকৃমির চিকিৎসা—

- ক. পাইপারজিন সাইট্রেট/এডিপেট : ২০০ মিলিগ্রাম/কেজি দৈহিক ওজনের জন্য।
- খ. ফেনবেনুডাজল : ৫–৭ মিলিগ্রাম/কেজি দৈহিক ওজনের জন্য।
- গ. লেভামিজল হাইড্রোক্লোরাইড : ৭–৮ মিলিগ্রাম/কেজি দৈহিক ওজনের জন্য।

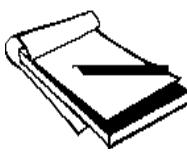
হাম্পসোরের চিকিৎসা—

- ক. ট্রাইকোফেন ও সালফানিলামাইড দিয়ে তৈরি মলম।
- খ. লেভামিজল হাইড্রোক্লোরাইড মলম।

মনিজিয়াসিসের চিকিৎসা—

- ক. লেড অর্সিনেট : ২০–২৫ মিলিগ্রাম/কেজি দৈহিক ওজনের জন্য।
- খ. নিক্লোসেমাইড : ৫০–৭৫ মিলিগ্রাম/কেজি দৈহিক ওজনের জন্য।

অনুশীলন (Activity) : অন্তঃ পরজীবী কীভাবে আর্থিক ক্ষতি করে বলে আপনি মনে করেন? এ ক্ষতি দূর করার কোনো উপায় জানা থাকলে তা আলোচনা করন।



সারমর্ম : কৃমি বাংলাদেশের আবহাওয়ায় দ্রুত বংশবিস্তার করে। দেশের অধিকাংশ গবাদিপশু কৃমিতে আক্রান্ত। গোলকৃমি এবং পাতাকৃমি বেশি ক্ষতিকারক। কৃমি আক্রান্ত হলে দুধ, মাংস উৎপাদন, কর্ষণ শক্তি এবং চামড়ার মূল্য ও মান উভয়ই কমে যায়। রক্তশূণ্যতা, রক্তক্ষরণ, অস্তনালি বন্ধ হয়ে যাওয়া, শ্বাসপ্রশ্বাসে বিঘ্ন ঘটা, পাতলা পায়খানা কৃমি আক্রমণের প্রধান প্রধান লক্ষণ। প্যারাফিস্টোমিয়াসিস, ফ্যাসওলিয়াসিস, সিস্টোমিয়াসিস, মনিজিয়াসিস, অ্যাসকারিয়াসিস, Parasitic Gastro-enteritis, বুনোস্টোমিয়াসিস, হাম্পসোর গবাদিপশুর বিশেষ বিশেষ পরজীবীজনিত রোগ। পরজীবীজনিত রোগের প্রকোপ পশুর জাত, পুষ্টিমান, দেশের আবহাওয়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আর্থসামাজিক অবস্থা ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল। কৃমি দমনের উদ্দেশ্যে কৃমির প্রজাতি, আক্রান্ত পশুর সংখ্যা, জাত, বয়স, কৃমিনাশকের কার্যকারিতা, কৌশলগত বা তাৎক্ষণিক প্রয়োগ সবকিছুকে বিবেচনায় রেখে কৃমিনাশক প্রয়োগ করতে হয়।



পাঠ্যতর মূল্যায়ন ৪.২

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. অন্তঃ পরজীবী সামগ্রিকভাবে কী ক্ষতি করে?

- i) দুধ, মাংস উৎপাদনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে
- ii) যকৃতে রক্তক্ষরণ ঘটায়
- iii) আক্রান্ত পশুর মল পরিবেশ দূষণ করে
- iv) দুধ ও মাংস উৎপাদন, জমিকর্ষণ ও পরিবহণ শক্তি এবং চামড়ার দাম কমিয়ে দেয়

খ. প্রায় সব কৃমি রোগে যে দুটো প্রধান লক্ষণ দেখা যায় তা কী?

- i) রক্তশূন্যতা ও ডায়ারিয়া
- ii) দুধ ও ওজন কমে যাওয়া
- iii) রক্তশূন্যতা ও ওজন কমে যাওয়া
- iv) দুর্বল হয়ে যাওয়া ও চামড়ায় ক্ষতের সৃষ্টি হওয়া

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. কৃমি আক্রান্ত একটি গাভীর দৈনিক প্রায় ০.৫ লিটার দুধ কমে যেতে পারে।

খ. একই স্থানে অনেকদিন গবাদিপশুকে ঘাস খাওয়ালে কৃমি নির্মূল হয়।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. কৃমি আক্রান্ত হলে গরুমহিষের দুধ ও মাংস উৎপাদন এবং _____ হাস পায়।

খ. গোলকৃমির লার্ভা সকাল ও পড়স্ত বিকেলে _____ ডগায় বেশি থাকে।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. গবাদিপশুকে সাধারণত কতভাবে কৃমির আক্রমণ পরিহার করে পালন করা সম্ভব?

খ. কয়টি উদ্দেশ্য নিয়ে কৃমি আক্রান্ত গবাদিপশুর চিকিৎসা করা হয়?

পাঠ ৪.৩ গবাদিপশুর সাধারণ বহিঃপরজীবীর পরিচিতি



এ পাঠ শেষে আপনি –

- বহিঃপরজীবী কী তা বলতে পারবেন।
- বহিঃপরজীবী শণাক্ত করতে পারবেন।
- বহিঃপরজীবীর জীবনচক্র বর্ণনা করতে পারবেন।



উকুন, মাছি, আটালি
বহিঃপরজীবী। এদের থারা
বিভিন্ন রোগ সংঘটিত
হয়ে গবাদিপশুর উৎপাদন ও চাষের
শক্তিহাস পায়।

সন্ধিপদ বর্গের দুটো শ্রেণী
ইনসেক্টা ও অ্যারাকনিড।
ইনসেক্টার শরীর মাথা, বুক ও
পেট এ তিনভাগে বিভক্ত। এরা
ছয় পারিশিষ্ট। আটালির
শরীরকে এ ভাবে ভাগ করা যায়
না, তবে এরা আট পারিশিষ্ট।

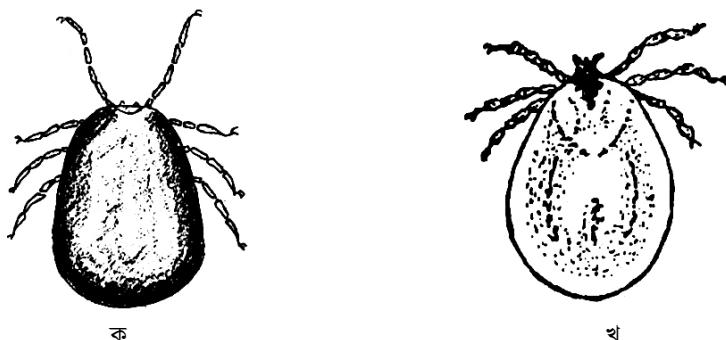
বহিঃপরজীবী

উকুন, মাইট, ফ্লি, আটালি ইত্যাদি গবাদিপশুর বহিঃ পরজীবী। এরা পোষকের বহিঃদেহে সার্বক্ষণিক
বা সাময়িক অবস্থান করে রক্ত, রক্তরস, মরা কোষ ইত্যাদি খেয়ে জীবনধারণ ও বংশবিস্তার করে।
আটালি, উকুন, মশা, মাছি রক্ত শোষণ করে। একটি স্ত্রী আটালি এর দেহের ওজনের প্রায় ১০০ গুণ
পরিমাণ রক্ত পান করে। এছাড়া এরা রক্তপ্রসাব (বেবেসিওসিস), থাইলেরিওসিস, ঘাম রোগ,
প্যারালাইসিস, ট্রিপ্যালোসোমিয়াসিস, মায়াসিস সংঘটনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। বহিঃ পরজীবী আক্রমণের
কারণে খাদ্য গ্রহণ করে যায়। এতে করে দুধ উৎপাদন ও দেহের ওজন করে যায়। হালচামের শক্তি
হ্রাস পায়। বহিঃ পরজীবী দমনের জন্য সমন্বিত বালাই দমন পদ্ধতি অবলম্বন করলে পরিবেশের
ভারসাম্য নষ্ট হয় না।

সকল কীটপতঙ্গের পা জোড়া বিধায় এদেরকে সন্ধিপদ (Arthropoda) বর্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিপদ পতঙ্গকে আবার দুটো শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। ক. ইনসেক্টা (Insecta) ও খ.
অ্যারাকনিডা (Arachnida)। ইনসেক্টার শরীর মাথা, বুক ও পেট এ তিনভাগে বিভক্ত। এরা ছয়
পারিশিষ্ট এবং এদের দুটো করে যৌগিক চোখ ও অ্যানটেনা আছে। যেমন— মাছি, উকুন, মশা
ইত্যাদি। অ্যারাকনিডা সাধারণত আট পারিশিষ্ট এবং এদের কোনো অ্যানটেনা নেই, অধিকাংশ ক্ষেত্রে
দুটো সাধারণ চোখ থাকে, যেমন— আটালি বা টিক (Tick), মাইট (Mite) ইত্যাদি। অ্যারাকনিডার
গুরুত্ববহুলকারী বর্গকে অ্যাকারিনা (Acarina) বলে। অ্যাকারিনার চারটি উপবর্গ (Sub-order),
যথা— ক. মেসোস্টিগমেটা (Mesostigmata), খ. ইক্সোডিডি (Ixodidae), গ. ট্রমবিডিফরমেস
(Trombidiformes) ও ঘ. সারকপাটিফরমেস (Sarcophagidae) পশুসম্পদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ
ক্ষতিকর বহিঃপরজীবীসমূহের অন্যতম।

আটালি (Tick)

আটালিকে সাধারণভাবে নরম আটালি (Soft Tick) ও শক্ত আটালি (Hard Tick) এ দুভাগে ভাগ
করা হয়েছে। শুধু শক্ত আটালি (Ixodidae) গবাদিপশুর বহিঃপরজীবী। আটালির উপরের শক্ত
আবরণকে (Chitinous Shield) স্কুটাম (Scutum) বলে। আটালির শরীর কেপিচুলাম
(Capitulum) ও ইডিওসম (Ediosom) এ দুভাগে বিভক্ত। কেপিচুলামে চেলিসেরি, পেডিপাতা
ও হাইপোস্টেম (Hypostom) উপাঙ্গগুলো মিলে এর রক্ত শোষণের ক্ষমতাসম্পন্ন মুখ তৈরি
হয়েছে।



চিত্র ৩৬ (ক, খ) : দুটো ভিন্ন প্রজাতির আটালি

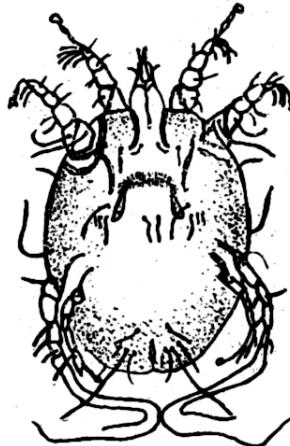
আটালি রক্ত পান শেষে ডিম দেয়। ডিম থেকে বাচ্চা/লার্ভা ফুটে রূপান্তরের মাধ্যমে নিষ্ফ ও পূর্ণবয়স্ক হয়। লার্ভা, নিষ্ফ রক্ত পান করার পর রূপান্তরিত হয়।

সারকপটিক ও ডেমোডেক্টিক মাইট আটালির মতোই ডিম থেকে লার্ভা, নিষ্ফ ও প্রাণ্বয়স্ক হয়ে সারাজীবন গবাদিপশুর শরীরে পরজীবী হয়ে থাকে।

প্রায় সব আটালি রক্ত পান শেষে গর্তে, পাতার আড়ালে, খাঁচায় কিংবা ঝোপঝাড়ে ডিম দেয়ার জন্য আশ্রয় নেয়। ডিম দেয়া শেষে সাধারণত এরা মারা যায়। ডিম থেকে বাচ্চা বা লার্ভা বের হয়ে ঘাসের ডগায় আশ্রয় নেয় এবং নির্দিষ্ট পোষকের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। মশামাছির অ্যানটেনার মতো দেখতে সেনসিলার (Sensilla) সাহায্যে এরা নির্দিষ্ট পোষক বেছে নেয়। পশুর শরীরে লার্ভার রূপান্তর একডাইসিস (Ecdysis) বা মেটামরফোসিসের (Metamorphosis) মাধ্যমে নিষ্ফ (Nymph) হয়ে পূর্ণবয়স্ক আটালিতে পরিণত হয়। বাচ্চা, নিষ্ফ ও পূর্ণবয়স্ক আটালি পশুর দেহ হতে রক্ত পান করে পরবর্তী স্তরে পরিবর্তিত হয়।

মাইট

ট্রিমিডিফরমেস ও সারকপটিফরমেস উপবর্গের মধ্যে *Demodex* (ডেমোডেক্স) ও *Sarcoptes* (সারকপটেস) গণের বিভিন্ন মাইট গবাদিপশুর স্বাস্থ্যহানির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ডেমোডেক্টিক (Demodectic) মাইট দেখতে কৃমির মতো, প্রায় ০.২৫ মি.মি. লম্বা এবং শরীর আড়াআড়ি খাঁজকাটা (Transversely Striated)। এদের শরীর তিনভাগে বিভক্ত যথা— মাথা, বুক ও পেট। বুকের তলদেশে ৪ জোড়া বেটে পা আছে। এ মাইট চুলের মূলে (Hair Follicle) ও ঘম্ম গ্রন্থির (Sebaceous Gland) ভিতরে অবস্থান করে ও ডিম দেয় এবং এখানেই ডিম থেকে লার্ভা ও লার্ভা থেকে নিষ্ফ হয়ে পূর্ণবয়স্ক হয় ও পরবর্তীতে ডিম দেয়। জীবনচক্র শেষ করতে মাত্র ১৮–২৪ দিন সময়ের প্রয়োজন হয়। পোষকের নামানুসারে বিভিন্ন মাইটের প্রজাতির নামকরণ করা হয়েছে। যেমন— গরুর *Demodex bovis* (ডেমোডেক্স বত্স), ছাগলের *Demodex caprae* (ডেমোডেক্স কেপরি) ইত্যাদি। সারকোপটিক মাইট দেখতে গোল। শরীরে খুঁটির মতো পেগ (Peg) ও কঁটার ন্যায় স্পাইক (Spike) আছে। পুরুষের খাটো খাটো পায়ের ১ম, ২য় ও ৪র্থ জোড়ার আগায় ঘন্টার মতো দেখতে সাকার/ক্যারাক্সল (Sucker/Carancle) আছে। স্ত্রী মাইটের ১ম ও ২য় জোড়া পায়ের আগায় সাকার আছে।



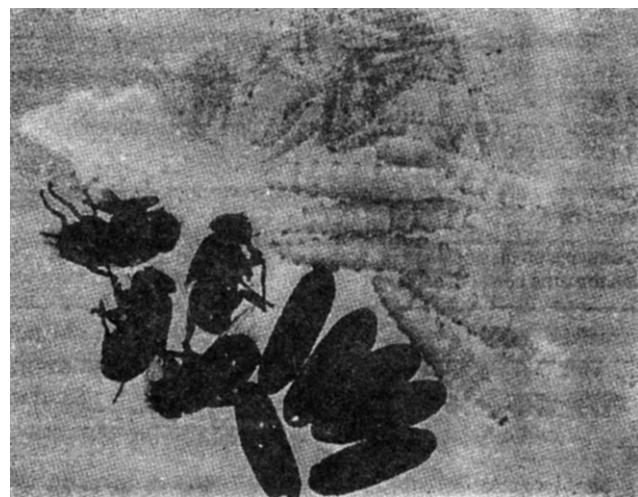
চিত্র ৩৭ : একটি মাইট

মাছি ও উকুন

Insecta (ইনসেক্টা) শ্রেণীকে পাখাবিশিষ্ট টেরিগোটা (Pterygota) এবং পাখাছাড়া এটেরিগোটা (Apterygota) এ দুটো উপশ্রেণীতে (Sub-class) ভাগ করা হয়েছে। টেরিগোটার যেসব পতঙ্গ অপূর্ণস (Bud) পাখা এবং বাচ্চা দেখতে বয়স্কদের মতো, যেমন— উকুন এদেরকে Exopterygota (এক্সোটেরিগোটা) বলে। আর যেসব টেরিগোটার পূর্ণস পাখা আছে এবং বাচ্চার রূপান্তর (Metamorphosis) স্পষ্ট, যেমন— মাছি, এদেরকে Endopterygota (এন্ডোটেরিগোটা) বলে। মাছি ডিপটেরা (Diptera) বর্গের অন্তর্ভুক্ত। ইনসেক্টা শ্রেণীর মধ্যে ডিপটোর বর্গের মাছি ও অ্যানোপুরা (Anoplura) বর্গের উকুন গবাদিপশুর বহিঃপরজীবী।

ডিপটোর বর্গের মাছির ডিম থেকে বেড়িয়ে আসা মেগট রূপান্তরের মাধ্যমে পূর্ণস মাছিতে পরিণত হয়।

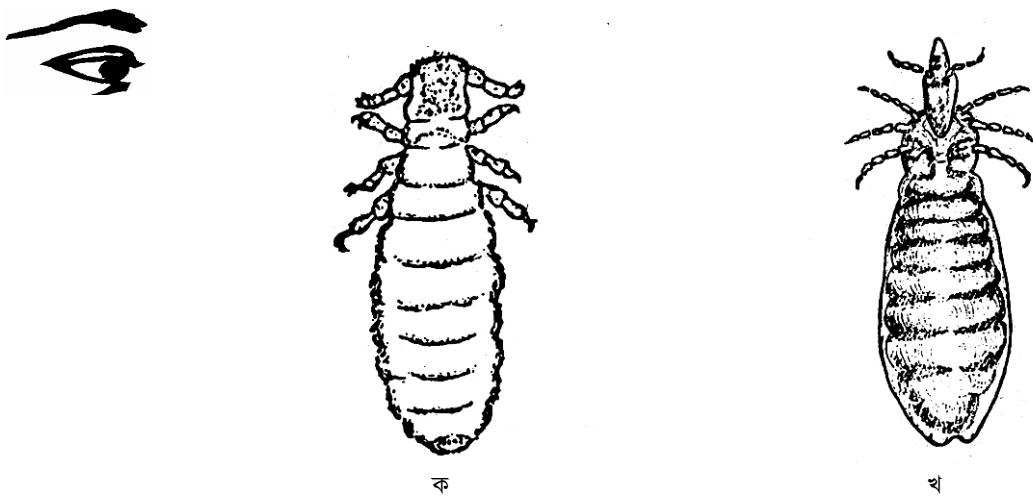
অ্যানোপুরা বর্গের উকুন পোষকের শরীরে ডিম দেয় ও ডিম থেকে নিষ্ফ বেড়িয়ে এসে রূপান্তরের মাধ্যমে পূর্ণস উকুন হয়।



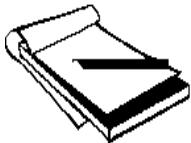
চিত্র ৩৮ : *Chrysomya* গণের মাছির ডিম, লার্ভা ও পূর্ণাঙ্গ অবস্থা

Chrysomya (ক্রাইসোমিয়া), *Oestrus* (ইস্ট্রাস) প্রজাতির মাছি Myiasis (মায়াসিস) এবং *Tabanus* (ট্যাবানাস) গণের মাছি রক্ত শোষণ করে ও রোগবিস্তারে সাহায্য করে। *Chrysomya* ও *Oestrus* গণের বিভিন্ন মাছি গবাদিপশুর ঘায়ে ডিম দেয়। মাছির ডিম ফুটে যে লার্ভা বের হয় তাকে Maggot (মেগট) বলে। পশুর দেহের ক্ষতে ডিম দিলে তা থেকে Maggot হয় এবং এরা রক্ত, কোষ ইত্যাদি খেয়ে বৃদ্ধি পেয়ে L₃ তে রূপান্তরিত হয়ে পরে পিউপাতে (Pupa) পরিণত হওয়ার জন্য মাটিতে পড়ে। পিউপা থেকে পূর্ণাঙ্গ মাছি বের হয়। *Tabanus* গণের মাছি জলাশয়ের কিনারায় গাছের পাতার উপর ডিম দেয়। ৪-৭ দিনের মধ্যে ডিম থেকে Maggot বের হয়ে কাদার মধ্যে লুকিয়ে থাকে। এ Maggot জলজ কীটপতঙ্গ খেয়ে বৃদ্ধি পায়। সাধারণত জীবনচক্র শেষ হতে ৫ থেকে ৬ মাস সময় লাগে। বিভিন্ন মাছির জীবনচক্র সম্পূর্ণ হওয়ার সময় আবহাওয়া ও প্রজাতি নির্ভর। নানা প্রজাতির ফড়িং (Dragon Fly) মাছির ডিম খেয়ে মাছির সংখ্যা সীমিত করে দেয়।

গবাদিপশুর চোষক উকুন (Sucking Lice) *Haematopinus eurysternus* (হেমাটোপিনাস ইউরিস্টারনাস) ও *Linognathus vituli* (লিনোগন্যাথাস ভিটুলি) প্রজাতির উকুন গরুর শরীরে অবস্থান করে। পূর্ণবয়স্ক উকুন চুলের গোড়ায় ডিম দেয়। ডিম থেকে নিফ (Nymph) এবং নিফ তিনবার রূপান্তরের মাধ্যমে পূর্ণবয়স্ক উকুনে পরিণত হয়। নির্দিষ্ট প্রজাতির উকুন নির্দিষ্ট পোষককে আক্রমণ করে।



চিত্র ৩৯ (ক, খ) : দুটো ভিন্ন প্রজাতির উকুন



অনুশীলন (Activity) : বিভিন্ন ধরনের বহিঃপরজীবীর বৈজ্ঞানিক নামের একটি তালিকা তৈরি করুন।



সারমর্ম : আটালি, উকুন, মাছি বহিঃপরজীবী। এদের গ্লারা বিভিন্ন রোগ সংঘটিত হয়ে গবাদিপশুর উৎপাদন ও চামের শক্তি হ্রাস পায়। সারকপটিক ও ডেমোডেটিক মাইট আটালির মতোই ডিম থেকে লার্ভা, নিষ্ক ও প্রাণ্পৰ্যক্ষ হয়। ডিপটেরো বর্গের মাছির ডিম থেকে বেড়িয়ে আসা মেগট মেটামরফোসিসের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ মাছিতে রূপান্তরিত হয়। অ্যানোপুরা বর্গের উকুন পোষকের শরীরে ডিম দেয় এবং ডিম থেকে পূর্ণাঙ্গ উকুনের ন্যায় দেখতে নিষ্ক বেড়িয়ে এসে রূপান্তরের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ উকুনে পরিণত হয়।



পাঠ্যেভূত মূল্যায়ন ৪.৩

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. ইনসেস্টার শরীর কয় ভাগে বিভক্ত?

- i) ৫ ভাগে
- ii) ৪ ভাগে
- iii) ৩ ভাগে
- iv) ২ ভাগে

খ. অ্যারাকনিডার কয়টি পা আছে?

- i) ৬টি
- ii) ৮টি
- iii) ১০টি
- iv) ৮টি

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. মাইটের জীবনচক্র শেষ করতে ১৮–২৪ দিন সময় লাগে।

খ. *Oestrus* গণের মাছির মেগট জলজ কীটপতঙ্গ ভক্ষণ করে।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. _____ গণের মাছি জলাশয়ের কিনারায় গাছের পাতার উপর ডিম দেয়।

খ. ইনসেস্টা শ্রেণীর মধ্যে _____ বর্গের মাছি ও *Anoplura* বর্গের উকুন গবাদিপশুর বহিঃপরজীবী।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. আটালির ডিম থেকে বাচ্চা বের হয়ে ঘাসের ডগায় কেন অপেক্ষা করে?

খ. মাছির ডিম ফুটে যে লার্ভা বের হয় তাকে কী বলে?

পাঠ ৪.৪ গবাদিপশুর সাধারণ বহিঃপরজীবীজনিত রোগ



এ পাঠ শেষে আপনি –

- বহিঃপরজীবী কর্তৃক সৃষ্টি অপকারিতা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বহিঃপরজীবী কর্তৃক আক্রান্ত পশুর লক্ষণ শণাক্ত করতে পারবেন।
- বহিঃপরজীবীজনিত রোগের চিকিৎসা ও প্রতিরোধ বর্ণনা করতে পারবেন।



আটালি কর্তৃক সৃষ্টি অপকারিতা

আটালির কারণে সৃষ্টি রোগকে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা— ক. আটালিজনিত ও খ. আটালিবাহিত রোগ।

ক. আটালিজনিত রোগ

আটালির লালার সঙ্গে নিঃসৃত বিষ (Toxin) প্লারা বিষক্রিয়ার ফলে গবাদিপশুতে দুধরনের উপসর্গের সৃষ্টি হয়। যথা— ১. আটালিসংক্রান্ত অবশতা (Tick Paralysis) এবং ২. ঘাম রোগ (Sweating Sickness)। *Miae*, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি আটালিজনিত রোগে আক্রান্ত হয়।

১. আটালিসংক্রান্ত অবশতা : বিষধর সাপের বিষগুষ্ঠির কোষের সাথে আটালির লালাথুরির কোষগুলোর সাদৃশ্য আছে। রক্ত শোষণের সময় লালার সাথে বিষ পশুর দেহে প্রবেশ করায় যে অবশতার লক্ষণ প্রকাশ পায় তাকে আটালিসংক্রান্ত অবশতা বলে।

২. ঘাম রোগ : আটালির লালার বিষ হতে গবাদিপশু এ রোগে আক্রান্ত হয়। এ রোগে আক্রান্ত পশু অত্যধিক ঘামে বলে একে ঘাম রোগ বলে।

আটালিবাহিত রোগ

আটালিবাহিত বিভিন্ন রোগ আটালিতে আক্রান্ত সকল প্রাণীর হতে পারে। এদেশে আটালিবাহিত রোগগুলোর মধ্যে বোবিসিওসিস (Babesiosis) ও থাইলেরিওসিস (Theileriosis) গবাদিপশু উভয়নে সর্বাধিক গুরুত্ব বহন করে। এ দুটো প্রেটোজোয়াজনিত রোগ দেশী জাতের চেয়ে উন্নত সংকর জাতের অধিক উৎপাদনশীল পশুতে বেশি হয়। এছাড়াও বিভিন্ন প্রকার ব্যাকটেরিয়াজনিত আটালিবাহিত রোগ যেমন— ব্রুসেলোসিস (*Brucella melitensis*, *Brucella abortus*), লিস্টেরিওসিস (*Listeria monocytogenes*), স্টেফাইলোকোক্সিস (*Staphylococcus aureus*) ইত্যাদি রোগে গবাদিপশু আক্রান্ত হয়ে থাকে।

আটালি আক্রান্ত পশুতে বিভিন্ন রোগের লক্ষণ

আটালি আক্রান্ত পশুতে বিভিন্ন রোগ হয়। এর মধ্যে আটালিজনিত রোগের লক্ষণসমূহ এখানে আলোচনা করা হয়েছে। আটালিবাহিত রোগের লক্ষণ পাঠ ৪.৫ এ নির্দিষ্ট রোগের অধীনে আলোচিত হয়েছে।

আটালিসংক্রান্ত অবশতা

রক্ত শোষণকালে লালার সঙ্গে বিষ প্রবেশ করে পশুর দেহে বিষক্রিয়ার লক্ষণ দেখা দেয়। এ বিষ পশুর মোটর স্নায়ুর (Motor Nerve) স্বাভাবিক কাজ বন্ধ করে দেয়। ফলে আক্রান্ত গবাদিপশু অবশতা রোগে ভোগে এবং শ্বাসকষ্টে মারা যায়। আটালি প্রাণীর মেরুরজ্বুর (Spinal Cord) যত কাছে কামড় দিয়ে লেগে থাকবে এর প্রকোপ ও লক্ষণ তত বেশি দ্রুত ও তীব্র হয়ে দেখা দেবে।

গবাদিপশুর আটালিবাহিত বিভিন্ন রোগের মধ্যে প্রেটোজোয়াজনিত থাইলেরিওসিস ও বেবেসিওসিস প্রধান।

আটালিসংক্রান্ত অবশতায় মোটর স্নায়ুর কাজ বন্ধ হয়ে শ্বাসকষ্টে মারা যায় এবং ঘাম রোগে এরা বেশি ঘামে।

ঘাম ৰোগ

ঘাম ৰোগ সাধাৰণত গ্ৰীষ্মকালে হয়। এ ৰোগে আক্রান্ত প্ৰাণীৰ অস্বাভাৱিক ঘাম হয়। ঝিল্লিপৰ্দা (Mucus Membrane) রক্তাত (Hyperaemic) হয়। অল্লবয়ক গবাদিপশুতে এ ৰোগের প্ৰকোপ বেশি।

আটালিজনিত ৱোগ প্ৰতিৱোধ ও চিকিৎসা

খামারভিত্তিৰ আটালি দমন ব্যবসাপেক্ষ ব্যাপার হলেও উল্লত সংকৰ জাতৰে গবাদিপশুৰ খামাৰে তা কৰতে হয়। যেসব আটালিনাশক (Acaricides) প্ৰধানত ব্যবহাৰ কৰা হয় সেগুলোকে সাধাৰণভাৱে ৪টি শ্ৰেণীতে ভাগ কৰা হয়ে থাকে। যথা— ১. আৱেনেলিনিক্যালস্ (Arsenicals), ২. ক্লোরিনেটেড হাইড্ৰোকাৰ্বন্স্ (Chlorinated Hydrocarbons), ৩. অৰ্গানোফসফৱাস কম্পাউন্ড (Organophosphorus Compound— OP) এবং ৪. কাৰ্বামেটসহ অন্যান্য আটালিনাশক (Carbamet and Others)।

আটালিনাশকেৰ বিৱৰণে
প্ৰতিৱোধ ক্ষমতা আটালি
দমনেৰ বড় সমস্যা হওয়ায়
সমষ্টি পতঙ্গ দমন ব্যবহাৰ
প্ৰয়োগ কৰা হয়।

আটালিনাশকেৰ
প্ৰতিৱোধ ক্ষমতা আটালি
দমনেৰ বড় সমস্যা হওয়ায়
সমষ্টি পতঙ্গ দমন ব্যবহাৰ
প্ৰয়োগ কৰা হয়।

Boophilus (বুফিলাস) গণেৰ আটালি উপৱোজ আটালিনাশকেৰ প্ৰায় সবগুলোৰ বিৱৰণে প্ৰতিৱোধ ক্ষমতা (Acaricidal Resistant) অৰ্জন কৰায় উল্লত দেশে এখন সমষ্টি পতঙ্গ (আটালি) দমন (Integrated Pest Management) পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰতে বাধ্য হয়েছে। ক্লোরিনেটেড হাইড্ৰোকাৰ্বন্স্ এবং অৰ্গানোফসফৱাস বহুনিয়াবৎ সাধাৰণ কীটনাশক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তাই আটালি এসব কীটনাশকেৰ বিৱৰণে প্ৰতিৱোধ ক্ষমতাপ্ৰাপ্ত হয়েছে। তবে, খামাৰ পৰ্যায়ে কাৰ্বামেটেৰ কাৰ্য্যকাৰিতা এখনও বহুল রয়েছে।

আটালি তাৰ জীবনচক্ৰেৰ বেশকিছু সময় পৱিবেশেৰ বিভিন্ন স্থানে, যেমন— ঘাসেৰ ডগায়, বোঁপৰাড়ে, গাছেৰ পাতায়, গোয়াল ঘৱেৰ বেড়ায়, মাটিতে অবস্থান কৰতে পাৰে। তাই এসব স্থানে আটালি বিনাশেৰ জন্য পৰ্যাপ্ত পৱিমাণ নিৰ্দিষ্ট মাত্ৰাৰ কীটনাশক স্প্ৰে কৰতে হয়। বেশকিছু উপকাৰী পোকামাকড় খামাৰেৰ আশেপাশে থাকে যাবা স্বাভাৱিকভাৱে আটালিৰ বাচ্চা বা ডিম খেয়ে আটালিৰ সংখ্যা প্ৰাকৃতিকভাৱে সীমিত কৰে দেয়। তাই খামাৰ পৰ্যায়ে আটালিনাশক প্ৰধানত উপৱি প্ৰয়োগ (Pour On), ভেট ডিপ (Vat Dip), কানেৰ বিষটোপ (Ear Tag), ইনজেকশন অথবা ধীৱেৰ নিঃস্তৃত পাকস্থলীৰ আটালিনাশক বোলাস (Sustained Released Implant/Slow Release Intraruminal Bolus) ইত্যাদি পদ্ধতিতে ব্যবহাৰ কৰা হয় যাতে উপকাৰী পোকামাকড় বেঁচে থাকে। এছাড়াও পৱিবেশেৰ আটালি দমনেৰ ব্যবস্থা হিসেবে জীবতাত্ত্বিক (Biological), কৌলিতাত্ত্বিক (Genetic) এবং আক্রান্ত প্ৰাণীৰ ৱোগপ্রতিৱোধ ক্ষমতা (Immunological) কাজে লাগিয়ে আটালি দমন কৰা যায়। আবাৰ একই প্ৰজাতিৰ দুই উপজাতৰে আটালিৰ সংকৰায়নেৰ (Hybridization) মাধ্যমে বৎসৰিস্তাৰ ঘটালৈ উৎপাদিত পুৰুষ আটালি বৎসৰিস্তাৰে অক্ষম (Sterile) হয়। বহুসংখ্যক অনুৰ্বৰ আটালি পৱিবেশে মুক্ত কৰে বৎসৰিস্তাৰ সীমিত রাখা সম্ভব। তবে, এটা বন্যপ্ৰাণীৰ আটালি দমনে বেশি প্ৰযোজ্য। আটালি শিকাৰি যে কোনো প্ৰাণী, আটালিৰ ৱোগসৃষ্টিকাৰী পৱজীবী, ব্যাকটেৰিয়া, ভাইৱাস, ছত্ৰাক কিংবা আটালি ধৰ্মস্কাৰী যে কোনো লতাগুল্যাত আটালিৰ বৎসৰিস্তাৰে ব্যবহাৰ কৰা যায়। অল্ল পৱিমাণ আটালি ঘাৱা আক্রান্ত কৰে গবাদিপশুতে ৱোগপ্রতিৱোধ ক্ষমতা গড়ে তোলা বেশ বামেলাৰ কাজ হলেও দেশী গৱণতে আটালি দমনে বেশ ভালো ফল পাওয়া যায়। কিন্তু উল্লত সংকৰ জাতৰে গবাদিপশুতে এ ব্যবস্থা বুঁকিপূৰ্ণ। ইদানিং আটালিৰ নাড়িভুঁড়ি (Gut) হতে তৈৰি টিকা প্ৰয়োগেৰ মাধ্যমে পশুৰ দেহে লেগে থাকা আটালিৰ মৃত্যুহাৰ বৃদ্ধি কৰা গেছে। তবে, এটা এখনও একটা পৱিপূৰ্ণ দমন পদ্ধতি হিসেবে প্ৰসাৱ লাভ কৰে নি। ওষুধ হিসেবে আইভাৰমেটিন (Ivermectin) ইনজেকশন আটালি দমনে বেশ কাৰ্য্যকৰ যা আটালি ছাড়াও রক্ত শোষণকাৰী অন্যান্য পৱজীবীৰ বিৱৰণেও কাজ কৰে।

মাইট আক্রান্ত গবাদিপশুতে ৱোগেৰ লক্ষণ

মাইট আক্ৰমণেৰ ফলে সৃষ্টি ৱোগকে মেঞ্জ (Mange) বলে। ব্যবস্থাপনা ভালো হলে গবাদিপশুৰ মেঞ্জ হয় না। স্বাস্থ্যবান গবাদিপশু সহজে মাইট ঘাৱা আক্রান্ত হয় না। পুষ্টিহীন গবাদিপশু সহজেই মেঞ্জে

মাইট আক্রান্ত পশুৰ চামড়াৰ
ক্ষতে ব্যাকটেৰিয়া সংক্ৰমণেৰ
ফলে ঘায়েৰ সৃষ্টি হয়।

আক্রান্ত হয়। স্তৰী মাইট চামড়ার নিচে গর্ত করে (Burrows) এগুতে থাকে। এতে শরীরে তীব্র চুলকানি হয় এবং জ্বালা করে। অতিরিক্ত চুলকানোর ফলে চামড়ায় ক্ষতের সৃষ্টি হয়। ক্ষতে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের ফলে চামড়ায় ঘা হয়। ঘায়ে চটা ধরে চুলসহ উঠে আসে। মেঝে হলে পশুর খাদ্য গ্রহণ করে যাওয়ার জন্য দুধ, মাংস, চাষের শক্তি ইত্যাদি করে যায়। এছাড়া এ রোগে চামড়া পুরু হয় বলে তা নিম্নমানের হয়ে যায়।

মেঝের চিকিৎসা

আক্রান্ত গবাদিপশুকে লিনডেন (0.2%) পানিতে মিশিয়ে পরপর ২-৩ দিন গোসল করালে মেঝে ভালো হয়ে যায়। বেনজাইল বেনজয়েট, টেটমোসল শরীরে ঘষে লাগিয়ে ২৪ ঘন্টা পর গোসল করালে মেঝে ভালো হয়। ক্রটোক্সিফস (Crotoxyphos- সিওড্রিন 10% + ডিডিভিপি 2.5%) 0.25% পানিতে মিশিয়ে গরুর শরীরে স্প্রে করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। ব্রামসাইক্লিন স্প্রে বা ডাস্টিং হিসেবে প্রয়োগ করেও মেঝের চিকিৎসা করা যায়।

ফিল ক্ষতিকারক প্রভাব

মাছি প্রধানত চারভাবে গবাদিপশু পালনে বিষ্ণু সৃষ্টি করে। যথা—

- ক. গবাদিপশুর শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে বসে বিরক্ত করে;
- খ. ব্যাকেটেরিয়া, কৃমি, ফাইলোরিয়া, প্রোটোজোয়া ইত্যাদির তেষ্টর (Vector), মাধ্যমিক পোষক অথবা মেকানিক্যাল ট্রাঙ্গিমিটার হিসেবে কাজ করে;
- গ. মাছি রক্ত শোষণ করে এবং
- ঘ. মায়াসিস (Myiasis) করে।

মায়াসিস গবাদিপশু উৎপাদনে সর্বাধিক ক্ষতি করে। তাই এ পাঠে মাছির ক্ষতিকারক প্রভাবের আওতায় শুধু মায়াসিস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

মায়াসিসকে সাধারণভাবে ঘায়ে কীড়া পড়া বলে। যে কোনো খোলা ঘায়ে মাছি বসে। এরা ঘা হতে রক্ত, রক্তরস, টিস্যু ইত্যাদি খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। ঘায়ে বসে খাদ্য গ্রহণকালে ক্ষতে ডিম দেয়। এ ডিম থেকে মেগট (Maggot) বের হয়ে ক্ষতের ভিতরে প্রবেশ করে সুস্থ টিস্যু খেয়ে বড় হতে থাকে। এজন্য ঘা থেকে সর্বদা রক্তক্ষরণ হতে থাকে। ফলে আক্রান্ত গবাদিপশু রক্তাত্তায় (Anaemia) ভোগে। ঘোঁজাকরণের পর ঘা জীবাণুশক হ্লারা ভালোভাবে পরিষ্কার করে জীবাণুশক ও মাছি বিতারক না দিলে মায়াসিস হবে। এতে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হবে এবং আক্রান্ত পশু বিনা চিকিৎসায় মারা যেতে পারে। গাড়ী বাঢ়া দেয়ার পর ঘোনাঙ্গে মাছি বসে মায়াসিস হয়। এছাড়া ছাগলভেড়ার ন্যাজাল বট (Nasal Bot) হলে সর্বদা নাক দিয়ে শ্লেষ্মা পড়ে এবং হাঁচি দেয়। পরিমিত পরিমাণ খাদ্য গ্রহণে বিষ্ণু ঘটে। দিন দিন ওজন কমতে থাকে। ফলে মাংস উৎপাদন হ্রাস পায়।

উকুন আক্রমণের লক্ষণ ও ক্ষতিকারক প্রভাব

শীতকালে গবাদিপশুর উকুনে আক্রান্ত হওয়ার হার বেশি। লম্বা লোমবিশিষ্ট কম বয়সের গবাদিপশু উকুনে বেশি আক্রান্ত হয়। উকুন আক্রমণের ফলে এরা সার্বক্ষণিক বিরক্তি অনুভব করে। আক্রান্ত পশু সর্বদা অস্থির থাকে। তাই খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে কমে যায়। বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটে। শরীর চুলকায়, ফলে চামড়ায় ক্ষতের সৃষ্টি হয়। ক্ষতে মাছি ডিম পাড়ে এবং মায়াসিস হয়। আক্রান্ত পশুর ওজন কমে যায়, দুধ ও মাংস উৎপাদন হ্রাস পায়।

ফিল ও উকুনজনিত রোগের প্রতিরোধ ও চিকিৎসা

খামারের শেত ও আশেপাশের পরিবেশ পরিষ্কার রাখলে মাছির উপন্দুব করে যায়। কিছু কিছু মাছি গোবরের স্তুপে ডিম দেয় তাই গোবরের পিট ঢেকে রেখে মাছির বংশবৃদ্ধি কমানো সম্ভব। বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের মাধ্যমে এদের সংখ্যা হ্রাস করা যায়। বিভিন্ন প্রকার কীটনাশক ব্যবহার করে মাছির

মাছি রোগজীবাণুর ভেষ্টর ও মেকানিক্যাল ট্রাঙ্গিমিটার হিসেবে কাজ করে। তাছাড়া এরা রক্ত শোষণ ও মায়াসিস করে।

মাছির মেগট ক্ষতে রক্তক্ষরণ করে রক্তক্ষয়তাসহ বিভিন্ন অঙ্গের কাজে বিষ্ণু সৃষ্টি করে।

শীতে উকুনের প্রকোপ বেশি। উকুনে আক্রান্ত পশুর উৎপাদন কমে যায়।

মাছি ও উকুন দমনের জন্য কীটনাশক স্প্রে, গোসল ও ডাস্টিং ব্যবহার করা হয়।

উপদ্রব কমানো সম্ভব। গবাদিপশুর উকুন দমনে নানা প্রক্রিয়ায় কীটনাশক ব্যবহার হয়ে থাকে। যথা—ক. পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করে, খ. পানিতে মিশিয়ে ডেট ডিপ বা গোসল করিয়ে এবং গ. ধুলা বা ছাইয়ের সাথে মিশিয়ে শরীরে পাউডারের মতো ঘষে (ডাস্টিং)।

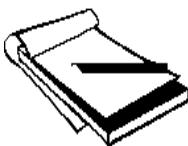
কীটনাশক ব্যবহারের পর
ব্যবহৃত জিনিসপত্র সাবধানে
মাটিতে পুতে ফেলতে হবে।

সকল প্রকার কীটনাশকই মারাত্মক বিষ। তাই অতি সাবধানে মাত্রা ও নির্দেশিকা মোতাবেক ওষুধ মিশাতে হয়। নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত প্রয়োগের পর পশুকে তালোভাবে গোসল করিয়ে শরীরের কীটনাশক পরিষ্কার করে দিতে হয়। ওষুধ প্রয়োগে ব্যবহৃত সকল তৈজসপত্র নির্দিষ্ট স্থানে মাটির নিচে পুতে রাখতে হবে। ব্যবহৃত যষ্টপাতি নদী, পুকুর বা যে কোনো জলাশয়ে পরিষ্কার করা যাবে না।

সচরাচর যেসব কীটনাশক ফ্লি ও উকুন দমনে ব্যবহার করা হয় সারণি ৯ এ বিভিন্ন পশুতে সেগুলোর প্রয়োগ মাত্রা ও ব্যবহারবিধিসহ তালিকা দেয়া হয়েছে।

সারণি ৯ : মাত্রা ও ব্যবহারবিধিসহ ফ্লি ও উকুন দমনে ব্যবহৃত বিভিন্ন কীটনাশক

পশুর জাত	কীটনাশক	মাত্রা (%)		ব্যবহারবিধি	
		মাছি	উকুন	মাছি	উকুন
গরঞ্জ/মহিষ	কুমোফস (Cumophos)	০.৫	১	স্প্রে	ডাস্টিং
	ডাইঅক্সিথিয়ন (Diaoxithion)	০.১৫	০.১৫	ডিপ	স্প্রে
	ফসমার (Phosmer)	০.২৫	১	স্প্রে	ডাস্টিং
	মেলাথিওন (Melathion)	—	০.৫	—	স্প্রে
	রোনেন (Ronen)	২.৫	০.২৫	স্প্রে	স্প্রে
	টক্সাফেন (Toxaphene)	০.৫	০.৮	স্প্রে	স্প্রে
	ট্রাইক্লোরফন (Trichlorfon)	৮	—	উপরে ঢেলে	—
ছাগল/ভেড়া	কুমোফস (Cumophos)	০.১২৫	০.০২৫	ডিপ	ডিপ
	ডাইঅক্সিথিয়ন (Diaoxithion)	০.০২৫	০.২	ডিপ	স্প্রে
	ট্রাইক্লোরফন (Trichlorfon)	৮০	—	ন্যাজাল বট হলে খাদ্যের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। তবে, প্রস্তুতিকে দেয়া যাবে না।	
	আইভারমেক্টিন (Ivermectin)	০.০৮	—	ন্যাজাল বট হলে পানিতে গুলে খাওয়াতে হয়।	



অনুশীলন (Activity) : আটালি, মাইট, ফ্লি ও উকুনের ক্ষতিকর প্রভাবের তুলনামূলক চিত্র তুলে
ধরুন।



সারমর্ম : আটালি প্লারা আটলিজনিত অবশতা ও ঘাম রোগ হয়। গবাদিপশুর আটালিবাহিত বিভিন্ন রোগের মধ্যে প্রেটোজোয়াজনিত থাইলেরিওসিস ও বেবেসিওসিস প্রধান। আরসেনিক্যালস, ক্লোরনেটেড হাইড্রোকার্বন, অর্গানোফসফেট ও কার্বামেট এ চার প্রকার অ্যাকারিসাইড বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রয়োগ করে আটালি দমন করা হয়। পশুর মেঝে হলে মাধ্যমিক ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণে চামড়ায় ঘা হয় এবং পশুর উৎপাদন কমে যায়। চিকিৎসায় টেটমোসল, বেনজাইল বেনজোয়েট পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করা হয়। মাছি রোগজীবাণুর ভেষ্টন, মেকানিক্যাল ট্রান্সমিটর এবং রক্ত শোষণ ও মায়াসিস করে। শীতে উকুনের প্রকোপ বেশি। উকুনে আক্রান্ত পশুর উৎপাদন কমে যায়। মাছি ও উকুন দমনের জন্য স্প্রে, গোসল ও ডাস্টিংয়ের মাধ্যমে কীটনাশক প্রয়োগ করা হয়।



পাঠ্যত্বর মূল্যায়ন ৪.৮

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

- ক. আটালিজনিত প্রধান রোগ দুটো কী কী?
- i) বেবেসিওসিস ও থাইলেরিওসিস
 - ii) টুলারেমিয়া ও লিস্টেরিওসিস
 - iii) আটলিজনিত অবশতা ও ঘাম রোগ
 - iv) ফাইলেরিয়াসিস ও ট্রিপেনোসোমিয়াসিস

খ. আটালিবাহিত দুটো গুরুত্বপূর্ণ প্রোটোজোয়াজনিত রোগ কী কী?

- i) হার্টওয়ার্টার ও ক্রসেলোসিস
- ii) টিক প্যারালাইসিস ও স্টেফাইলোক্লোসিস
- iii) লিস্টেরিওসিস ও ঘাম রোগ
- iv) বেবেসিওসিস ও থাইলেরিওসিস

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. মাইট আক্রমণকে মেঝে (Mange) বলে।

খ. গোবরের পিট ঢেকে রেখে মাছির বংশবৃদ্ধি কমানো সম্ভব।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. মেগট আক্রমণকে _____ বলে।

খ. আটালির _____ সঙ্গে নিঃস্তৃত বিষ প্লারা গবাদিপশুতে আটালিসংক্রান্ত অবশতা ও ঘাম রোগ হয়।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. কোনুন সময় উকুন আক্রান্তের হার বেশি?

খ. সময়স্থিত পতঙ্গ দমন পদ্ধতি কেন গ্রহণ করতে হবে?

পাঠ ৪.৫ গবাদিপশুর সাধারণ প্রোটোজোয়াজনিত রোগ



এ পাঠ শেষে আপনি –

- প্রোটোজোয়া কী তা বলতে পারবেন।
- গবাদিপশুর সাধারণ প্রোটোজোয়াজনিত রোগের নাম লিখতে পারবেন।
- ককসিডিওসিস রোগের লক্ষণ, চিকিৎসা ও দমন পদ্ধতি আলোচনা করতে পারবেন।
- বেবেসিওসিস রোগের লক্ষণ, চিকিৎসা ও দমন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- থাইলেরিওসিস রোগের লক্ষণ, চিকিৎসা ও দমন পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন।



প্রোটোজোয়া (Protozoa)

প্রোটোজোয়া এক ধরনের এককোষি প্রাণী যাদের বিপাকাক্রিয়া, চলন ও বংশবিস্তার পদ্ধতি এককোষি উদ্ভিদ হতে ভিন্নতর। প্রোটোজোয়ার বংশবিস্তার দুভাবে হয়ে থাকে। যেমন—

১. অযৌন প্রজনন প্রক্রিয়া

তিনভাবে প্রোটোজোয়ার আযৌন প্রজনন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে থাকে। যথা—

ক. বাইনারি ফিশন প্রক্রিয়া (Binary Fission Process) : এ প্রক্রিয়ায় প্রোটোজোয়ার নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম দুভাগে বিভক্ত হয়ে দুটো নতুন কোষে রূপান্তরিত হয়। যেমন— *Toxoplasma Spp.* (টক্সোপ্লাজমা)।

খ. বাড়ি প্রক্রিয়া (Budding) : এ পদ্ধতিতে প্রোটোজোয়া কোষ হতে কুঁড়ি বা মুকুল বের হয়ে দুই বা ততোধিক নতুন কোষের সৃষ্টি হয়। যেমন— *Babesia Spp.* (বেবেসিয়া)।

গ. সিজোগনি (Schizogony) : এ পদ্ধতিতে প্রোটোজোয়ার একটি কোষ থেকে অনেক নতুন কোষের সৃষ্টি হয়। যেমন— *Sporozoa Spp.* (স্পোরোজোয়া)।

২. যৌন প্রজনন প্রক্রিয়া

দুভাগে যৌন প্রজনন প্রক্রিয়া সম্পাদিত হয়। যথা—

ক. কনজুগেশন প্রক্রিয়া (Conjugation) : এ পদ্ধতিতে দুটো প্রোটোজোয়ার মিলনে নিউক্লিয়ার পদার্থ বিনিময়ের মাধ্যমে নতুন প্রোটোজোয়ার বংশবিস্তার ঘটে। যেমন— সিলিয়াযুক্ত প্রোটোজোয়া।

খ. সিন্গ্যামি (Syngamy) : এ প্রক্রিয়ায় প্রোটোজোয়ার পুঁ মাইক্রোগ্যামেট এবং স্ত্রী ম্যাক্রোগ্যামেট একত্রিত হয়ে জাইগেট সৃষ্টি হয়। যেমন— *Coccidia* (ককসিডিয়া)।

গবাদিপশুকে আক্রান্ত করে এমন কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রোটোজোয়াজনিত রোগ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হয়েছে।

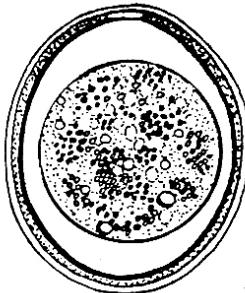
ককসিডিওসিস (Coccidiosis)

এটি একটি প্রোটোজোয়াজনিত রোগ। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এ রোগের প্রাদুর্ভাব রয়েছে। বয়স্ক পশুর চেয়ে অল্পবয়স্ক পশুর মধ্যে এ রোগের প্রকোপ বেশি দেখা যায়।

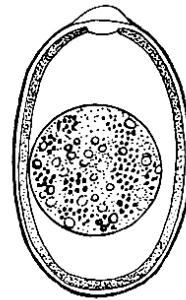
ককসিডিওসিস
প্রোটোজোয়াজনিত রোগ।

কারণ

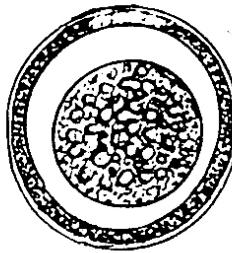
মূলত আইমেরিয়া গণভূক্ত প্রোটেজোয়া এ রোগের প্রধান কারণ। সারণি ১০ এ গবাদিপশুকে আক্রান্তকারী ককসিডিয়া জীবাণুর নামের তালিকা দেয়া হয়েছে।



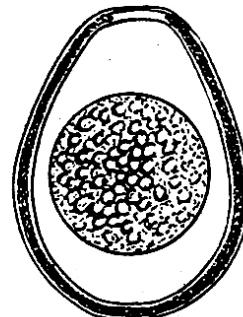
ক—*Eimeria ninakohlyakimovae*



খ—*Eimeria arloingi*



গ—*Eimeria zurnii*



ঘ—*Eimeria bovis*

চিত্র ৪০ (ক, খ, গ ও ঘ) : গবাদিপশুর চার প্রজাতির ককসিডিয়া পরজীবী

সারণি ১০ : গবাদিপশুকে আক্রান্তকারী বিভিন্ন ককসিডিয়া

ক্রমিক নং	আইমেরিয়ার নাম	আক্রান্ত পশুর নাম
১.	<i>Eimeria bovis</i> (আইমেরিয়া বিভিস)	গরু, মহিষ
২.	<i>Eimeria zurnii</i> (আইমেরিয়া জুরনিই)	গরু, মহিষ
৩.	<i>Eimeria arloingi</i> (আইমেরিয়া আরলয়েনগি)	ছাগল
৪.	<i>Eimeria ninakohlyakimovae</i> (আইমেরিয়া নিনাকোলিয়াকিমোভি)	ছাগল
৫.	<i>Eimeria canis</i> (আইমেরিয়া ক্যানিস)	কুকুর

সংক্রমণ পদ্ধতি

নিম্নলিখিতভাবে গবাদিপশুতে ককসিডিয়ার সংক্রমণ ঘটে। যেমন—

- ◆ ককসিডিয়ার উসিস্ট খাদ্য বা পানির সাথে পশুর দেহে প্রবেশ করে।
- ◆ মানুষের ব্যবহৃত জামা, জুতা ইত্যাদির মাধ্যমে উসিস্ট একস্থান হতে অন্যস্থানে সংক্রমিত হয়।
- ◆ ইঁদুর, তেলাপোকা ইত্যাদির মাধ্যমে রোগের পরজীবী সংক্রমিত হয়।

গরুমহিষের রোগলক্ষণ

গরু বা মহিষের বাচ্চুরের ককসিডিওসিস হলে রক্ত আমাশয় ও ডায়ারিয়া হয়। বয়স্ক পশু বাহক হিসেবে কাজ করে।

বয়স্ক গরুমহিষের চেয়ে অল্পবয়স্ক গরুমহিষে এ রোগের প্রকোপ বেশি। তবে, বয়স্ক গরুমহিষ এ রোগের বাহক হিসেবে উসিস্ট গ্লারা পরিবেশ দুষ্প্রিয় করে। উষ্ণ আবহায়ায় স্যাঁতস্যাঁতে ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে পশু পালনে এ রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। সাধারণত স্টলে বেঁধে পালন করা বাচ্চুরে এ রোগ বেশি হয়। আক্রান্ত বাচ্চুর রক্তমিশ্রিত পাতলা পায়খানা করে। কখনও কখনও মলের সাথে জমাটবাঁধা রক্তও থাকে। রক্তশূন্যতা, দুর্বলতা ও ক্ষেকায় হয়ে যাওয়া এ রোগের অন্যতম লক্ষণ। ডায়ারিয়া শুরুর ৭ দিনের মধ্যে আক্রান্ত বাচ্চুর বিনা চিকিৎসায় মারা যেতে পারে।

ছাগলভেড়ায় রোগলক্ষণ

প্রধানত ৪—৬ মাস বয়সের ছাগলভেড়ার বাচ্চা ককসিডিওসিস রোগে আক্রান্ত হয়। অনেক পশু একত্রে গাদাগাদি করে রাখলে পালের পশু এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। পশু আক্রান্তের তুলনায় মৃত্যের হার অনেক কম। এ রোগ হলে বাচ্চা হলদে—সবুজ পাতলা পায়খানা করে। মলের সাথে তাজা রক্ত থাকে। পেটের ব্যাথায় বাচ্চা চিঁকার করে। রক্তশূন্যতা, দুর্বলতা ও শারীরিক ওজন কমে যাওয়া এ রোগের বিশেষ লক্ষণ।

রোগের লক্ষণের সাথে মলে
উসিস্ট শণাক্তের গ্লারা
ককসিডিওসিস রোগ নির্ণয়
করা হয়।

রোগ নির্ণয়

খামারে এ রোগের প্রাদুর্ভাবের ইতিহাস এবং রোগের অন্যান্য লক্ষণের সাথে রক্তমাখা ডায়ারিয়া দেখে এ রোগ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। তবে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে সাহায্যে আক্রান্ত পশুর পায়খানায় ককসিডিয়ার উসিস্ট শণাক্তের মাধ্যমে রোগ নির্ণয় নিশ্চিত করা হয়।

চিকিৎসা

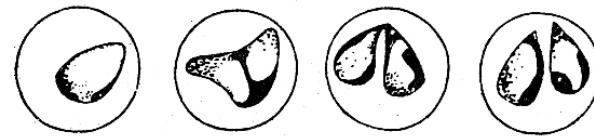
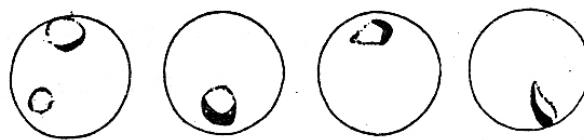
অন্তে সক্রিয় যে কোনো সালফোনেমাইড, যেমন— সালফাগ্যানিডিন, সালফামেরাজিন বা সালফামেথাজিন ব্যবহার করা যেতে পারে।

রোগপ্রতিরোধ

এ রোগের কোনো টিকা এখনও আবিস্কৃত হয় নি। তাই উন্নত খামার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রোগপ্রতিরোধ করতে হবে। খাদ্য শুকনো রাখতে হবে। খাবার পাত্র শুকনো রাখতে হবে। কাঁদা বা পশুর মল গ্লারা খাদ্য যাতে দূষিত হতে না পারে তার ব্যবস্থা নিতে হবে। ঘর, আঙিনা পরিকার রাখতে হবে। চারণক্ষেত্র বা আবাসস্থলের কোথাও কোনো জলাবদ্ধতা থাকলে তা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নিতে হবে। পশুর বিছানাপত্র শুকনো রাখা আবশ্যিক। আক্রান্ত পশুর বিছানা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। গোয়াল ঘর মাঝেমধ্যে ফেলল বা ফরমালিডিহাইডের ধোয়া গ্লারা জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

বেবেসিওসিস (Babesiosis) রোগ

বেবেসিওসিস বা আটালি জুর গৃহপালিত ও বন্যপ্রাণীর একপ্রকার রোগ যা হলে রক্তের লোহিতকণিকা ভেঙ্গে যায়। ফলে রক্তশূন্যতা ও রক্তপ্রস্তাৱ হয় এবং সময়মতো চিকিৎসার অভাবে আক্রান্ত পশু মারা যায়। এ রোগ বিভিন্ন প্রজাতির বেবেসিয়া গ্লারা সংঘটিত হয়। এ পরজীবী বিভিন্ন প্রজাতির আটালি



চিত্র ৪১ : গবাদিপশুর লোহিতকণিকার ভিত্তির Babesia Spp. এর বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়

গ্লারা বাহিত হয়ে গবাদিপশুতে বিস্তারলাভ করে। অস্তত ১৪টি প্রজাতির বেবেসিয়া গ্লারা বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণী আক্রান্ত হয়। এদের মধ্যে *Babesia bigemina* (বেবেসিয়া বাইজেমিনা) এবং *Babesia bovis* (বেবেসিয়া বভিস) আমাদের দেশে গরুমহিষের বেবেসিওসিস রোগ সৃষ্টি করে পশু উৎপাদনে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে।

বেবেসিওসিসের লক্ষণ

লোহিতকণিকা ভাঙ্গার জন্য জ্বরের সাথে রক্তপ্রস্তাৱ এবং রক্তকুন্যতা বেবেসিওসিসের প্রধান লক্ষণ।

বেবেসিওসিস রোগে সাধারণত ৯–১২ মাস বয়সের গবাদিপশু আক্রান্ত হয়। আটালি আক্রান্ত গবাদিপশুতে সংক্রমিত আটালির কামড়ের ৭–১৪ দিনের মধ্যে রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। সুষ্ঠিকাল শেষে $81^{\circ}-82^{\circ}$ সে. তাপমাত্রাসহ রোগের অন্যান্য লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। এ জ্বর ৭ দিন বা তারও বেশি সময় পর্যন্ত থাকতে পারে। এসময় রক্তের লোহিতকণিকা ভাঙ্গার কারণে প্রসাবের রঙ রক্তের মতো লাল হয়। এ কারণে একে রেড ওয়াটার ফেভার (Red Water Fever) বলে। আক্রান্ত পশু তীব্র রক্তশূন্যতায় ভোগে। এ রোগে রক্তের লোহিতকণিকার ৭৫% পর্যন্ত ভেঙ্গে যায়। তীব্র প্রকৃতির রোগে ১ সপ্তাহ ভোগার পর বেঁচে যাওয়া পশু মৃদু প্রকৃতির রোগে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত ভোগে। এসময় মাঝে মাঝে শরীরের তাপমাত্রা $80^{\circ}-80.5^{\circ}$ সে. পর্যন্ত ওঠে। যেসব এলাকায় আটালির প্রকোপ অধিক সেসব এলাকার গবাদিপশুতে এ রোগের প্রকোপও বেশি। রক্ত পরীক্ষায় লোহিতকণিকার ভিতরে বেবেসিয়ার উপস্থিতির গ্লারা রোগ নিশ্চিত করা যায়।

চিকিৎসা

নিম্নলিখিত ওষুধ দিয়ে এ রোগের চিকিৎসা করা যায়। যথা—

- ◆ কুয়িনিউরেনিয়াম সালফেট— ১ মি.লি./৫০ কেজি দৈহিক ওজন (ইনজেকশন)।
- ◆ ডাইমিনাজিন অ্যাসিটুরেট— ৩–৪ মি. গ্রা./৫০ কেজি দৈহিক ওজন।

রোগপ্রতিরোধ

রক্তে বেবেসিয়া পরজীবীর সংখ্যা নির্দিষ্ট রেখে পশুকে রোগমুক্ত রাখা সম্ভব। এ পদ্ধতিতে পশুর রক্তে পরজীবী প্রবেশ করিয়ে চিকিৎসার সাহায্যে এর বংশবৃদ্ধি একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রেখে পশুকে রোগাক্রান্ত হওয়ার হাত থেকে মুক্ত রাখা সম্ভব। আটালিনাশক গ্লারা পশুকে গোসল (Dip) করিয়ে আটালি দমনের মাধ্যমে এ রোগের কবল থেকে গবাদিপশুকে মুক্ত রাখা যায়। তবে, এ পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট এলাকার পরিবেশ ও আটালির সংখ্যা (Tick Population) এবং গবাদিপশুর জাতের ওপর নির্ভরশীল। কম বয়সের গরুবাচুরের এ রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বিদ্যমান থাকে। তাই কম বয়সের বাচুরকে *Babesia bigemina* (বেবেসিয়া বাইজেমিনা) এর মৃদু স্ট্রেইন (Mild Strain) গ্লারা আক্রান্ত করে পূর্বশাক্তকরণের (Premunition) মাধ্যমে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলা হয়। সাধারণত যেসব এলাকায় এ রোগ বিদ্যমান (Endemic Area) সেসব এলাকায় আমদানিকৃত গবাদিপশুতে এ রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেয়া হয়।

থাইলেরিওসিস (Theileriosis) রোগ

থাইলেরিওসিস প্রথিবীর সর্বত্র বিরাজমান। *Theileria annulata* (থাইলেরিয়া অ্যানুলেটা) আমাদের দেশের গবাদিপশু, বিশেষ করে সংকর জাতের গরুতে, *Hyalomma anatomicum* (হাইলেমোলামা অ্যানাটোলিকাম) এবং *Haemophysalis bispinosa* (হেমোফাইসেলিস বিসপিনোসা) প্রজাতির আটালি গ্লারা সংক্রমিত হয়ে উষ্ণমণ্ডলীয় থাইলেরিওসিস (Tropical Theileriosis) রোগের সৃষ্টি করে পশুসম্পদ উন্নয়নে ব্যবস্থাত সৃষ্টি করে।

লক্ষণ

থাইলেরিওসিস হলে পশুর শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বৃদ্ধি পায় ($80^{\circ}-81.5^{\circ}$ সে.), চোখে পিঁচাটি দেখা যায়, নাক দিয়ে শ্লেঞ্চা বারে, বহিঘন্দের লিম্ফগ্রাহ্ণি (Superficial Lymphnode) ফুলে যায়। যকৃত ও পীহার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে। বৃক্কে স্থানীয় রক্ত চলাচল বন্ধ বা ইনফারকশন

থাইলেরিওসিস রোগ সংকর জাতের গবাদিপশুতে *Hyalomma I Haemophysalis* গণের আটালি গ্লারা সংক্রমিত হয়।

লিম্ফগ্রাহ্ণি ফোলা, জ্বর, চোখে পিঁচাটি ও নাকে শ্লেঞ্চা থাইলেরিওসিস রোগের প্রধান লক্ষণ।

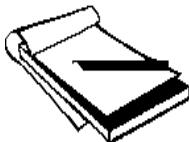
(Infarction) হয়ে যায়, ফুসফুসে পানি জমে, মিউকাস বিল্লি ফ্যাকাসে বা হলুদ বর্ণ ধারণ করতে পারে।

চিকিৎসা

অক্সি বা ক্লোরো-টেট্রাসাইক্লিন জাতীয় ওষুধ গ্লারা চিকিৎসা করালে থাইলেরিওসিস রোগ ভালো হয়। প্রিমিউনিশনে টেট্রাসাইক্লিন ভালো কাজ করে।

রোগপ্রতিরোধ

থাইলেরিওসিস রোগের প্রকোপ পশুর জাত, আটালির উপস্থিতি ও সংখ্যার ওপর নির্ভরশীল। দেশী জাতের গবাদিপশুতে এ রোগের প্রকোপ কম। কারণ, দেশী গরুর রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি। সংকর বা উন্নত জাতের গবাদিপশুতে এ রোগের প্রকোপ দেশী জাতের গরুর চেয়ে অনেক বেশি। কারণ, যে প্রজাতির আটালি গ্লারা এ রোগ সংক্রমিত হয় সে প্রজাতির আটালির বিরুদ্ধে সংকর বা বিদেশী উন্নত জাতের গবাদিপশুর প্রতিরোধক্ষমতা কম। তাই উন্নত বা সংকর জাতের গবাদিপশু আটালি গ্লারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে রেনামাইসিন এল.এ. ইনজেকশন দিয়ে পশুকে এ রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা যায়। গবাদিপশুকে আটালিমৃত রেখেও এ রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেতে পারে। কোনো কোনো দেশে আক্রান্ত আটালি থেকে তৈরি টিকা প্রয়োগ করেও এ রোগের হাত থেকে গবাদিপশুকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হচ্ছে।



অনুশীলন (Activity) : ককসিডিওসিস, বেবেসিওসিস ও থাইলেরিওসিস রোগের লক্ষণের তুলনামূলক আলোচনা খাতায় লিখুন।



সারামর্ম : প্রোটোজোয়া এককোষি প্রাণী। এরা মৌন ও অযৌন উভয় পদ্ধতিতে বংশবিস্তার করে। *Eimeria*, *Babesia* এবং *Theileria* গণের প্রোটোজোয়া গবাদিপশুর সর্বাধিক ক্ষতিকারক পরজীবী। *Eimeria* গণের উসিস্ট মলের সাথে বাইরে এসে স্পোর্লেশনের পর খাদ্যের সাথে পাচন অন্তে প্রবেশ করে শুন্দ্রান্তে প্রাচীরে ঢুকে প্রথমে অযৌন ও শেষে মৌনভাবে বংশবৃদ্ধি করে উসিস্ট তৈরি করে। যা আবার মলের সাথে বাইরে চলে আসে। স্বাস্থ্যসম্মত খামার ব্যবস্থাপনা ককসিডিওসিস রোগ প্রতিরোধের সহায়ক ব্যবস্থা। বেবেসিয়া রক্তের লোহিতকণিকার পরজীবী। বেবেসিওসিসকে টেক্সাস ফেভার বা রেড ওয়াটার ফেভার বলা হয়। *Babesia bigemina* ও *Babesia bovis* প্রজাতির প্রোটোজোয়া প্রায় ১৪ প্রজাতির আটালি গ্লারা বিস্তারলাভ করে। লোহিতকণিকা ভাঙার জন্য জুরের সাথে রক্তপ্রস্তাব এবং রক্তশূন্যতা বেবেসিওসিসের প্রধান লক্ষণ। থাইলেরিওসিস রোগ সংকর জাতের গবাদিপশুতে *Hyalomma* ও *Haemophysalis* গণের আটালি গ্লারা সংক্রমিত হয়। তাই এগুলো দমনে আটালি দমনসহ প্রিমিউনিশন, দেশী জাতের আটালিসহনশীল পশু পালন এবং আক্রান্ত আটালি থেকে তৈরি টিকা প্রয়োগ করে রোগপ্রতিরোধের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়।



পাঠোভর মূল্যায়ন ৪.৫

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. প্রোটোজয়া কী ধরনের প্রাণী?

- i) বহুকোষি প্রাণী
- ii) এককোষি প্রাণী
- iii) জলজ প্রাণী
- iv) উভচর প্রাণী

খ. ককসিডিওসিস কী?

- i) পরজীবীজনিত রোগ
- ii) ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ
- iii) ভাইরাসজনিত রোগ
- iv) *Eimeria* গণের বিভিন্ন প্রজাতির ফ্লারা সৃষ্টি আমাশয়

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. বিদেশী বা সংকর জাতের গরুতে থাইলেরিওসিস বেশি হয়।

খ. রক্তের লোহিতকণিকা তেঙ্গে যায় বলে বেবেসিওসিসে রক্তপ্রস্তাব হয়।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. অল্প বয়সের বাচ্চুরকে *Babesia bigemina* ফ্লারা আক্রান্ত করে _____
মাধ্যমে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলা হয়।

খ. থাইলেরিওসিস রোগের প্রকোপ পশুর _____, আটালির উপস্থিতি ও সংখ্যার
ওপর নির্ভরশীল।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. আইমেরিয়া উসিস্ট কীভাবে দেহের বাইরে আসে?

খ. উন্নত জাতের গরুতে থাইলেরিওসিস রোগ বেশি হয় কেন?

ব্যবহারিক

পাঠ ৪.৬ পরীক্ষাগারে গোবর পরীক্ষা করে কৃমির ডিম শগান্তকরণ

এ পাঠ শেষে আপনি –



- পরীক্ষাগারে কৃমির ডিম শগান্তকরণের জন্য গোবর সংগ্রহের ধাপগুলো নিজে নিজে করে দেখাতে পারবেন।
- পরীক্ষাগারে গোবর পরীক্ষা করতে পারবেন।
- গোবরে বিদ্যমান প্রধান প্রধান ক্ষতিকারক কৃমির ডিম শগান্ত করতে পারবেন।



প্রাসঙ্গিক তথ্য

গবাদিপশুর মল বা গোবরে পরজীবীর ডিমের উপস্থিতি বা সংখ্যা নিম্নবর্ণিত উৎপাদকের বা অবস্থার ওপর নির্ভরশীল। যথা—

- ◆ আক্রমণকারী পরজীবীর প্রজাতি, সংখ্যা ও বয়স।
- ◆ আক্রান্ত পশুর মলের অবস্থা, যেমন— শক্ত, নরম, তরল বা পাতলা।
- ◆ আক্রান্ত পশুর প্রজাতি, জাত ও বয়স।

নিম্নলিখিত কারণে গবাদিপশুর মল পরীক্ষা করা হয়। যথা—

- ◆ গোল, পাতা ও ফিতা কৃমি নির্ণয় করা, এমনকী কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রজাতি নির্ণয় করা।
- ◆ কৃমির ডিমের সংখ্যা নির্ণয়ের মাধ্যমে রোগের তীব্রতা নিরূপণ করা।
- ◆ কার্যকর ওষুধ বাচ্ছাই করা।

পরীক্ষণ ১ গোবর সংগ্রহ করা

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. পলিথিন গ্লোভস— প্রয়োজনীয় সংখ্যক।
২. ৬ সে.মি. × ১০ সে.মি. পলিথিন ব্যাগ— প্রয়োজনীয় সংখ্যক।
৩. কুলবক্স বা বড় ফ্লাক্স— ১টি।
৪. ব্যবহারিক খাতা, কলম, পেসিল, রাবার, সার্পনার, ক্ষেল ইত্যাদি।

কাজের ধারা

- ◆ গরু বা মহিষের গোবর সরাসরি মলাশয় হতে সংগ্রহের জন্য পলিথিন গ্লোভস বাম হাতে পরে নিন।
- ◆ গরু নিয়ন্ত্রণ করুন। অতঃপর ডান হাতে এর লেজ উঠিয়ে মলগ্লারের ভিতর বাম হাত ঢুকিয়ে মলাশয় হতে মল হাতের মুঠোয় করে বের করে আনুন।
- ◆ এখন মুঠোর গোবর পলিথিন ব্যাগে ভরে ব্যাগের মুখ বন্ধ করে কুলবক্স বা ফ্লাক্সে করে গবেষণাগারে নিয়ে আসুন।
- ◆ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সংগ্রহীত গোবর কৃমির ডিম শগান্তকরণের জন্য পরীক্ষা করুন।
- ◆ ছাগলভেড়ার মল সংগ্রহের জন্য মলগ্লারে আঙুল ঢুকিয়ে মল বের করে আনুন। এরপর তা পলিব্যাগে ভরে মুখ বন্ধ করে দিন। পলিব্যাগটি বন্ধ কুলবক্সে রাখুন ও গবেষণাগারে পরীক্ষার জন্য নিয়ে যান।
- ◆ পুরো পরীক্ষণটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখুন ও মূল্যয়ানের জন্য তা টিউটরকে দেখিয়ে সই নিন।

গ্লোভস পরে সরাসরি মলাশয়ে
হাত ঢুকিয়ে গোবর সংগ্রহ
করতে হয়।

ডিম শণাক্তকরণ

গুণগত ও পরিমাণগত এ দুপক্ষিতে গোবর পরীক্ষা করা যায়।

গোবর পরীক্ষা করে পরজীবীর ডিম দুভাবে শণাক্ত করা যায়। যথা— ক. গুণগত (Qualitative) ও খ. পরিমাণগত (Quantitative)।

ক. গুণগত : এ পরীক্ষায় শুধু বিভিন্ন প্রকার কৃমির ডিম শণাক্ত করা যায়। সরাসরি গোবর পরীক্ষার মাধ্যমে দ্রুত রোগ নির্ণয় করার জন্য এটি সর্বাধিক জনপ্রিয় পদ্ধতি।

খ. পরিমাণগত : এ পরীক্ষা কৃমির ডিম শণাক্তসহ রোগের তীব্রতা নির্ণয়ের জন্য করা হয়। এর মাধ্যমে আক্রান্ত পশুর চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা আছে কি—না তা নির্ণয় করা যায়। এছাড়া ওষুধের কার্যকারিতা নির্ণয়েও এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

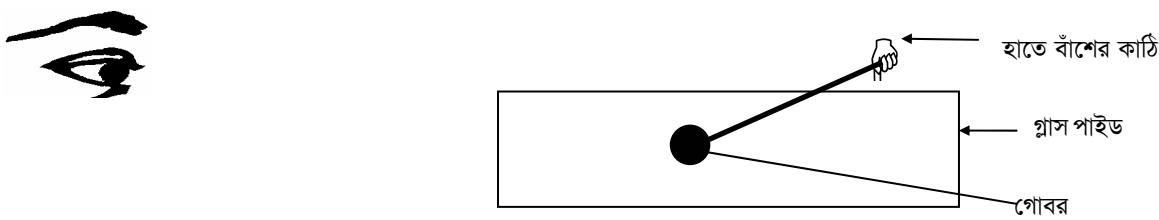
পরীক্ষণ ২ গোবরের গুণগত পরীক্ষা

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. সংগৃহীত গোবর।
২. গ্লাস পাইড।
৩. কভার পিপ।
৪. বাঁশের কাঠি।
৫. পানি।
৬. অণুবীক্ষণ যন্ত্র।
৭. ডিমের চিত্র, বর্ণনা শিট, ব্যবহারিক খাতা, কলম, পেপিল, রাবার, সার্পনার, স্কেল ইত্যাদি।

কাজের ধারা

- ◆ একটি কাঁচের পাইডের উপর মাঝখানে বাঁশের কাঠি প্লারা একফোটা পানি নিন।
- ◆ বাঁশের কাঠির আগায় গোবর লাগিয়ে কাঁচের পাইডে রাখা পানির উপর রাখুন।
- ◆ কাঠির সাহায্যে গোবরের মোটা আঁশগুলো একপাশে সরিয়ে নিন।
- ◆ প্রয়োজনে কাঠির সাহায্যে আরও পানি নিয়ে স্মিয়ার পাতলা করুন যাতে এর ভিতর দিয়ে আলো প্রবেশ করতে পারে।

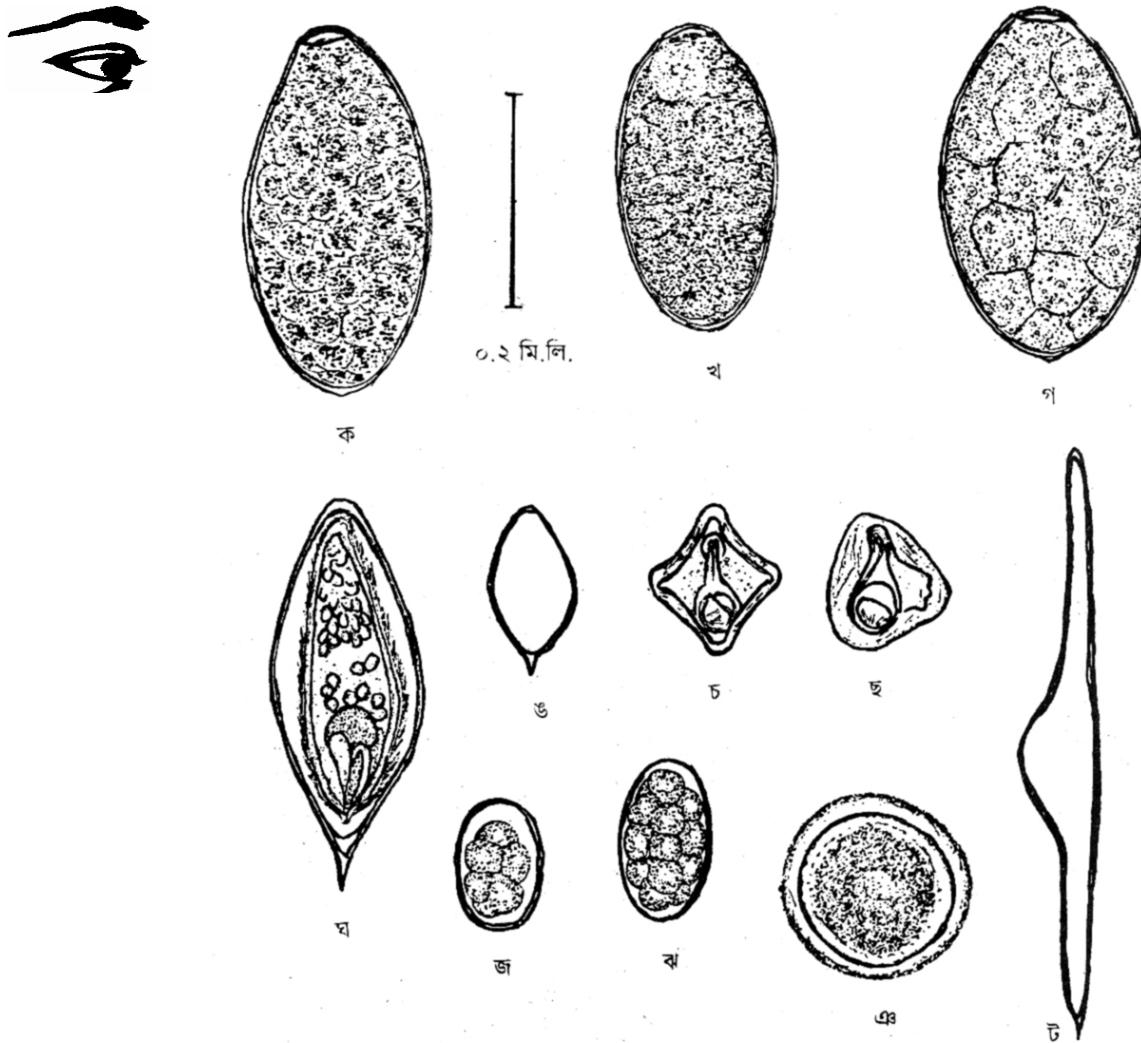


চিত্র ৪২ : গ্লাস পাইডে মলের স্মিয়ার তৈরি

- ◆ এবার স্মিয়ারের উপর কাঁচের কভার পাইড খুব সাবধানে এমনভাবে রাখুন যাতে কভার পাইডের উপর পানি উঠে না আসে।
- ◆ আলতোভাবে পাইড নিয়ে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের স্টেজে বসিয়ে দিন।
- ◆ এখন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের লেস (10x) ও আইপিস (10x) এডজাস্ট করে একদিক থেকে কভার পাইডের নিচের পুরো স্মিয়ার দেখতে থাকুন।
- ◆ এবার কৃমির ডিমের চিত্র ও বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে তা শণাক্ত করুন।
- ◆ আপনার পর্যবেক্ষণ খাতায় লিখুন।
- ◆ পুরো পরীক্ষণটি ধারাবাহিকভাবে খাতায় লিখে টিউটরকে দেখান ও তাতে সই নিন।

গবাদিপশুর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কৃমির ডিমের চিত্র ও বর্ণনা মোতাবেক শণাক্তকরণ পাতাক্ষিমি

প্যারাফিস্টেমিডি ৪ ডিমের আকার বড়, আকৃতি $145-160$ মাইক্রো মিটার (μm) \times $75-80$ μm , ডিমাক্তি, জ্বরসমৃদ্ধ, কারুকার্যখচিত, মেটে সবুজ রঙ, অপারকুলামের (Operculum) বা ঢাকনার অপরপ্রান্তে চাবি (Knob) আছে (চিত্র ৪৩ ক)।



চিত্র ৪৩ : গবাদিপশুর বিভিন্ন প্রজাতির কৃমির ডিম

ক—*Paramphistomum cervi*, খ—*Fasciola hepatica*, গ—*Fasciola gigantica* ঘ—*Schistosoma bovis*, ঙ—*Schistosoma indicum*, ঢ—*Moniezia expansa*, ছ—*Moniezia benedini*,
জ—*Haemonchus contortus*, ঝ—*Ancylostoma caninum*, ঝঝ—*Toxocara canis* ও
Schistosoma spindalis. জ—*Trichostrongylus*

ফ্যাসিওলিডি ৪ ডিমের আকার বড়, আকৃতি $150-190$ $\mu\text{m} \times 70-90$ μm (*Fasciola gigantica*—
চিত্র ৪৩ গ) এবং $130-150$ $\mu\text{m} \times 60-90$ μm (*Fasciola hepatica*—চিত্র ৪৩ খ), জ্বরসমৃদ্ধ, মেটে হলুদ
রঙ, পাতলা খোসাযুক্ত, ইয়োক সেল (Yolk Cell) বর্তমান।

সিস্টোসোমাটিডি ৪ ডিম লম্বা ডিষ্টাকৃতি, জনসমৃদ্ধ, প্রান্ত ও পার্শ্ব কঁটা বা স্পাইন বিদ্যমান, প্রজাতিভেদে ডিমের আকার ভিন্ন হয়। যেমন—

Schistosoma bovis— ডিম স্পিন্ডল আকারের, আকৃতি $182\text{--}247 \mu\text{m} \times 60 \mu\text{m}$, ডিমের সামনের প্রান্তে স্পাইন (Spine) আছে। ডিমের ভিতর মিরাসিডিয়াম বিদ্যমান থাকে (চিত্র ৪৩ ঘ)।

S. indicum— ডিম ডিষ্টাকৃতির, আকৃতি $57\text{--}140 \mu\text{m} \times 60 \mu\text{m}$, ডিমের সামনের প্রান্তে স্পাইন আছে। ডিমের ভিতর মিরাসিডিয়াম বিদ্যমান থাকে (চিত্র ৪৩ গ)।

S. spindalis— ডিম লম্বা আকারের, আকৃতি $160\text{--}400 \mu\text{m} \times 60 \mu\text{m}$, ডিমের দুই প্রান্তই চাপা, এক প্রান্তে স্পাইন আছে মাঝখানে কিছুটা ডিষ্টাকৃতির। ডিমের ভিতর মিরাসিডিয়াম বিদ্যমান থাকে (চিত্র ৪৩ ট)।

ফিতাকৃমি

Moniezia expansa ও *Moniezia benedini*— ডিম পিয়ার আকারের (Pear Shaped), খোসা তিন স্তরবিশিষ্ট, পাইরিফরম (Pyriform), অ্যাপারেটাসের ভিতর আড়াআড়ি ছক অবস্থিত (চিত্র ৪৩ চ ও ছ)।

নেমাটোড

Toxocara— নিষিক্ত ডিম গোল ও সোনালি রঙের, মোটা খোসাযুক্ত, বাইরের আবরণ জিকজাক (চিত্র ৪৩ T)।

Hookworm (*Anchyllostoma caninum*)— হালকা, পাতলা, ওভয়েড আকারের ডিমে ২–৮টি বড় ঘন কালো ব্লাস্টোমেয়ারিস (Blastomeres) বর্তমান (চিত্র ৪৩ বা)।

Stomach worm (*Haemonchus contortus*)— ইলিপটিক্যাল ডিম $100 \mu\text{m}$ এর চেয়ে কম লম্বা। খোসা পাতলা, মসৃণ, জ্বনে পরিপূর্ণ এবং ২৪–২৬টি ব্লাস্টোমেয়ার দেখা যায় (চিত্র ৪৩ R)।

ব্যবহারিক

পাঠ ৪.৭ পশুর বহিঃপরজীবী দমনে ওষুধ প্রয়োগ

এ পাঠ শেষে আপনি –

- বহিঃপরজীবী দমনে ওষুধ প্রয়োগের বিভিন্ন পদ্ধতি বলতে পারবেন।
- বহিঃপরজীবী দমনে গবাদিপশুর দেহে নিজ হাতে ওষুধ প্রয়োগ করতে পারবেন।



পশুর বহিঃপরজীবী দমনের জন্য
যে ওষুধ প্রয়োগ করা হয় তাকে
বহিঃপরজীবী নাশক বলে।

সাধারণত ডিপিং ভেট, স্প্রে ও
হাতের সাহায্যে বহিঃপরজীবী,
নাশক প্রয়োগ করা হয়। তবে,
হাতে বহিঃপরজীবীনাশক
প্রয়োগ সর্বাধিক কার্যকর স্বাক্ষরী
পদ্ধতি।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

বহিঃপরজীবী দমনে যেসব ওষুধ ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে বহিঃপরজীবীনাশক বলে। বহিঃপরজীবীনাশক সাধারণত গবাদিপশুর চামড়ার উপরে বা লোমে ব্যবহার বা প্রয়োগ করে বহিঃপরজীবী মেরে ফেলা হয়। কোনো কোনো ওষুধ ইনজেকশন হিসেবে বা খাওয়ানোর মাধ্যমে আটালিজনিত রোগ মেঝে, মায়াসিস ইত্যাদির চিকিৎসা করা হয়।

উপরি প্রয়োগ পদ্ধতিতে বহিঃপরজীবীনাশক কর্তব্যে পশুদেহে ব্যবহার করা যায় তা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। যেসব কার্যোপযোগী পদ্ধতিতে গবাদিপশুর শরীরে বহিঃপরজীবীনাশক প্রয়োগ করা হয় তা হচ্ছে—

- ক. ডিপিং ভেট : ডিপিং ভেট হচ্ছে ট্যাক্সের পানিমিশ্রিত ওষুধে ডুবিয়ে আক্রান্ত পশুতে গোসল করানো। বড় খামার বা সাধারণের ব্যবহার উপযোগী স্থানে এ ট্যাক্স তৈরি করা হয়।
- খ. স্প্রে : স্প্রে সর্বাধিক জনপ্রিয় প্রায়োগিক বহিঃপরজীবীনাশক ব্যবহার পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে সহজে বহিঃপরজীবীনাশক স্প্রে মেশিনের সাহায্যে গবাদিপশুর শরীরে স্প্রে করে উকুন, আটালি, মাইট ইত্যাদি দমন করা হয়।
- গ. হাত দিয়ে ওষুধ প্রয়োগ : এ পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো—

সুবিধা

- ◆ হাত দিয়ে বহিঃপরজীবীনাশক ওষুধ লাগানো সর্বাধিক কার্যকর ও স্বাক্ষরী পদ্ধতি।
- ◆ এ পদ্ধতিতে বহিঃপরজীবীনাশক ওষুধ শরীরের যে কোনো স্থানে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব।
- ◆ ডিপিং বা স্প্রের সাহায্যে যেসব স্থানে বহিঃপরজীবীনাশক পৌঁছানো সম্ভব হয় না হাতের সাহায্যে সেসব স্থানে তা পৌঁছান যায়।
- ◆ পশুর শরীরের ক্ষত বাঁচিয়ে বহিঃপরজীবীনাশক প্রয়োগ করা যায়।
- ◆ পানি, পাউডার, ধূলোবালি বা ছাইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে বহিঃপরজীবীনাশক ব্যবহার করা সম্ভব।

অসুবিধা

- ◆ একসঙ্গে বেশি গবাদিপশুতে প্রয়োগ করা কঠিন।
- ◆ প্রয়োগকারীকে অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়।
- ◆ পশুকে জোর করে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. আটালি, উকুন বা মাইটে আক্রান্ত গরু— ১টি।
২. যন্ত্রপাতি—
 - ক. প্লাস্টিকের বালতি (১৬ লিটার সাইজের) — ২টি।
 - খ. পলিথিনের গ্লোভস (লম্বা) — ১টি।
 - গ. প্লাস্টিকের মগ (১ লিটার সাইজের) — ১টি।
 - ঘ. ১ মিটার লম্বা বাঁশের লাঠি — ১টি।
- ঙ. গরুর মুখ বন্ধ রাখার টোপা বা মাস্ক — ৩টি।

চ. পঞ্জ (১০ সে.মি. লম্বা, ১০ সে.মি. চওড়া ও ২ সে.মি. পুরু) বা গেঁজের নেকড়া (১টি বড় মোটা সুতি গেঁজের আকারের)— ১টি ।

৩. রাসায়নিক দ্রব্য—

ক. বহিঃপরজীবীনাশক, যেমন— অ্যাসানটেল পাটডার, কুমোফস (বায়ার) ১৫ গ্রামের ১টি প্যাকেট ।

খ. সাবান, পরিষ্কার ঠাণ্ডা পানি ইত্যাদি ।

৪. ব্যবহারিক খাতা, কলম, পেপিল, রাবার, সাপর্নার, ক্ষেল ইত্যাদি ।

কাজের ধারা

হাতের সাহায্যে কীটনাশক প্রয়োগ করার জন্য বালতিতে পরিমাণমতো ওষুধমিশ্রিত পানি নিয়ে স্পঞ্জের সাহায্যে পশুর শরীর ভিজিয়ে দিয়ে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি সাবধানে পরিষ্কার করে রাখতে হবে ।

- ◆ প্রথমে একটি গরুকে টোপা বা মাঝ পড়িয়ে দিয়ে ট্রাভিসে বা শক্ত খুঁটিতে ভালোভাবে আটকিয়ে নিন ।
- ◆ একটি বালতিতে মগের সাহায্যে ১ লিটার পানি নিন ।
- ◆ এবার ডান হাতে প্লাস্টিকের গ্লোভস্টি পরে নিন এবং গামছা দিয়ে নাকমুখ ঢেকে বেঁধে নিন ।
- ◆ এখন ওষুধের প্যাকেটের এককোণা ছিঁড়ে সাবধানে সম্পূর্ণ ওষুধ বালতির পানিতে ঢেলে দিন ।
- ◆ বাঁশের লাঠির সাহায্যে ধীরে ধীরে নেড়ে পানিতে ভালো করে ওষুধ মিশান ।
- ◆ মগের সাহায্যে আস্তে আস্তে পানি মিশিয়ে ১৫ লিটার পর্যন্ত পূর্ণ করুন ।
- ◆ আবার কাঠি দিয়ে ভালো করে পানিমিশ্রিত ওষুধ ঘুটে মগে করে বাম হাতে ধরে গরুর কাছে নিন ।
- ◆ ডান হাত দিয়ে স্পঞ্জ বা নেকড়া ভিজিয়ে গরুর শরীরের লোমযুক্ত স্থান ভিজিয়ে দিন । এভাবে গরুটিতে ওষুধ লাগান ।
- ◆ গরুর শরীর শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করুন ।
- ◆ এবার গরুর মুখের টোপা বা মাঝ খুলে দিন ।
- ◆ এরপর হাতের গ্লোভস ও মুখের গামছা খুলে সাবান দিয়ে হাতমুখ পরিষ্কার করুন ।
- ◆ এবার ওষুধের ছেঁড়া প্যাকেট, ব্যবহৃত গ্লোভস ও ওষুধমিশ্রিত অতিরিক্ত পানি মাটির গর্তের মধ্যে ফেলে মাটিচাপা দিন ।
- ◆ এ গর্তের উপর বালতি মগ ইত্যাদি ধূয়ে গর্তে মাটিচাপা দিন এবং মগ ও বালতি পরবর্তী ব্যবহারের জন্য নিরাপদ স্থানে রেখে দিন ।
- ◆ এবার সাবান দিয়ে নিজে ভালো করে গোসল করে নিন ।
- ◆ কাজের ধাপগুলো ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখুন ও টিউটরকে দেখিয়ে তাতে সহ নিন ।

সাবধানতা

- ◆ ওষুধের প্যাকেট/বোতল, ব্যবহৃত মগ, বালতি, মানুষ বা পশুর খাদ্যদ্রব্যের ঘরে মজুদ রাখা যাবে না ।
- ◆ পশুর শরীরের কোথাও ঘা বা ক্ষত থাকলে সেখানে যাতে ওষুধ না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে ।
- ◆ প্রয়োগকারীর হাতে কোনো কাটা বা ক্ষত থাকলে তিনি ওষুধ প্রয়োগ করতে পারবেন না ।
- ◆ অসাবধানতাবশত বিষক্রিয়া হলে ১% অ্যাট্রোপিন সালফেট মাংসে ইনজেকশন দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে । এ ওষুধের মাত্রা নিম্নরূপ—

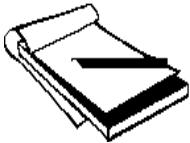
মানুষ : ০.২ মিলিলিটার ।

গরু : ৮—১০ মিলিলিটার ।

বাচ্চুর/ছাগল/ভেড়া : ২—৫ মিলিলিটার ।

প্রয়োজনে ১—২ ঘন্টা পরপর ইকজেকশন পুনরায় প্রয়োগ করতে হয় ।

বিষক্রিয়া হলে সাথে সাথে ১% অ্যাট্রোফিন সালফেট দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে ।



চূড়ান্ত মূল্যায়ন - ইউনিট ৪

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন

- ১। পরজীবী কী? এরা কত প্রকার ও কী কী?
- ২। অস্তঃ পরজীবীকে কয়টি পর্বে ভাগ করা হয়েছে ও কী কী?
- ৩। *Fasciola* ও *Schistosoma* গণের ৫টি মাধ্যমিক পোষকের নাম লিখুন।
- ৪। পাতাকুমির জীবনচক্র সংক্ষিপ্ত আকারে লিখুন।
- ৫। যে কোনো একটি গোলকুমির জীবনচক্র সংক্ষেপে লিখুন।
- ৬। অস্তঃ পরজীবীর অপকারিতা বর্ণনা করুন।
- ৭। ফ্যাসিওলিয়াসিস রোগের লক্ষণগুলো কী?
- ৮। ন্যাজাল সিস্টোসোমিয়াসিস রোগের প্রধান প্রধান উপসর্গের বর্ণনা করুন।
- ৯। প্যারাসাইটিক গ্যাস্ট্রো-এস্টারাইটিস রোগের লক্ষণ কী?
- ১০। হাম্পসোর ও মায়াসিস কী?
- ১১। গবাদিপশুর জাতের সাথে পরজীবী রোগের প্রকোপের সম্পর্ক সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
- ১২। এদেশের গবাদিপশু কেন পরজীবীতে বেশি আক্রান্ত হয়?
- ১৩। সংক্ষেপে কৃমি দমন কোশল বর্ণনা করুন।
- ১৪। কী উদ্দেশ্যে নিয়ে গবাদিপশুর কৃমির চিকিৎসা করতে হয় তা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
- ১৫। সংক্ষেপে আটালি দমন পদ্ধতি বর্ণনা করুন।



উত্তরমালা - ইউনিট ৪

পাঠ ৪.১

- | | | | | | |
|----------------|------------|-----------------|----------|--------------|-------|
| ১। ক. ii | ১। খ. iii | ২। ক. স | ২। খ. মি | ৩। ক. Sucker | ৩। L. |
| মেটাসারকারিয়া | ৪। ক. মাছি | ৪। খ. কেঁচোকুমি | | | |

পাঠ ৪.২

- | | | | | | |
|---------------|------------|---------|----------|------------------|-------------|
| ১। ক. iv | ১। খ. iii | ২। ক. স | ২। খ. মি | ৩। ক. কর্ষণশক্তি | ৩। খ. ঘাসের |
| ৪। ক. তিনভাবে | ৪। খ. দুটো | | | | |

পাঠ ৪.৩

- | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|---------|----------|----------------------|---------------|
| ১। ক. iii | ১। খ. iv | ২। ক. স | ২। খ. মি | ৩। ক. <i>Tabanus</i> | ৩। খ. Diptera |
| ৪। ক. নির্দিষ্ট পোষকের জন্য | ৪। খ. Maggot | | | | |

পাঠ ৪.৪

- | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------|-------------|
| ১। ক. iii | ১। খ. iv | ২। ক. স | ২। খ. স | ৩। ক. মায়াসিস | ৩। খ. লালার |
| ৪। ক. শীতকালে | ৪। খ. আটালিনাশকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন রহিত করার জন্য | | | | |

পাঠ ৪.৫

- | | | | | | |
|----------|-----------------|----------------------------------|---------|--------------------------|-------|
| ১। ক. ii | ১। খ. iv | ২। ক. স | ২। খ. স | ৩। ক. পূর্বশণাত্ত্বকরণের | ৩। খ. |
| জাত | ৪। ক. মলের সাথে | ৪। খ. এদের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কম | | | |

ইউনিট ৫ অপুষ্টিজনিত ও প্রজননসংক্রান্ত রোগ

ইউনিট ৫ অপুষ্টিজনিত ও প্রজননসংক্রান্ত রোগ

পশুর উৎপাদন ক্ষমতা প্রধানত জাতের ওপর নির্ভরশীল। তবে, উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ ও যথাযথভাবে উৎপাদন পাওয়ার জন্য অবশ্যই পর্যাপ্ত খাদ্যের প্রয়োজন। পশু পালনের মোট খরচের সিংহভাগই খাদ্যবাবদ হয়। তাই পশু পালন ব্যবসা লাভজনক করতে হলে সুষম খাদ্য নির্বাচন ও খাদ্যের মূল্যের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। খাদ্যের পুষ্টি উপাদান, যেমন— আমিষ, শর্করা, হেপদার্থ, ভিটামিন, খণ্ডিজ ও পানির যে কোমোটির অভাবে পশু অপুষ্টিতে ভোগে এবং সুনির্দিষ্ট খাদ্য উপাদানের অভাবে বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি হয়। খাদ্যের অন্যান্য উপাদানের তুলনায় ভিটামিন ও খণ্ডিজপদার্থ অত্যন্ত কম পরিমাণে প্রয়োজন হয়। কিন্তু, এ কম পরিমাণেও যদি সঠিকভাবে সরবরাহ করা না হয় অর্থাৎ যদি কোনো কারণে এগুলোর অভাব ঘটে তবে পশুর দেহে বিভিন্ন রোগ দেখা দেয় যা পশুর স্বাস্থ্য খারাপ করে, উৎপাদন কমিয়ে দেয়, এমনকী পশু মারাও যেতে পারে। তাই কৃষকের গোয়ালে বা খামারে পশু যাতে অপুষ্টিতে না ভোগে সেদিকে পূর্ব থেকেই লক্ষ্য রাখতে হবে। অপুষ্টি ছাড়াও পশু পালনে অন্য একটি বড় সমস্যা হলো এদের প্রজননসংক্রান্ত রোগব্যাধি। গবাদিপশুর বিভিন্ন ধরনের প্রজননসংক্রান্ত রোগব্যাধির মধ্যে অনুর্বরতা, গরম না হওয়া, পুনঃপুনঃ গরম হওয়া, গর্ভপাত, জরায়ুর বিভিন্ন ক্ষত বা আঘাত, জরায়ুপ্রদাহ, জরায়ুগ্রীবা প্রদাহ, জরায়ু পাক, যৌনপ্রদাহ, ক্রসেলোসিস, ভিট্রিওসিস, ট্রাইকোমেনিয়াসিস, শুক্রাশয়প্রদাহ, বীর্যস্থলী প্রদাহ, ব্যালানোপসথাইটিস ইত্যাদি প্রধান। আমাদের দেশে গবাদিপশুর অনুর্বরতা এক বিরাট সমস্যা। তাই পশু চিকিৎসা ও পশু পালনের ক্ষেত্রে এটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ক্রটিপূর্ণ খাদ্য ও পশু পালন ব্যবস্থা, বিভিন্ন প্রকার রোগব্যাধি, জন্মগত ও বংশগত ক্রটিবিচুতি, প্রতিকূল পরিবেশ প্রভৃতি নানা কারণে অনুর্বরতার সৃষ্টি হতে পারে। বাংলাদেশে প্রায় ৩৭% গাড়ী অনুর্বর হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এ কারণেই প্রতিবছর এদেশে প্রায় ৪৭ কোটি টাকার ক্ষতি হয়। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অনুর্বরতা বহুলাংশে দূর করা সম্ভব।

এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে পশুর ভিটামিন ও খণ্ডিজের অভাবজনিত রোগ, অনুর্বরতা, পশুর জনন অঙ্গের বিভিন্ন রোগ ও প্রতিকার, জনন অঙ্গে ওষুধ প্রয়োগ প্রভৃতি বিষয়গুলো তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিকসহ আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ৫.১ ভিটামিনের অভাবজনিত রোগ ও প্রতিরোধ

এ পাঠ শেষে আপনি –

- পশুদেহে যেসব ভিটামিনের অভাব দেখা দেয় সেগুলোর নাম বলতে পারবেন।
- ভিটামিনের অভাবে সৃষ্টি রোগ, রোগের কারণ ও লক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- ভিটামিনের অভাবজনিত রোগের চিকিৎসা ও প্রতিরোধ বর্ণনা করতে পারবেন।



দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অতি অল্প পরিমাণে ভিটামিনের প্রয়োজন। প্রাণীদেহের জন্য অন্যান্য খাদ্যোপাদান পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ করেও ভিটামিন ছাড়া জীবন রক্ষা করা সম্ভব নয়।

ভিটামিনের অভাব (Vitamin Deficiencies)

খাদ্যের ছাটি উপাদানের মধ্যে ভিটামিন একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অতি অল্প পরিমাণে ভিটামিনের প্রয়োজন হয়। প্রাণীদেহের জন্য পর্যাপ্ত আমিষ, শর্করা, হেপদার্থ, খণ্ডিজপদার্থ ও পানি খাদ্যের সাথে সরবরাহ করেও ভিটামিন ছাড়া জীবন রক্ষা করা সম্ভব নয়। ভিটামিন দুপ্রকার। যথা— চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন, যেমন— ভিটামিন এ, ডি, ই ও কে এবং পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন, যেমন— ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ও ভিটামিন সি। ভিটামিন সি প্রায় সব পশুর দেহেই সংশ্লেষিত হয়। আর নিকোটিনিক অ্যাসিড ছাড়া ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের অন্যান্য প্রায় সব ভিটামিনই রোম্বুক পশুর ক্রমেনের জীবাণু অথবা অরোম্বুক পশুর সিকামের জীবাণু সংশ্লেষণ করতে পারে। তাই গবাদিপশুদের ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ও ভিটামিন সি সরবরাহের প্রয়োজন হয় না এবং এসব পশুতে সাধারণত এসব ভিটামিনের অভাব হয় না। কিন্তু খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ না

করলে গবাদিপশুতে চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিনগুলোর অভাবজনিত লক্ষণ প্রকাশ পায়। তাই এ পাঠে পশুতে চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিনগুলোর অভাবজনিত রোগ ও তার প্রতিকার আলোচনা করা হয়েছে।

পশুর চোখের দৃষ্টি, দৈহিক বৃদ্ধি, অক্সের মস্তিষ্ক রক্ষা, প্রজনন, স্নায়ুতন্ত্র ঠিক রাখা প্রভৃতির জন্য ভিটামিন এ একান্ত জরুরি। ভিটামিন এ এর অভাবজনিত অবস্থাকে হাইপোভিটামিনোসিস এ বলে।

ভিটামিন এ এর অভাবজনিত রোগ (Vitamin A Deficiency)

পশুর খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন এ এর প্রয়োজন রয়েছে। কারণ, পশুর চোখের দৃষ্টি, দৈহিক বৃদ্ধি, অক্সের মস্তিষ্ক রক্ষা, প্রজনন, স্নায়ুতন্ত্র ঠিক রাখা প্রভৃতির জন্য ভিটামিন এ একান্ত জরুরি। ভিটামিন এ উদ্দিদে ক্যারোটিন অবস্থায় থাকে যার কিছু অংশ অন্ত্রের এপিথেলিয়াল কোষে (Epithelial Cell) ভিটামিন এ তে রূপান্তরিত হয়। এছাড়াও কিছু অংশ যকৃতে রূপান্তরিত হয়। ভিটামিন এ এর অভাবজনিত অবস্থাকে হাইপোভিটামিনোসিস এ (Hypovitaminosis A) বলে। প্রায় সব বয়সের গবাদি পশুতে এ ভিটামিনের অভাবজনিত লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে।

অভাবের কারণ

নিম্নলিখিত কারণে গবাদি পশুতে ভিটামিন এ এর অভাব হতে পারে। যেমন—

- ◆ খাদ্যে ভিটামিন এ বা ক্যারোটিনের অভাব। এটিই প্রাথমিক কারণ।
- ◆ খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও হজম, শোষণ ও বিপাকক্রিয়ায় কোনো ক্রটি থাকলে।
- ◆ ক্ষুদ্রান্ত্র ও যকৃতে দীর্ঘমেয়াদী রোগ হলে।
- ◆ গর্ভবতী পশুতে ভিটামিন এ এর অভাব থাকলে নবজাতক বাচ্চায় অভাব দেখা দিতে পারে।
- ◆ পশুর খাদ্যে সবুজ ঘাসের অভাব ঘটলে।
- ◆ মিশ্রিত খাদ্যে ভিটামিন এ অক্সিডেশন হয়ে নষ্ট হলে।

লক্ষণ

ভিটামিন এ এর অভাবে পশুতে নিম্নলিখিত রোগলক্ষণ প্রকাশ পায়। যেমন—

- ◆ ভিটামিন এ এর অভাবে রোডপসিন পুনরুৎপাদন হয় না। ফলে রাতকানা রোগ দেখা দেয়। তাছাড়া এ রোগে গরুর অত্যধিক অশ্রুপাত হয়।
- ◆ কুকুরে ও বাচ্চুরের কর্ণিয়া পুরু হয়, চোখের পর্দা ঘোলাটে হয়ে যায়। অন্যান্য পশুতে কর্ণিয়া থেকে পাতলা ও আঁষার মতো তরল পদার্থ নিঃস্পৃত হয়, কর্ণিয়া পুরু হয়ে যায়, পর্দা ঘোলাটে হয়, ক্ষত ও আলোকাতঙ্ক হয়। এ অবস্থাকে অক্ষিবিল্লির শুক্রপদাহ বা জেরোপথ্যালমিয়া (Xerophthalmia) বলে।
- ◆ লোম খসখসে হয়ে যায়। ত্বক মস্তিষ্ক হারায়, ত্বকে তুষসদৃশ আঁশ পড়ে।
- ◆ জনন ক্ষমতা হ্রাস পায়। পুরুষ পশুর শুক্রাণু উৎপাদন হ্রাস পায় এবং স্ত্রী পশুতে গর্ভপাত, দুর্বল বা মৃত বাচ্চা প্রসব ও গর্ভফুল আটকে যাওয়ার ঘটনা ঘটে।
- ◆ কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র বিনষ্ট হয়। ফলে ঐচ্ছিক মাংসপেশির পক্ষাঘাত, মস্তিষ্ক বৈকল্য, অন্ধত্ব ইত্যাদি দেখা যায়।
- ◆ বিভিন্ন পশুর বাচ্চা জন্মাগত ক্রটি, যেমন— অন্ধত্ব, মস্তিষ্ক বৈকল্য ইত্যাদি নিয়ে জন্মায়।
- ◆ অস্থি দুর্বল ও স্ফীত হয়।

রোগ নির্ণয়

রোগের ইতিহাস ও লক্ষণ দেখে প্রাথমিকভাবে এ রোগ অনুমান করা যায়।

চিকিৎসা ও প্রতিরোধ

চিকিৎসা ও প্রতিরোধ নিম্নলিখিতভাবে করতে হবে। যথা—

- ◆ বাজারে আজকাল বিভিন্ন কোম্পানির ভিটামিন এ, ডি, ই পাওয়া যায়। এগুলো নির্দিষ্ট মাত্রায় খাওয়ানো যায় বা ইনজেকশন হিসেবে প্রয়োগ করা যায়।
- ◆ বাচুরের চোখ ও স্নায়ুর উপসর্গ দূর করার জন্য গাভীর মাংসপেশিতে এক লক্ষ ইউনিট ভিটামিন এ প্রত্যেহ একটি করে ২-৩ দিন দিলেই সুফল পাওয়া যায়।
- ◆ প্রতিরোধের জন্য প্রায় সকল প্রজাতির পশুকে দৈনিক প্রতি কেজি ওজনের জন্য কমপক্ষে ৪০ ইউনিট ভিটামিন এ খাওয়াতে হবে।
- ◆ খাওয়ানোর বিকল্প হিসেবে দুমাস পরপর প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ৩০০০-৬০০০ ইউনিট ভিটামিন এ মাংসপেশিতে ইনজেকশন দিলে রোগ প্রতিরোধ হবে।
- ◆ এছাড়াও পশুকে নিয়মিত ও পরিমিত ভিটামিন এ সমৃদ্ধ কাঁচা ঘাস, সবুজ শাকশবাজি সরবরাহ করতে হবে।

ভিটামিন ডি এর অভাবজনিত রোগ (Vitamin D Deficiency)

ভিটামিন ডি এর অভাবে পশুর ক্ষুধামন্দা, দৈহিক ওজন হ্রাস এবং শেষ পর্যায়ে অস্টিওডিস্ট্রফি রোগ হয়।

ভিটামিন ডি একটি রিকেট (Ricket) নিরারক জটিল উপাদান। ভিটামিন ডি এর বিভিন্ন গঠন বা ফর্ম (Form) রয়েছে। যেমন— ভিটামিন ডি_১, ভিটামিন ডি_২, ভিটামিন ডি_৩, ভিটামিন ডি_৫ ইত্যাদি। তবে, এরমধ্যে পশুর জন্য ভিটামিন ডি_৩ বা কোলেক্যালসিফেরল (Cholecalciferol) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্তন্যপায়ী প্রাণীর দেহত্বকে সূর্যরশ্মির সক্রিয়তায় প্রোভিটামিন থেকে ভিটামিন ডি সংশ্লিষ্ট হয়। ভিটামিন ডি, পশুর দেহে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস বিপাকে সাহায্য করে। ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস গবাদিপশুর দেহের অস্থি মিনারালাইজেশন ও গঠনের কার্যসম্পাদন করে। ভিটামিন ডি এর অভাবে পশুর ক্ষুধামন্দা, দৈহিক ওজন হ্রাস এবং শেষ পর্যায়ে অস্টিওডিস্ট্রফি (Osteodystrophy) রোগ হয়।

কারণ

- ◆ পশুর খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাদ্য বা ভিটামিন ডি_৩ সরবরাহ না করলে।
- ◆ পশুর দেহে, বিশেষত আবদ্ধাবস্থায় পালিত পশুতে, অপর্যাপ্ত সূর্যালোকের জন্য।
- ◆ খাদ্যে অক্রিডেশন হয়ে ভিটামিন ডি নষ্ট হলে।

লক্ষণ

- ◆ ক্ষুধামন্দা, দৈহিক বৃদ্ধি এবং ওজন হ্রাস পায়।
- ◆ প্রাণ্তবয়ক্ত পশুর প্রজনন ক্ষমতা ও উর্বরতাহ্রাস পায়।
- ◆ ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অভাবের মতো রিকেট সৃষ্টি হয়। অস্থি ভঙ্গুর হয় ও চাপে বেঁকে যায়।
- ◆ বাচুরের হাঁটু ও পিছনের পায়ের হক সঞ্চি (Hock Joint) ফুলে উঠে।
- ◆ প্রাণ্তবয়ক্ত পশুর অস্টিওমেলাসিয়া (Osteomalacia) রোগ হয়।

রোগ নির্ণয়

- ◆ ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ দেখে।
- ◆ ভিটামিন ডি দিয়ে চিকিৎসা করে সুফল দেখে রোগ শণাক্ত করা যায়।

চিকিৎসা ও প্রতিরোধ

- ◆ প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য প্রত্যেহ ৭-১২ ইউনিট হিসেবে ভিটামিন ডি ইনজেকশন আকারে প্রয়োগ করতে হবে। তবে, অতিরিক্ত মাত্রায় প্রয়োগে বিষক্রিয়া ঘটতে পারে।
- ◆ পশুকে পর্যাপ্ত পরিমাণে রোদ্রে শুকানো ঘাস বা হে (Hay) সরবরাহ করতে হবে।

প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য প্রত্যেহ ৭-১২ ইউনিট হিসেবে ভিটামিন ডি ইনজেকশন দিতে হবে। অতিরিক্ত মাত্রায় প্রয়োগে বিষক্রিয়া ঘটতে পারে।

- ◆ যদিও এদেশের গবাদিপশু সাধারণত সুর্যের আলো থেকে বঞ্চিত হয় না, তথাপি খামারে আবদ্ধাবস্থায় পালিত পশু যেন পর্যাপ্ত সূর্যালোক পায় সে ব্যবস্থা করতে হবে।
- ◆ খাদ্যে যেন সঠিক অনুপাতে ভিটামিন ডি এর সাথে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

ভিটামিন ই এর অভাবজনিত রোগ (Vitamin E Deficiency)

পশুর দেহের প্রজনন ক্ষমতা এবং বন্ধ্যাত্ম প্রতিরোধে ভিটামিন ই অত্যাবশ্যকীয়।

পশুর দেহের প্রজনন ক্ষমতা এবং বন্ধ্যাত্ম প্রতিরোধে ভিটামিন ই অত্যাবশ্যকীয়। ভিটামিন ই জারণ—প্রতিরোধী (Anti oxidant) হিসেবে কাজ করে। এটি শরীরের বিভিন্ন কোষ ও কলা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে। ভিটামিন সি ও কো-এনজাইনস সংশ্লেষণ করে এবং নিউক্লিক অ্যাসিড ও সালফারযুক্ত অ্যামাইনো অ্যাসিড বিপাকে অংশ নেয়। তাছাড়া এটি দেহে সেলেনিয়ামের কার্যকারিতা ঠিক রাখে। কাজেই খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন ই না থাকলে পশুর দেহে এর অভাবজনিত রোগলক্ষণ প্রকাশ পাবে।

অভাবের কারণ

নিম্নলিখিত কারণে পশুদেহে ভিটামিন ই এর অভাব ঘটতে পারে না। যেমন—

- ◆ খাদ্যে ফ্যাটি অ্যাসিডের জারণ ঘটলে।
- ◆ খাদ্যে অপর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন ই সরবরাহ করলে।
- ◆ খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে সেলেনিয়াম না থাকলে।

লক্ষণ

ভিটামিন ই এর অভাবে প্রধানত তিন ধরনের লক্ষণ প্রকাশ পায়। যথা—

- ◆ পশুর জনন অকৃতকার্যতা দেখা দেয়।
- ◆ বিভিন্ন অঙ্গ, যেমন— ঘৃকতে নেক্রোসিস, রক্তের প্রোটিনহাস, বৃক্কের অবক্ষয় ইত্যাদি ঘটে।
- ◆ অপুষ্টিজনিত পেশি রোগ বা নিউট্রিশনাল মায়োপ্যাথি (Nutritional Myopathy) হয়। এতে প্রধানত কঙ্কাল ও হৎপেশি আক্রান্ত হয়। কারণ ও আক্রান্ত পেশি অনুযায়ী রোগের নামকরণ করা হয়। যেমন— হোয়াইট মাসল ডিজিজ, নিউট্রিশনাল মাসকুলার ডিস্ট্রিফি ইত্যাদি। গরু, ছাগল ও ভেড়ায় এ রোগ বেশি হয়।

রোগ নির্ণয়

ইতিহাস ও রোগের লক্ষণ দেখে অনুমান করা যায়।

চিকিৎসা ও প্রতিরোধ

- ◆ প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ই সমৃদ্ধ সবুজ খাদ্য ও শস্যদানা সরবরাহ করতে হবে।
- ◆ নির্ধারিত মাত্রায় পশুখাদ্যে ভিটামিন ই প্রিপারেশন (যেমন— ভিটামিন এ.ডি.ই. দ্রবণ) যোগ করতে হবে।
- ◆ খাদ্যে প্রয়োজনীয় মাত্রায় সেলেনিয়াম যোগ করতে হবে।
- ◆ খাদ্য সংরক্ষণের জন্য অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ব্যবহার করতে হবে।

ভিটামিন কে এর অভাবজনিত রোগ (Vitamin K Deficiency)

ভিটামিন কে হলো ‘রক্তক্ষরণ বন্ধকরণ’ ভিটামিন (Blood Clotting Vitamin)। রক্ত জমাট বাঁধার জন্য প্রোথ্রোফিন প্রয়োজন। ভিটামিন কে প্রোথ্রোফিন সৃষ্টির কো-এনজাইম হিসেবে কাজ করে।

ভিটামিন কে হলো ‘রক্তক্ষরণ বন্ধকরণ’ ভিটামিন।

অভাবের কারণ

- ◆ খাদ্যে অপর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন কে থাকলে ।
- ◆ অনেকদিন ধরে অ্যাস্টিবায়োটিক ওষুধ সেবন করলে অঙ্গের উপকারী জীবাণু যারা ভিটামিন কে তৈরিতে সাহায্য করে তারা ধৰ্ষণ হয় ।
- ◆ খাদ্য অনেকদিন রেখে দিলে খাদ্যমধ্যস্থিতি ভিটামিন কে নষ্ট হয় ।

লক্ষণ

ভিটামিন কে এর অভাবে
রক্ষণশৰণ বন্ধ হয় না ।

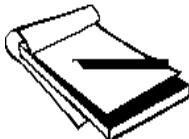
- ◆ শরীরের কোনো অংশ কেটে গেলে সহজে রক্তপাত বন্ধ হয় না অথবা বন্ধ হতে সময় লাগে ।
- ◆ অঙ্গেপচারের সময় সহজে রক্ষণশৰণ বন্ধ হয় না ।

রোগ নির্ণয়

রোগলক্ষণ দেখে প্রাথমিকভাবে রোগ নির্ণয় করা যায় ।

চিকিৎসা ও প্রতিরোধ

- ◆ খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন কে সরবরাহ করতে হবে ।
- ◆ বাঁধাকপি, ফুলকপি, শাকশবজি, গমের ভুশি ইত্যাদি সরবরাহ করতে হবে ।
- ◆ আক্রান্ত পশুর মাংসপেশিতে ও মি.লি./কেজি হিসেবে ভিটামিন কে একবার ইনজেকশন আকারে প্রয়োগ করা যায় ।
- ◆ তাছাড়া প্রতি কেজি খাদ্যে ২৫ মি.লি. হিসেবে মিশিয়ে ৪ দিন পর্যন্ত খাওয়ানো যেতে পারে ।



অনুশীলন (Activity) : ভিটামিন এ, ডি, ই ও কে এর অভাবজনিত রোগলক্ষণের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন ।



সারমর্ম : ভিটামিন অক্ষ পরিমাণে প্রয়োজন হলেও পশুর স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । পশুতে, বিশেষ করে রোমস্থক পশুতে, চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিনসমূহের ঘাটতি দেখা দিতে পারে । ফলে এরা পশু নানা ধরনের রোগে ভুগতে পারে । এতে পশুর উৎপাদন হ্রাস পায় । ভিটামিনের অভাবজনিত লক্ষণ দেখে নির্দিষ্ট ভিটামিনের অভাব শলাক্ত করে পশুর চিকিৎসা করতে হয় । তবে, খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন পূর্ব থেকে যোগ করলে পশুতে এসব ভিটামিনের অভাবজনিত লক্ষণ প্রকাশ পায় না ।



পাঠোভর মূল্যায়ন ৫.১

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের কোণ্টি রোমস্তুক পশুতে সংশ্লেষিত হয় না?

- i) নিকোটিনিক অ্যাসিড
- ii) রাইবোফ্লাইডিন
- iii) সায়ানোকোবাল অ্যামাইন
- iv) ফোলিক অ্যাসিড

খ. কোন্ ভিটামিনের অভাবে পশুর ত্বকের মস্ণতা নষ্ট হয়?

- i) ভিটামিন কে
- ii) ভিটামিন ই
- iii) ভিটামিন ডি
- iv) ভিটামিন এ

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. ভিটামিন এ এর অভাবে রোডপসিন উৎপাদিত হয়।

খ. ভিটামিন কে এর অভাবে রাত্ত জমাট বাঁধে না।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. ভিটামিন ডি এর অভাবে প্রাণ্বয়ক্ষ পশুর _____ রোগ হয়।

খ. ভিটামিন ই দেহে _____ কার্যকারিতা ঠিক রাখে।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. অফিলিয়ালির শুষ্কপ্রদাহকে কী বলে?

খ. ভিটামিন ডিঃ এর অপর নাম কী?



পাঠ ৫.২ খণিজপদার্থের অভাবজনিত রোগ ও প্রতিরোধ

এ পাঠ শেষে আপনি –

- গবাদিপশুর দেহের জন্য প্রয়োজনীয় খণিজপদার্থগুলোর নাম বলতে পারবেন।
- পশুদেহে খণিজপদার্থের অভাবের কারণ ও লক্ষণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- খণিজপদার্থের অভাবজনিত রোগের চিকিৎসা ও প্রতিরোধ বর্ণনা করতে পারবেন।



অন্যান্য খাদ্যোপাদানের ন্যায় খণিজপদার্থও পশুদেহের জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। প্রাপ্তবয়স্ক পশুর দেহের সাধারণত ৩-৫%ই খণিজপদার্থ। এ খণিজপদার্থের প্রায় ৮০%ই বিভিন্ন ধরনের হাড় ও দাঁতের উপাদান হিসেবে থাকে। বাকি ২০% থাকে রক্ত ও কোষকলায়। খণিজপদার্থগুলো পশুদেহের বিভিন্ন বিপাকক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসব খণিজপদার্থের ১৫টি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। যেমন— ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্লোরিন, ম্যাগনেসিয়াম, ম্যাঞ্জিনিজ, লৌহ, কপার, কোবাল্ট, জিঙ্ক, আয়োডিন, সালফার, মলিবডেনাম ও সেলেনিয়াম। পশুর দৈহিক বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য রক্ষা ও প্রজননের জন্য খণিজপদার্থ অত্যাবশ্যকীয়। তবে, অধিক পরিমাণে গ্রহণ করলে এসব খণিজপদার্থ অনেক সময় পশুদেহে বিষক্রিয়ারও সৃষ্টি করতে পারে। কাজেই পশুখাদ্যে প্রয়োজনীয় মাত্রায় খণিজপদার্থ যোগ করতে হবে।

খণিজপদার্থ (Minerals)

অন্যান্য খাদ্যোপাদানের ন্যায় খণিজপদার্থও পশুদেহের জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। প্রাপ্তবয়স্ক পশুর দেহের সাধারণত ৩-৫%ই খণিজপদার্থ। এ খণিজপদার্থের প্রায় ৮০%ই বিভিন্ন ধরনের হাড় ও দাঁতের উপাদান হিসেবে থাকে। বাকি ২০% থাকে রক্ত ও কোষকলায়। খণিজপদার্থগুলো পশুদেহের বিভিন্ন বিপাকক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসব খণিজপদার্থের ১৫টি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। যেমন— ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্লোরিন, ম্যাগনেসিয়াম, ম্যাঞ্জিনিজ, লৌহ, কপার, কোবাল্ট, জিঙ্ক, আয়োডিন, সালফার, মলিবডেনাম ও সেলেনিয়াম। পশুর দৈহিক বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য রক্ষা ও প্রজননের জন্য খণিজপদার্থ অত্যাবশ্যকীয়। তবে, অধিক পরিমাণে গ্রহণ করলে এসব খণিজপদার্থ অনেক সময় পশুদেহে বিষক্রিয়ারও সৃষ্টি করতে পারে। কাজেই পশুখাদ্যে প্রয়োজনীয় মাত্রায় খণিজপদার্থ যোগ করতে হবে।

পশুদেহে খণিজপদার্থের অভাবজনিত রোগ

অধিক পরিমাণে গ্রহণ করলে যেমন বিষক্রিয়া ঘটে তেমনি কোনো কারণে পশুদেহে খণিজপদার্থের স্থল্যতা ঘটলেও বিভিন্ন রোগলক্ষণ প্রকাশ পায়। এ পাঠে বিভিন্ন ধরনের খণিজপদার্থের অভাবে পশুদেহে সৃষ্টি বিভিন্ন উপসর্গ বা রোগলক্ষণ এবং সেগুলোর চিকিৎসা ও প্রতিরোধ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অভাব (Calcium & Phosphorus Deficiency)

ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস দেহের অস্থি ও দাঁত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এছাড়াও দেহের pH-ক্ষার সমতা (Acid-Base Balance) রক্ষায় সাহায্য করে। ক্যালসিয়াম রক্ত জমাট বাঁধতে এবং ফসফরাস শর্করা ও ত্বেজাতীয় খাদ্য উপাদান বিপাকে সাহায্য করে। তবে, এদের কার্যসম্পাদনের জন্য ভিটামিন ডি এর উপস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অভাবে গবাদিপশুতে বিভিন্ন রোগলক্ষণ দেখা দেয় যার মধ্যে অস্থিসংক্রান্ত রোগই প্রধান।

কারণ

- ◆ খাদ্যে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ভিটামিন ডি এর অভাব।
- ◆ খাদ্যে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস আনুপাতিক হারে না থাকা।
- ◆ প্যারাথাইরয়েড গ্রস্থির অপর্যাপ্ত কার্যকারিতার কারণে দেহে ক্যালসিয়ামের অভাব দেখা দেয়।
- ◆ দেহে ক্যালসিয়ামের আধিক্য ও অতিরিক্ত ভিটামিন এ ফসফরাসের ঘাটতি ঘটায়।

রোগলক্ষণ

- ◆ বাড়ত পশুতে রিকেট ও প্রাপ্তবয়স্ক পশুতে অস্থিকোমলতা (Osteomalacia) রোগ দেখা দেয়।
- ◆ বাড়ত পশুর দৈহিক বৃদ্ধি ব্যতীত হয় ও সময়মতো দাঁতের বৃদ্ধি হয় না।

ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অভাবে বাড়ত পশুতে রিকেট ও প্রাপ্তবয়স্ক পশুতে অস্থিকোমলতা রোগ দেখা দেয়।

- ◆ পশুর প্রজনন ক্ষমতাহুস পায়, এমনকী অর্ন্বরতাও দেখা দিতে পারে।
- ◆ ক্যালসিয়ামের অভাবে গাভীতে দুঃখজ্বর (Milkfever) দেখা দেয়।
- ◆ ফসফরাসের অভাবে গবাদিপশুতে বিকৃত ক্ষুধা বা পিকা (Pica) রোগ দেখা দেয়।
- ◆ বয়ক পশুতে উভয় উপাদানের অভাবেই হাঁটতে অসুবিধা, অস্থি ভঙ্গুরতা দেখা দেয়। শেষ পর্যায়ে অস্থি গঠনে বিকৃতি ঘটে যাকে অস্টিওডিস্ট্রফি (Osteodystrophy) বলে।



চিত্র ৪৪ : অস্টিওডিসিয়া রোগে আক্রান্ত একটি গরু

রোগ নির্ণয়

খাদ্যে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ভিটামিন ডি এর অভাবের ইতিহাস, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রোগলক্ষণ, রক্তে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের পরিমাণ নির্ণয় প্রাচৃতির মাধ্যমে এ দুটো খণ্জিপদার্থের অভাবজনিত রোগ নির্ণয় করা যায়।

চিকিৎসা ও প্রতিরোধ

- ◆ ক্যালসিয়ামের অভাবজনিত রোগে ক্যালসিয়াম দ্রবণ বা সলুশন (যেমন— ক্যালসিয়াম বোরোগুকোনেট দ্রবণ ২৫%) শিরা ও ত্বকের নিচে ইনজেকশনের মাধ্যমে প্রয়োগ করে সুফল পাওয়া যায়।
- ◆ ফসফরাসের অভাবজনিত রোগের ক্ষেত্রে তীব্রভাবে আক্রান্ত পশুকে ৩০০ মি.লি. পরিসুত পানিতে ৩০ গ্রাম সোডিয়াম অ্যাসিড ফসফেট মিশিয়ে শিরায় ইনজেকশন দিলে সুফল পাওয়া যায়।
- ◆ খাদ্যে পরিমিত মাত্রায় ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস এবং ভিটামিন ডি যোগ করে পশুকে খাওয়াতে হবে।
- ◆ বোন মিল বা হাঁড়ের গুঁড়ো, ডাই-ক্যালসিয়াম ফসফেট ও ডাই-সোডিয়াম ফসফেট খাদ্যের সাথে সরবরাহ করা যায়।

খাদ্যে পরিমিত মাত্রায়
ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস এবং
ভিটামিন ডি যোগ করে পশুকে
খাওয়াতে হবে।

ম্যাগনেসিয়াম শর্করাজাতীয়
খাদ্যের বিপাক, বিভিন্ন
এনজাইমের সক্রিয়তা বৃদ্ধি এবং
ম্যায়ু-পৈশিক তন্ত্রের উদ্ধীপণ
নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে।

ম্যাগনেসিয়ামের অভাব (Magnesium Deficiency)

ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের সঙ্গে ম্যাগনেসিয়ামের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। দেহের মোট ম্যাগনেসিয়ামের প্রায় ৭০%ই অস্থিতে পাওয়া যায়। বাকি অংশ থাকে বিভিন্ন নরম কোষকলা ও তরল পদার্থে। শর্করাজাতীয় খাদ্যের বিপাক, বিভিন্ন এনজাইমের সক্রিয়তা বৃদ্ধি এবং ম্যায়ু-পৈশিক তন্ত্রের

(Neuro-muscular System) উদ্দীপণা নিয়ন্ত্রণে ম্যাগনেসিয়ামের গুরুত্ব অপরিসীম। গবাদিপশুতে তাই ম্যাগনেসিয়ামের অভাবে বিভিন্ন রোগলক্ষণ দেখা দেয়।

অভাবের কারণ

- ◆ বাচ্চুর বা বয়স্ক গরুমহিষের খাদ্যে ম্যাগনেসিয়ামের ঘাটতি হলে।
- ◆ দেহে হরমোনের গোলযোগ থাকলে।
- ◆ ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও ফসফরাসের পারস্পরিক সম্পর্কে ত্রুটি হলে।

লক্ষণ

- ◆ বাচ্চুরে হোল মিক্ক টেটানি (Whole Milk Tetany) ও হাইপোম্যাগনেসিমিক টেটানি (Hypomagnesimic Tetany) রোগ হয়।
- ◆ দুঃখবতী গাভীতে ল্যাকটেশন টেটানি (Lactation Tetany), গ্রাস স্ট্যাগারস (Grass Staggers) বা গ্রাস টেটানি (Grass Tetany) রোগ হয়।
- ◆ এসব রোগে প্রধানত স্নায়বিক খিঁচনি, অতি উপদাহিতা, মুখমন্ডলীয় পেশির কম্পন, টালমাল চলনভঙ্গি ও শেষ পর্যায়ে টেটানি লক্ষণ প্রকাশ পায়।
- ◆



চিত্র ৪৫ : ল্যাকটেশন টেটানি বা গ্রাস টেটানিতে আক্রান্ত একটি গাভী

চিকিৎসা ও প্রতিরোধ

আমাদের দেশে খোলা অবস্থায় পালিত পশুতে সাধারণত ম্যাগনেসিয়ামের অভাব হয় না। কারণ, এসব পশুর জন্য ব্যবহৃত পশুখাদ্যে প্রায় ০.১% এর উপরে ম্যাগনেসিয়াম থাকে। তবে, খামারে পালিত পশুর ক্ষেত্রে শুক্র রেশনে ০.০৬% ম্যাগনেসিয়াম থাকা প্রয়োজন।

আমাদের দেশে খোলা অবস্থায় পালিত পশুতে সাধারণত ম্যাগনেসিয়ামের অভাব হয় না।

সোডিয়াম, ক্লোরিন ও পটাসিয়ামের অভাব

(Sodium, Chlorine & Potassium Deficiency)

সোডিয়াম, ক্লোরিন ও পটাসিয়াম পশুর দেহে অ-ক্ষারের সমতা নিয়ন্ত্রণ করে। তাছাড়া স্নায়ুর অনুভূতি ও পেশির সংকোচন নিয়ন্ত্রণ করে। তাছাড়া হৃৎপিণ্ডের কার্যসম্পাদন ও অস্থি গঠনে পটাসিয়াম দরকার।

সোডিয়াম, ক্লোরিন ও পটাসিয়ামের অভাব (Sodium, Chlorine & Potassium Deficiency)

সোডিয়াম, ক্লোরিন ও পটাসিয়াম পশুর দেহে অ-ক্ষারের সমতা নিয়ন্ত্রণ করে। তাছাড়া স্নায়ুর অনুভূতি ও পেশির সংকোচন নিয়ন্ত্রণ করে। তাছাড়া হৃৎপিণ্ডের কার্যসম্পাদন ও অস্থি গঠনে পটাসিয়াম দরকার।

লক্ষণ

- ◆ সোডিয়াম ক্লোরাইডের অভাবে পশুর বাড়ন ব্যহত হয়, লোম উসকোখুশকো ও ত্বক অমস্ণ হয়, অস্থি নরম হয়, কর্নিয়াল ক্যারাটিনাইজেশন (Corneal Keratinization) ও ম্যায়বিক গোলযোগ দেখা দেয়।
- ◆ সোডিয়াম ক্লোরাইডের অভাবে পশুতে মূত্রাধিক্য, ত্রুটাধিক্য, লবণক্ষুধা, বিকৃতক্ষুধা, শরীর বা অন্য কোনো ময়লা চাটা, প্রস্তাব পান করা ইত্যাদি দেখা যায়। ফলে দৈহিক ওজন ও উৎপাদন কমে যায়।
- ◆ পটাসিয়ামের অভাবে—
 - দৈহিক বৃদ্ধি একেবারেই কমে যায়।
 - অ্যানেমিয়া ও ডায়ারিয়া দেখা দেয়।
 - সামগ্রিকভাবে পেশি দুর্বল হয়ে পড়ে।
 - হৎপিণ্ড ও শ্বাসীয় পেশি দুর্বল হওয়ার ফলে এদের কর্মক্ষমতাহ্রাস পায়।

রোগ নির্ণয়

রোগের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ দেখে প্রাথমিকভাবে এ খণিজপদার্থগুলোর অভাব শনাক্ত করা যায়।

চিকিৎসা ও প্রতিরোধ

- ◆ খাদ্যে পরিমিত মাত্রায় সোডিয়াম ক্লোরাইড ও পটাসিয়াম মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।
- ◆ সব ধরনের পশুর খাদ্যে ০.৫% সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং রোমস্ক পশুর খাদ্যে ০.৫% পটাসিয়াম খাওয়ালে সাধারণত এ খণিজপদার্থগুলোর অভাব হয় না।

জিঙ্কের অভাব (Zinc Deficiency)

জিঙ্কের অভাবে শুকর, গরু, ছাগল ও ভেড়াতে প্যারাক্যারাটোসিস, লোম পড়ে যাওয়া বা অ্যালোপেসিয়া, লোম চাটা, ক্ষুরের অস্থাভাবিক বৃদ্ধি ও খেঁড়ানোর লক্ষণ দেখা যায়।

লক্ষণ

- ◆ তৈরি প্রকৃতির অভাবে গরুর দেহের প্রায় ৪০% জায়গায় প্যারাক্যারাটোসিস (Parakeratosis) ও অ্যালোপেসিয়া (Alopecia) দেখা দেয়।
- ◆ গরু, ছাগল ও ভেড়ায় দৈহিক ওজন কমে যায় ও বৃদ্ধি ব্যহত হয়।
- ◆ এসব পশুতে অস্থিসঞ্চির স্ফীতি, লোম পড়ে যাওয়া, অভক্তোষথলির ত্বক পুরু হওয়া, ত্বক ভাঁজ হওয়া ইত্যাদি দেখা যায়।

রোগ নির্ণয়

- ◆ মাটি ও খাদ্যে জিঙ্কের অভাব এবং খাদ্য অতিরিক্ত ক্যালসিয়ামের ইতিহাস থেকে।
- ◆ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ দেখে। পরজীবীজনিত ত্বকের ক্ষতের কারণে লোম ঝরে যাওয়ার লক্ষণের সঙ্গে লক্ষণের দ্বিধা হতে পারে।
- ◆ রক্তে জিঙ্কের মাত্রা পরিমাপ করে।

চিকিৎসা ও প্রতিরোধ

- ◆ আক্রান্ত পশুর প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ২-৪ মি.গ্রা. জিঙ্ক প্রত্যেহ একবার করে মোট দশদিন ইনজেকশন করলে সুফল পাওয়া যাবে।

পশুর খাদ্যে ০.৫-০.৬%
ক্যালসিয়াম ও প্রতি কেজি
খাদ্যে ৫০ মি.গ্রা. হিসেবে
জিঙ্ক সালফেট বা জিঙ্ক
কার্বনেট সরবরাহ করে জিঙ্কের
অভাব প্রতিরোধ করা যায়।

ম্যাঞ্জানিজের অভাবে পশুর
দৈহিক বৃদ্ধি হ্রাস, অস্থির
বিকলাঙ্গতা ও প্রজনন
অক্ষমতা দেখা দেয়।

- ◆ ছাগলের ক্ষেত্রে দৈনিক ২৫০ মি.গ্রা. হিসেবে একমাস জিঙ্ক সালফেট খাওয়ালে ৩-৩.৫
মাসে আক্রান্ত ছাগল আরোগ্য লাভ করবে।
- ◆ পশুর খাদ্যে ০.৫-০.৬% ক্যালসিয়াম ও প্রতি কেজি খাদ্যে ৫০ মি.গ্রা. হিসেবে জিঙ্ক
সালফেট বা জিঙ্ক কার্বনেট সরবরাহ করে জিঙ্কের অভাব প্রতিরোধ করা যায়।

ম্যাঞ্জানিজের অভাব (Manganese Deficiency)

ম্যাঞ্জানিজের অভাবে পশুর দৈহিক বৃদ্ধি হ্রাস, অস্থির বিকলাঙ্গতা ও প্রজনন অক্ষমতা দেখা দেয়।

কারণ

- ◆ চারণভূমিতে ম্যাঞ্জানিজের অভাব পশুদেহে এর অভাবের মূল কারণ।
- ◆ খাদ্যে অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস থাকলে।

লক্ষণ

- ◆ গাভীর প্রজনন অক্ষমতা দেখা যায়।
- ◆ জন্মগতভাবে বাচ্চুরের পা বিকলাঙ্গ থাকে।
- ◆ বাচ্চুরের বাড়ন ব্যতীত হয়, দেহ শুষ্ক হয় ও লোম বারে যায়।
- ◆ অস্থি বেঁকে যায়, অস্থিসংক্ষি স্ফীত হয় ও পা পেঁচিয়ে যায়।
- ◆ পায়ে ব্যথা থাকে ও খুঁড়িয়ে হাঁটে।

চিকিৎসা ও প্রতিরোধ

- ◆ খাদ্যে প্রয়োজনীয় মাত্রায় ম্যাঞ্জানিজ সরবরাহ করতে হবে।
- ◆ ম্যাঞ্জানিজের অভাবে প্রজননে অক্ষম পশুকে দৈনিক ২-৪ গ্রাম হিসেবে ম্যাঞ্জানিজ সালফেট
খাওয়ালে সুফল পাওয়া যায়।

আয়োডিনের অভাব (Iodine Deficiency)

আয়োডিনের অভাবে গলগন্ড বা ঘ্যাগ রোগ (Goitre) হয়। এতে নবজাত পশুর মৃত্যু, লোম ওষ্ঠা ও
থাইরয়েড গ্রস্তি স্ফীত হয়ে যায়।

লক্ষণ

- ◆ বাচ্চা পশুর থাইরয়েড গ্রস্তি দেখা যায়। বয়স্ক পশুতে গলগন্ড হলেও স্ফীতি বোঝা
যায় না।
- ◆ বয়স্ক গাভীতে দুর্বলতা, ওজন ও দুধ উৎপাদন হ্রাস পায়।
- ◆ গাভীর গরম হওয়ার লক্ষণ দেখা যায় না।
- ◆ গর্ভবতী গাভীর গর্ভপাত হয় বা মৃত বাচ্চা প্রসব করে অথবা দুর্বল বাচ্চা প্রসব করে যাদের
গায়ে লোম থাকে না।
- ◆ শাঁড়ের মৌনশক্তি হ্রাস পায়।

চিকিৎসা ও প্রতিরোধ

- ◆ শুষ্ক গাভী ও বাচ্চুরের প্রতি কেজি খাদ্যে ০.১-০.৩ মি.গ্রা. এবং দুর্ঘবতী ও গর্ভবতী গাভীর
প্রতি কেজি খাদ্যে ০.৮-১.০ মি.গ্রা. মাত্রায় আয়োডিন সরবরাহ করে আয়োডিনের অভাব
প্রতিরোধ করা যায়। অতিরিক্ত মাত্রায় আয়োডিন বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে।

সামুদ্রিক উৎসের সকল খাদ্য,
ফিস মিল, বোন মিল ইত্যাদি
পর্যাপ্ত পরিমাণে খাওয়ালে
আয়োডিনের অভাব হয় না।

- ◆ সামুদ্রিক উৎসের সকল খাদ্য, ফিস মিল, বোন মিল ইত্যাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে খাওয়ালে আয়োডিনের অভাব হয় না।

কপারের অভাবে রোমস্থক
পশ্চতে রক্তস্মল্লতা ও ফলিং
রোগ দেখা দেয়।

কপারের অভাব (Copper Deficiency)

কপারের অভাবে রোমস্থক পশ্চতে অতৃপ্তি, ডায়ারিয়া, খোঁড়ানো, কেন্দ্রীয় মাঝ্যতন্ত্রের গঠনক্রিয়া প্রকাশ পায়। পরবর্তীতে রক্তস্মল্লতা ও ফলিং রোগ (Falling Disease) দেখা দেয়।

কারণ

- ◆ চারণভূমিতে কপারের অভাবই মূল কারণ।
- ◆ খাদ্যে অতিরিক্ত পরিমাণে মলিবডেনাম, জিঙ্ক, লৌহ, সিসা ও ক্যালসিয়াম কার্বনেট থাকলে কপারের অভাব হয়।

লক্ষণ

- ◆ দুঃখবর্তী পশুর দুধ কমে যাওয়া, অনুর্বরতা, ত্বক রুক্ষ ও ত্বকের বর্ণ পরিবর্তিত হয়।
- ◆ অ্যানেমিয়া বা রক্তস্মল্লতা দেখা দেয়।
- ◆ বৃদ্ধি ব্যহত, দীর্ঘমেয়াদী ডায়ারিয়া, অস্থিভঙ্গ ইত্যাদি দেখা যায়।
- ◆ কপারের অভাবে সাইটোক্রোম অক্সিডেজ এনজাইম সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারে না। ফলে হংপিণ্ডের পেশির অবক্ষয় দেখা দেয়। হংযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে পশু মারা যায়। বাহ্যত সুস্থ গরু হঠাতে মাথা তুলে যন্ত্রণায় হাস্মা রবে চিন্কার করে মাটিতে পড়ে মারা যায়। এটিই ফলিং রোগ বা ফলিং ডিজিজ নামে পরিচিত।

রোগ নির্ণয়

মাটি, ঘাস ও খাদ্যে কপারের অভাবের ইতিহাস এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রোগলক্ষণ দেখে প্রাথমিকভাবে কপারের অভাবজনিত রোগ শণাক্ত করা যায়।

চিকিৎসা ও প্রতিরোধ

- ◆ চিকিৎসার ক্ষেত্রে বাচুর ও প্রাণ্বয়ক গরুর জন্য যথাক্রমে ৪ গ্রাম ও ৮-১০ গ্রাম মাত্রায় কপার সালফেট পানির সাথে মিশিয়ে সংগৃহে একবার করে প্রায় একমাস খাওয়াতে হবে।
- ◆ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে গরু এবং ছাগলভেড়ার প্রতি কেজি খাদ্যে যথাক্রমে ১০ মি.গ্রা. ও ৫ মি.গ্রা. মাত্রায় কপার যোগ করতে হবে।

কোবাল্টের অভাবে ক্ষুধামন্দা
ও পেশির অবক্ষয় দেখা

কোবাল্টের অভাব (Cobalt Deficiency)

কোবাল্ট সায়ানোকোবাল অ্যামাইন বি_{১২} এর উপাদান। এর অভাবে ক্ষুধামন্দা ও পেশির অবক্ষয় (Muscle Degeneration) দেখা দেয়।

কারণ

- ◆ চারণভূমি, ঘাস বা খাদ্যে কোবাল্টের অভাবে গরু, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি পশ্চতে কোবাল্টের অভাবজনিত রোগ হয়।
- ◆ চুন ও ম্যাঙ্গানিজ প্রয়োগকৃত জমির ঘাস খেলেও এর অভাব হতে পারে।

লক্ষণ

- ◆ ক্ষুধামন্দা, বৃদ্ধি হাস, রক্তশূন্যতা, দুর্বলতা, শ্বাসকষ্ট, প্রজনন ক্ষমতা হাস, বাচ্চার মৃত্যু হার বৃদ্ধি, পিকা, ডায়ারিয়া ইত্যাদি দেখা যায়।

- ◆ মাংসপেশির অবক্ষয়ের ফলে পশু কৃশকায় ও দুর্বল হয়ে পড়ে ।
- ◆ রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে ।
- ◆ সঠিক সময়ে চিকিৎসা না করলে পশু মারা যায় ।

পশুর খাদ্য বা চারণভূমিতে
নির্ধারিত মাত্রায় কোবাল্ট সরবরাহ
করলে এর অভাব হয় না ।

চিকিৎসা ও প্রতিরোধ

- ◆ নির্ধারিত মাত্রায় পশুকে কোবাল্ট খাওয়ালে বা ভিটামিন বি.১২ ইনজেকশন দিলে পশু আরোগ্য লাভ করে ।
- ◆ পশুর খাদ্যে বা চারণভূমিতে নির্ধারিত মাত্রায় কোবাল্ট সরবরাহ করলে এর অভাব হয় না ।

সেলেনিয়ামের অভাবে পশুতে
নিউট্রিশনাল মাসকুলার ডিস্ট্রফি,
গাভীর গর্ভফুল আটকে যাওয়া,
প্রজনন অক্ষমতা, অস্থিমজ্জার
অস্থাভাবিকতা ইত্যাদি দেখা যায় ।

সেলেনিয়ামের অভাব (Selenium Deficiency)

সেলেনিয়াম গুটাথায়ন পেরোক্সিডেজ এনজাইমের অংশ যা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে । ভিটামিন ই এর সঙ্গে সেলেনিয়ামের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে । সেলেনিয়ামের অভাবে গবাদিপশুতে নিউট্রিশনাল মাসকুলার ডিস্ট্রফি (Nutritional Muscular Dystrophy), গাভীর গর্ভফুল আটকে যাওয়া, প্রজনন অক্ষমতা, অস্থিমজ্জার অস্থাভাবিকতা ইত্যাদি রোগ দেখা যায় ।

কারণ

- ◆ সেলেনিয়ামের অভাবজনিত মাটিতে জন্মানো খাদ্যদ্রব্য পশুকে খাওয়ানো ।
- ◆ খাদ্যে ভিটামিন ই অপর্যাপ্ত পরিমাণে থাকলে ।
- ◆ খাদ্যের মধ্যে সালফারের উপস্থিতি থাকলে ।
- ◆ অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডসমূহ খাদ্য খাওয়ালে ।

লক্ষণ

- ◆ তীব্র প্রকৃতির মাসকুলার ডিস্ট্রফি রোগে বাচ্চুরের শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়, নাক দিয়ে ফেনাযুক্ত বা রক্তমিশ্রিত পদার্থ নির্গত হয় এবং ৬-১২ ঘন্টার মধ্যে পশু মারা যায় ।
- ◆ মৃদু প্রকৃতির রোগে বাচ্চুর ও ভেড়ার বাচ্চার শ্বাসকষ্ট হয় । বাচ্চুর ও ভেড়ায় যথাক্রমে এ রোগ হোয়াইট মাসল ডিজিজ (White Muscle Disease) ও স্টিফ ল্যাম্ব ডিজিজ (Stiff Lamb Disease) নামে পরিচিত ।
- ◆ এতে পশুর হৃদস্পন্দন বেড়ে যায় ।
- ◆ গাভীর গর্ভফুল আটকে যায় ।
- ◆ লোহিতকণিকা ও অস্থিমজ্জার অস্থাভাবিকতা দেখা দেয় ।

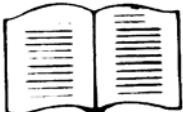
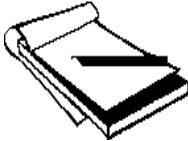
রোগ নির্ণয়

- ◆ খাদ্যে সেলেনিয়ামের অভাব ও বাচ্চা প্রাণী আক্রান্ত হওয়ার ইতিহাস জেনে ।
- ◆ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রোগলক্ষণ দেখে ।

চিকিৎসা ও প্রতিরোধ

- ◆ রোগক্রান্ত বাচ্চা পশুকে ৩ মি.গ্রা. মাত্রায় সেলেনিয়াম এবং ২ মি.লি./কেজি মাত্রায় আলফা টোকোফেরল অ্যাসিটেট মাংসপেশিতে ইনজেকশন আকারে প্রয়োগ করে সুফল পাওয়া যায় ।
- ◆ প্রতি কেজি খাদ্যে ০.১ মি.গ্রা. সেলেনিয়াম সরবরাহ করে এর অভাব প্রতিরোধ করা যায় ।

প্রতি কেজি খাদ্যে ০.১ মি.গ্রা.
সেলেনিয়াম সরবরাহ করে এর
অভাব প্রতিরোধ করা যায় ।



অনুশীলন (Activity) ৪ গবাদিপশুর বিভিন্ন খণিজপদার্থের অভাবজনিত রোগগুলোর একটি তালিকা তৈরি করুন।

সারমর্ম ৪ অন্যান্য খাদ্যোপাদানের ন্যায় খণিজপদার্থও পশুদেহের জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। খণিজপদার্থগুলো পশুদেহের বিভিন্ন বিপাকক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পশুদেহের জন্য ১৫টি খণিজপদার্থ অত্যাবশ্যকীয় বলে চিহ্নিত হয়েছে। যেমন— ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্লোরিন, ম্যাগনেসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, কপার, কোবাল্ট, জিঞ্চ, আয়োডিন, সেলেনিয়াম, সালফার, মলিবডেনাম ও নোহ। এসব উপাদানের অভাবে পশুদেহে বিভিন্ন ধরনের রোগলক্ষণ প্রকাশ পায়। পশুদেহে নির্দিষ্ট খণিজপদার্থের অভাব সঠিকভাবে নির্ণয় করে চিকিৎসা করলে সুফল পাওয়া যায়। তাছাড়া পূর্ব থেকেই এদের খাদ্যে পরিমিত মাত্রায় খণিজপদার্থ সরবরাহ করে পশুদেহে খণিজপদার্থের অভাব প্রতিরোধ করা যায়।



পাঠোভর মূল্যায়ন ৫.২

১। **সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।**

- ক. ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অভাবে কোন্ রোগ হয়?
 i) রিকেট
 ii) অস্টিওমেলাসিয়া
 iii) অস্টিওডিস্ট্রফিক
 iv) উপরের সবগুলোই

- খ. কোন্ খণিজপদার্থের অভাবে গাভীর ল্যাকটেশন টেটানি রোগ হয়?
 i) ফসফরাস
 ii) ম্যাগনেসিয়াম
 iii) কোবাল্ট
 iv) ম্যাঙ্গানিজ

২। **সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।**

- ক. পটাসিয়ামের অভাবে সামগ্রিকভাবে পেশি দুর্বল হয়ে পড়ে।
 খ. জিঞ্চের অভাবে প্যারাক্যারাটোসিস রোগ হয়।

৩। **শূন্যস্থান পূরণ করুন।**

- ক. আয়োডিনের অভাবে থথথথ রোগ হয়।
 খ. কপারের অভাবে পশুর থথথথ ডিজিজ হয়।

৪। **এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।**

- ক. কোন্ খণিজপদার্থ ভিটামিন বি১২ এর উপাদান?
 খ. সেলেনিয়ামের অভাবে পশুতে কী রোগ হয়?

পাঠ ৫.৩ পশুর অনুর্বরতার কারণ ও প্রতিরোধ



এ পাঠ শেষে আপনি –

- অনুর্বরতা কী তা বলতে পারবেন।
- ঘাঁড় ও গাভীর অনুর্বরতার কারণগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- পশুর অনুর্বরতার চিকিৎসা ও প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।



পশুর প্রজনন অক্ষমতা
সাধারণত দুভাবে প্রকাশ
পায়। যথা— বন্ধ্যাত্ম এবং

অনুর্বরতা

যে কোনো পশুর প্রজনন প্রক্রিয়া অর্থাৎ বংশধর বা বাচ্চা উৎপাদন প্রক্রিয়া সুনির্দিষ্ট নিয়মে সম্পন্ন হয়। যেমন— স্ত্রী পশুর গরম হওয়া, ডিম্বফোটন, পুরুষ পশুর সাথে যৌন মিলন, বা কৃত্রিম প্রজনন, শুক্রাণু ম্লারা ডিম্বাণু নিষিক্ত হওয়া, জরায়ুতে জ্বর সংস্থাপন ও গর্ভাবস্থা, প্রসব ও দুন্ধদান পর্যায় ইত্যাদি। পশুর উৎপাদন প্রক্রিয়া বিভিন্ন উৎপাদক বা ফ্যাক্টরের (Factor) সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়ে থাকে। এসব উৎপাদকের কোনো কোনোটির অভাবে বা অসামঞ্জস্যতার কারণে পশু তার প্রজন্ম সৃষ্টি করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। এ অক্ষমতা সাধারণত দুভাবে প্রকাশ পায়। যথা— বন্ধ্যাত্ম এবং অনুর্বরতা।

বন্ধ্যাত্ম (Sterility) : পুরুষ পশুর শুক্রাণু সৃষ্টি এবং স্ত্রী পশুর গর্ভধারণের অক্ষমতাকে বন্ধ্যাত্ম বলা হয়।

অনুর্বরতা (Infertility) : প্রজনন কাজে সম্পূর্ণ অক্ষম না হলেও সমজাতের অন্যান্য পশু অপেক্ষা প্রজনন হার হ্রাস পেলে পশু নিয়মিত বাচ্চা উৎপাদনে অক্ষম হয়। প্রজননে বা বাচ্চা উৎপাদনে সাময়িক অক্ষমতাকে অনুর্বরতা বলে। এদেশে প্রায় ৩৭% গাভী অনুর্বরতার শিকার বলে তথ্য পাওয়া গেছে। পশু পালন ও পশু চিকিৎসার ক্ষেত্রে অনুর্বরতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এ অনুর্বরতা বহুলাংশে দূর করা সম্ভব।

এ পাঠে স্ত্রী এবং পুরুষ পশু, বিশেষ করে গাভী ও ঘাঁড়ের অনুর্বরতার কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা ও প্রতিকাররোধ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

গাভীর অনুর্বরতা (Infertility of Cow)

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে গাভীর অনুর্বরতা একটি বিরাট সমস্যা এবং এদেশের পশুসম্পদ উন্নয়নে বিরাট অস্তরায়। এ অনুর্বরতার কারণে প্রতি বছর এদেশে প্রায় ৪৭ কোটি টাকা ক্ষতি হয়।

অনুর্বরতার কারণ

মূলত গাভীর প্রজননত্ত্বের অস্বাভাবিকতা, নিষেধ ব্যর্থতা, জ্বরের মৃত্যু, গর্ভপাত ইত্যাদি গাভীর অনুর্বরতার জন্য দায়ী। যেসব কারণে এগুলোর এক বা একাধিক সৃষ্টি হয় সেগুলোই অনুর্বরতার কারণ। নিম্নে গাভীর অনুর্বরতার কারণগুলো উল্লেখ করা হলো—

- ◆ প্রজননত্ত্ব এবং অন্যান্য অংশের কতকগুলো সংক্রামক রোগ। যেমন— স্ট্রেপটোকক্সিসিস, ক্যাম্পাইলোব্যাকটেরিওসিস, ব্র্যাসেলোসিস, লেপ্টোস্পাইরোসিস, সালমোনেলোসিস, কলিব্যাসিলোসিস, মাইকোপ্লাজমোসিস, করাইনেব্যাকটেরিওসিস, ট্রাইকোমোনিয়াসিস, ক্ল্যামাইডিয়াসিস, কিউ ফিভার ইত্যাদি।
- ◆ সংক্রামক রোগ ছাড়া গাভীর প্রজননত্ত্বের বিভিন্ন রোগাবস্থা (Pathological Conditions)। যেমন— ডিম্বকোষপ্রদাহ, ডিম্বকোষের টিউমার, পুঁজময় ডিম্বনালি, ডিম্বনালির টিউমার, জরায়ুপ্রদাহ, অস্তঝরায়ুপ্রদাহ, পুঁজময় জরায়ু, জরায়ুর ফোড়া বা টিউমার, জরায়ুগ্রীবাপ্রদাহ, জরায়ুগ্রীবার সংকীর্ণতা, জরায়ুর টিউমার, যোনিপ্রদাহ, যোনির সিস্ট বা টিউমার, যোনিমুখপ্রদাহ, যোনিমুখের টিউমার, মায়াসিস ইত্যাদি।
- ◆ হরমোনোর গোলযোগ ও ভারসাম্যহীনতা। যেমন—

- ইন্ট্রোজেন হরমোনের অভাবে পশু গরম হয় না।
- লিউটেনাইজিং হরমোনের অভাবে ডিম্ফেস্টন হয় না। তাছাড়া সিস্টিক ওভারিও হতে পারে।
- হরমোনের ভারসাম্যহীনতায় ডিম্বাশয়ে করপাস লুটিয়াম (Corpus Luteum) থেকে যায়।
- ◆ পুষ্টিহীনতা— বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের অভাবে পশুর দৈহিক বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটে। সঠিক সময়ে পশু প্রজনন উপযোগী হয় না। তাছাড়া ভিটামিন এ, ভিটামিন ই, ভিটামিন ডি, ফসফরাস, সেলেনিয়াম, কপার, কোবাল্ট, আয়োডিন ইত্যাদির অভাবেও পশুতে অনুর্বরতা দেখা দিতে পারে।
- ◆ বংশগত বা কৌলিতাত্ত্বিক (Hereditary or Genetical) উৎপাদক।
- ◆ ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত সমস্যা।
- ◆ পরিবেশগত উৎপাদক।

অনুর্বরতার লক্ষণ

গরম না হওয়া, পুনঃপুনঃ গরম হওয়া ইত্যাদি অনুর্বরতার প্রধান লক্ষণ।

- ◆ প্রসবের ১০০ দিনের মধ্যে গরম না হওয়া।
- ◆ পুনঃপুনঃ গরম হওয়া, যেমন— ১৫ দিনের কম ব্যবধানে গরম হওয়া, ২৮ দিনের অধিক ব্যবধানে গরম হওয়া ইত্যাদি।
- ◆ প্রসবোন্তর কয়েকদিন ও কামপর্ব ব্যতীত অন্য সময়ে বহিঃযোনি (Valva) থেকে কোনো প্রকার স্নাব নির্গত হওয়া।
- ◆ গর্ভপাত হওয়া।
- ◆ জ্ঞাবরণ নির্গমনে ব্যাঘাত সৃষ্টি।
- ◆ তৃতীয়বার প্রজনন ক্রিয়ার পরও গর্ভসংগ্রহে ব্যাঘাত সৃষ্টি।

গাভীর অনুর্বরতা নির্ণয়

ইতিহাস, লক্ষণ, গবেষণাগার ও রেকটাল পরীক্ষার মাধ্যমে জরায়ু ও ডিম্বাশয় পরীক্ষা করে গাভীর অনুর্বরতা নির্ণয় করা যায়।

- ◆ গাভীর প্রজননসংক্রান্ত রেকর্ড অথবা এ সংক্রান্ত তথ্য বা ইতিহাস থেকে।
- ◆ গাভী পাল দেয়ার ৬০ দিনের মধ্যে পুনরায় গরম না হলে গাভীর প্রজনন অঙ্গ ড্যাজাইনাল স্পেকুলাম নামক যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করতে হবে।
- ◆ প্রয়োজন হলে গাভীর প্রজননতন্ত্রের নিম্নোক্ত নিম্নোক্ত গবেষণাগারে স্টেইন ও কালচার করে জীবাণু চিহ্নিত করতে হবে।
- ◆ মলগ্লার বা রেকটাল পরীক্ষার মাধ্যমে জরায়ু ও ডিম্বাশয় পরীক্ষা করতে হবে।
- ◆ গর্ভপাতের ক্ষেত্রে গর্ভপাতকৃত অপূর্ণাঙ্গ বাচ্চা বা ফিটাসের (Foetus) পাকস্থলীর চতুর্থ প্রকোষ্ঠ বা অ্যাবোমেজাম, ফুসফুস, যকৃত ও জ্ঞাবরণ গবেষণাগারে পরীক্ষা করা যেতে পারে।

অনুর্বরতার চিকিৎসা ও প্রতিরোধ

অনুর্বরতার সঠিক কারণ জেনে উপযুক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে এ রোগ চিকিৎসা ও প্রতিরোধ করা যায়। নিম্নলিখিতভাবে অনুর্বরতার চিকিৎসা করা যেতে পারে। যেমন—

- ◆ সংক্রামক রোগের কারণে অনুর্বরতা হলে জীবাণুনাশক ওষুধ দিয়ে জননতন্ত্র ধোত করে যে কোনো একটি পেসারি (Passaries) প্রয়োগ করলে সুফল পাওয়া যায়।
- ◆ পাল দেয়া বা কৃত্রিম প্রজনন সত্ত্বেও গাভীর গর্ভসংগ্রহ না হলে এবং গাভী পুনঃপুনঃ গরম হলে ১% সোডিয়াম বাইকার্বনেট দ্রবণ দিয়ে জননতন্ত্র ধোত করে পাল দিলে বা কৃত্রিম প্রজনন করলে সুফল পাওয়া যায়।

- ◆ পুষ্টির অভাবজনিত অক্ষমতায় পশুকে সুষম খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে।
- ◆ হরমোনের গোলযোগ হলে উপযুক্ত হরমোন প্রিপারেশনের মাধ্যমে চিকিৎসা করে সুফল পাওয়া যায়।

এ রোগ প্রতিরোধের জন্য—

- ◆ প্রতিটি পশুর প্রজনন ও স্বাস্থ্যসংক্রান্ত তথ্যাদি রেকর্ড করতে হবে।
- ◆ পশুকে সুষম খাদ্য প্রদান করতে হবে।
- ◆ পশু পালন ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে করতে হবে।
- ◆ পশুকে নিয়মিত বিভিন্ন রোগের বিরুদ্ধে টিকা প্রয়োগ করতে হবে।
- ◆ গোয়াল ঘর বা খামার জীবাণুমুক্ত ও পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

ষাঁড়ের অনুর্বরতা (Infertility of Bull)

যে ষাঁড়ের কামশক্তি কম বা যে ভালোভাবে সঙ্গম ক্রিয়া করতে পারে না অথবা এ দুটোই যার স্বাভাবিক কিন্তু বীর্য নিম্নমানের, তাকে অনুর্বর ষাঁড় বলে চিহ্নিত করা হয়।

ষাঁড়ের অনুর্বরতার কারণ

বংশগত, পুষ্টিহীনতা, অধিক পুষ্টি, ক্রোমোজমের অস্বাভাবিকতা, প্রজননত্রের রোগ প্রভৃতি কারণে ষাঁড়ের অনুর্বরতা দেখা দেয়।

নিম্নলিখিত কারণে ষাঁড় অনুর্বর হতে পারে। যথা—

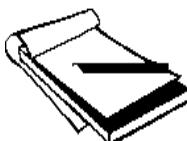
- ◆ বংশগত কারণে কোনো কোনো ষাঁড়ের কামশক্তি ক্রমে ক্রমে হ্রাস পায় এবং পশু অনুর্বর হয়ে যেতে পারে।
- ◆ পুষ্টিহীনতা, যেমন— আমিষ, শর্করা, ভিটামিন ও খণ্ডিজপদার্থের অভাবে পশুর দেহে বিলম্বে যৌনতাপ্রাপ্তি ঘটে, কামশক্তি কমে যায় এবং বীর্যের গুণাগুণ নিম্নমানের হয়।
- ◆ ষাঁড়কে অধিক খাদ্য প্রদান করলে অনেক সময় এদের শরীরে চর্বি জমে, ঠিকমতো চলাফেরা করতে পারে না ও প্রাকৃতিক নিয়মে স্বাভাবিক সঙ্গম ক্রিয়া করতে ব্যর্থ হয়।
- ◆ ক্রোমোজমের অস্বাভাবিকতার কারণেও ষাঁড় অনুর্বর হতে পারে।
- ◆ শুক্রাশয় ও সেমিনাল প্লাজমা সৃষ্টিকারী গ্রহিণুলোর জীবাণুঘটিত ও অন্যান্য রোগে।

অনুর্বরতা নির্ণয়

ইতিহাস, বিভিন্ন লক্ষণ ও কিছু পরীক্ষার মাধ্যমে ষাঁড়ের অনুর্বরতা নির্ণয় করা যায়।

চিকিৎসা ও প্রতিরোধ

- ◆ প্রজননত্রের সংক্রামক রোগের কারণে অনুর্বরতা হলে উপযুক্ত অ্যান্টিবায়োটিক গ্লারা চিকিৎসা করিয়ে সেসব রোগ সাড়াতে হবে।
- ◆ ষাঁড়কে নিয়মিত পরিমিত পরিমাণে পুষ্টি সরবরাহ করতে হবে।
- ◆ ষাঁড়ের বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যগত অবস্থার দিকে সবসময় খেয়াল রাখতে হবে।
- ◆ ষাঁড় পালন ও ব্যবস্থাপনা সঠিক হতে হবে।



অনুশীলন (Activity) ১ ষাঁড় ও গাভীর অনুর্বরতার মধ্যকার পার্থক্যসমূহ লিখুন।



সারমর্ম : বিভিন্ন কারণে পশু প্রজনন বা বাচ্চা উৎপাদনে সাময়িকভাবে অক্ষম হলে তাকে অনুর্বরতা বলে। এদেশের প্রায় ৩৭% গাভী অনুর্বরতার শিকার। প্রজননতন্ত্রের বিভিন্ন সংক্রামক রোগ, রোগাবস্থা, পুষ্টিহীনতা, হরমোনের গোলযোগ, বংশগত, ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশগত কারণে সাধারণত গাভী অনুর্বর হয়। অনুর্বর গাভী গরম হয় না বা পুনঃপুনঃ গরম হয়। ইতিহাস, লক্ষণ ও বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে গাভীর অনুর্বরতা নির্ণয় করা যায়। এরপর সেমতে চিকিৎসা করলে সুফল পাওয়া যেতে পারে। তাছাড়া আগে থেকে এ ব্যাপারে সচেতন হলে এটি প্রতিরোধ করা যায়। ঘাঁড় গরুতে অনুর্বরতা হলে তার কামশক্তি কমে যায় বা ভালোভাবে সঙ্গম করতে পারে না। তবে, ঘাঁড়ের অনুর্বরতার তুলনায় গাভীর অনুর্বরতা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।



পাঠোভর মূল্যায়ন ৫.৩

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. বাংলাদেশে কত % গাভী অনুর্বরতার শিকার?

- i) ৫২%
- ii) ৪৭%
- iii) ৪১%
- iv) ৩৭%

খ. গাভীর অনুর্বরতার লক্ষণ কোনটি?

- i) পুনঃপুনঃ গরম হওয়া
- ii) গরম না হওয়া
- iii) উপরের দুটোই
- iv) কোনটিই নয়

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. ডিটামিন এ, ডি ও ই এর অভাব গাভীর অনুর্বরতার একটি কারণ।

খ. বংশগত কারণে পশু অনুর্বর হয় না।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. _____ অস্বাভাবিকতার কারণে ঘাঁড় অনুর্বর হতে পারে।

খ. অনুর্বর গাভীর প্রজননতন্ত্র ১% সোডিয়াম _____ দ্রবণ দিয়ে ধোত করা হয়।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. অনুর্বর গাভী থেকে বাচ্চা উৎপাদন সম্ভব কি?

খ. হরমোনের ভারসাম্যহীনতায় ডিষ্বাশয়ে কী থেকে যায়?

পাঠ ৫.৪ পশুর জনন অঙ্গের বিভিন্ন রোগ ও প্রতিকার



এ পাঠ শেষে আপনি –

- গবাদিপশুর প্রজনন অঙ্গের বিভিন্ন রোগগুলোর নাম বলতে পারবেন।
- চিকিৎসা প্রতিরোধসহ স্ত্রী পশুর জনন অঙ্গের বিভিন্ন রোগব্যাধি সংক্ষেপে বর্ণনা করতে পারবেন।
- স্ত্রী পশুর জনন অঙ্গের বিভিন্ন রোগগুলোর মধ্যকার পার্থক্যসমূহ আলোচনা করতে পারবেন।
- চিকিৎসা প্রতিরোধসহ পুরুষ পশুর জনন অঙ্গের বিভিন্ন রোগব্যাধি সম্পর্কে সংক্ষেপে বলতে ও লিখতে পারবেন।



জনন অঙ্গে বিভিন্ন রোগব্যাধির
কারণে পশুর বংশধর
উৎপাদনে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়।

পুরুষ পশু অপেক্ষা স্ত্রী পশুর
জনন অঙ্গ বেশিৰার এবং
বেশিসংখ্যক রোগে আক্রান্ত
হয়।

স্ত্রী পশুর জরায়ু বা ইউটেরোসের
প্রদাহকে জরায়ুপ্রদাহ বলে।

বিভিন্ন ধরনের জীবাণু ও
প্রোটোজোয়ার কারণে স্ত্রী
পশুর জরায়ুপ্রদাহ হয়।

জনন অঙ্গ হচ্ছে পশুর বংশবৃদ্ধির অঙ্গ। এ অঙ্গে বিভিন্ন রোগব্যাধির কারণে এদের বংশধর উৎপাদনে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। জনন অঙ্গে বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন ধরনের রোগ হতে পারে। জনন অঙ্গের রোগগুলো জীবাণু, পরজীবী, পুষ্টিহীনতা, আঘাত, হরমোনের গোলোযোগ প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে হতে পারে। এসব রোগব্যাধির মধ্যে কোনো কোনোটি শুধু জনন অঙ্গেই সীমাবদ্ধ থাকে। আবার কোনো কোনো রোগে জনন অঙ্গ ছাড়াও দেহের অন্যান্য অঙ্গও আক্রান্ত হতে পারে। পশুর জনন অঙ্গে বহু ধরনের রোগ হতে পারে। কিন্তু এ অল্প পরিসরে সবগুলো রোগ বিশদভাবে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তাই এখানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রোগ সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমে স্ত্রী পশু ও পরে পুরুষ পশুর জনন অঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ রোগগুলোর বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

স্ত্রী পশুর জনন অঙ্গের রোগব্যাধি

পুরুষ পশু অপেক্ষা স্ত্রী পশুর জনন অঙ্গ বেশিৰার এবং বেশিসংখ্যক রোগে আক্রান্ত হয়। স্ত্রী জনন অঙ্গের বিভিন্ন রোগের মধ্যে জরায়ুপ্রদাহ, পুঁজজরায়ু, জরায়ুগ্রীবাপ্রদাহ, ভালবো-ভ্যাজাইনাইটিস, গর্ভফুল আটকে যাওয়া, জরায়ুর রক্তস্তুতি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া রয়েছে কতকগুলো জীবাণু ও পরজীবীয়চিকিত্সার মধ্যে জনন অঙ্গকেও আক্রান্ত করে। যেমন— ক্রসেলোসিস, লিস্টেরিওসিস, ভিব্রিওসিস, ক্ল্যামাইডিয়াল অ্যাবারশন, ট্রাইকোমোনিয়াসিস ইত্যাদি। এখানে এগুলোর চিকিৎসা ও প্রতিরোধসহ সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

জরায়ুপ্রদাহ (Metritis)

স্ত্রী পশুর জরায়ু বা ইউটেরোসের (Uterus) প্রদাহকে জরায়ুপ্রদাহ বলে। পশুর জরায়ুর দেয়ালের তিনটি স্তরই এতে আক্রান্ত হতে পারে। আর স্তর আক্রান্তের ওপর ভিত্তি করে তাই এগুলো যথাক্রমে এন্ডোমেট্রাইটিস, মেসোমেট্রাইটিস ও পেরিমেট্রাইটিস এ তিনি প্রকারের হয়ে থাকে।

কারণ

- ◆ সাধারণত বাচ্চা প্রসবের পরে বিভিন্ন ধরনের জীবাণুর সংক্রমণে পশুতে তীব্র প্রকৃতির জরায়ুপ্রদাহের সৃষ্টি হয়।
- ◆ বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া, যেমন— *Corynebacterium pyogenes*, *Brucella abortus*, *Campylobacter foetus*; ছত্রাক, যেমন— *Aspergillus* spp., *Abside* spp. ইত্যাদি; ভাইরাস; প্রোটোজোয়া যেমন— *Trichomonas foetus* প্রভৃতি গাভী ও মহিষ গাভীতে এ রোগ সৃষ্টি করে থাকে।
- ◆ ছাগী ও ভেড়ীতে প্রধানত ব্যাকটেরিয়া ((যেমন— *Brucella melitensis*, *Brucella abortus*, *Brucella ovis*, *Campylobacter foetus*, *Salmonella typhimurium*, *Listeria monocytogenes* ইত্যাদি), ভাইরাস, প্রোটোজোয়া (যেমন— *Toxoplasma gondii*) প্রভৃতির সংক্রমণে এ রোগ হয়।

রোগ সংক্রমণ

- ◆ প্রসবের পর বা যে কোনো সময় যোনিপথের মাধ্যমে জীবাণু প্রবেশ করতে পারে ।
- ◆ প্রসববিন্নেলের পরীক্ষায় পরীক্ষাকারীর অপরিক্ষার হাতের মাধ্যমে ।
- ◆ রোগাত্মক শাঁড়ের সঙ্গে ঘোন মিলনের সময় ।
- ◆ জরায়ুতে থেকে যাওয়া গর্ভফুলের পচনের ফলে ।
- ◆ গর্ভ ও প্রসবকালীন কোনো দুর্ঘটনা বা রোগের ফলে ।

রোগলক্ষণ

জরায়ুপ্রদাহ তীব্র বা দীর্ঘমেয়াদী প্রকৃতির হতে পারে ।

তীব্র প্রকৃতির ক্ষেত্রে—

- ◆ জরায়ুতে পুঁজ হয় । দুর্গন্ধময় পুঁজমিশ্রিত লাল বা ধূসর বর্ণের স্বাব যোনিমুখ দিয়ে নির্গত হয় ।
- ◆ ক্ষুধামন্দা, জ্বর, দুর্বলতা ইত্যাদি দেখা দেয় ।
- ◆ যোনিতে পুঁজযুক্ত শ্লেষ্মা পরিলক্ষিত হয় ।
- ◆ পশু ব্যথায় পিট বাঁকা করে রাখে ।

দীর্ঘমেয়াদী প্রকৃতির ক্ষেত্রে—

- ◆ উপরের সবগুলো লক্ষণই মৃদু আকারে দেখা যায় ।
- ◆ পশু বাচ্চা দেয় না ।
- ◆ গর্ভপাত হতে পারে ।
- ◆ অনেক সময় প্রসবোত্তর দুধদান হাস পায় ।

রোগ নির্ণয়

- ◆ পশুর প্রজনন ও রোগের ইতিহাস থেকে
- ◆ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রোগলক্ষণ দেখে ।
- ◆ রেকটাল পরীক্ষার মাধ্যমে ।
- ◆ গবেষণাগারে জরায়ুর স্বাব স্টেইন ও কালচার করে জীবাণু শগাত্তের মাধ্যমে ।

চিকিৎসা

সঠিক চিকিৎসার জন্য জীবাণুনাশক ওষুধ দিয়ে পশুর জরায়ু ধৌত করা যায় ।
যেমন—

- ◆ প্রতিদিন বা একদিন পরপর ২০—১৫০ মি.লি. হিসেবে মোট ৫—৭ দিন পশুর জরায়ু লুগল'স আয়োডিন দিয়ে ধৌত করা ।
- ◆ লুগল'স আয়োডিন দিয়ে জরায়ু ধৌত করে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের প্রোস্টাগ্যাস্টিন এফ্ৰ আলফা ব্যবহার করা যায় । এগুলোর মধ্যে প্রোসলভিন (ইন্টারভেট), লিউটালোইস ও ক্লোট্রোস্টেনল (আপজন) উল্লেখযোগ্য ।
- ◆ এছাড়াও ম্যাস্টালোন-ইউ, কমোক্সিল-প্লাস পেসারি বা অন্যান্য ওষুধ ভেটেরিনারি সার্জেনের পরামর্শমতো ব্যবহার করা যায় ।
- ◆ জীবাণু সংক্রমণের জন্য জ্বর হলে ডাক্তারের নির্দেশমতো অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ ব্যবহার করতে হবে ।

পশুর জরায়তে পুঁজ জমা
হওয়াকে পুঁজজরায় বলে।

পুঁজজরায় (Pyometra)

পশুর জরায়তে পুঁজ জমা হওয়াকে পুঁজজরায় বা পায়োমেট্রো বলে। প্রায় সকল গবাদিপশু এতে আক্রান্ত হয়।

কারণ

- ◆ প্রধানত বিভিন্ন ধরনের পুঁজসৃষ্টিকারী জীবাণু সংক্রমণের কারণে এ রোগ হয়।
- ◆ ট্রাইট্রাইকোমোনাস নামক পরজীবী আক্রান্ত গভীতেও পুঁজজরায় দেখা যায়।

রোগলক্ষণ

- ◆ জরায়ু থেকে পুঁজযুক্ত স্বাব বের হয়।
- ◆ পশু গরম হয় না।
- ◆ জরায়ুর মুখ অনেক সময় বন্ধ হয়ে যায়। ফলে পুঁজ বের হতে না পারার কারণে পেট ফুলে যায়।
- ◆ হলুদ বা লালচে বর্ণের স্বাব বের হয়।
- ◆ রোগের শেষ পর্যায়ে রক্তদুষ্টি বা টক্সিমিয়া হয়ে পশু মারা যেতে পারে।

রোগ নির্ণয়

- ◆ রোগের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ দেখে।
- ◆ রেকটাল পালপেশনের মাধ্যমে ডিম্বাশয় পরীক্ষা করলে তাতে করপাস লুটিয়ামের উপস্থিতি বুঝা যায়।

চিকিৎসা

- ◆ প্রোস্টাগ্ন্যাস্টিন এফ.১ আলফা নির্ধারিত মাত্রায় (৫ মি.গ্রা.) গভীর মাংসপেশিতে ইনজেকশন করতে হবে।
- ◆ পুঁজ বের করার জন্য ৪ মি.লি. মাত্রায় সিলথেটিক অক্সিটোসিন গভীর মাংসে ইনজেকশন দিতে হবে।
- ◆ জীবাণুনাশক ওষুধ (যেমন— অ্যাক্রিফ্লাভিন) দিয়ে জরায়ু পরিষ্কার করে সেখানে যে কোনো একটি অ্যামিবুলাস্ট পেসারি ডাক্তারের নির্দেশমতো প্রয়োগ করতে হবে।
- ◆ জ্বর থাকলে অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে।

জরায়ুগীবা প্রদাহ (Cervicitis)

প্রসববিষ্য, গর্ভপাত, গর্ভফুল নির্গমনে ব্যাঘাত, কৃত্রিম প্রজনন বা জরায়ু পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহৃত টিউব ইত্যাদির কারণে জরায়ুগীবা বা সার্ভিঞ্চে প্রদাহ হয়। এ রোগ চিকিৎসায় ভেটেরিনারি সার্জনের পরামর্শমতো পেসারি ও অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেকশনে সুফল পাওয়া যায়।

ভালবো-ভ্যাজাইনাইটিস (Vulvo-vaginitis)

যোনি (Vagina) ও যোনিমুখের (Vulva) প্রদাহকে ভালবো-ভ্যাজাইনাইটিস বলে।

কারণ

নিম্নলিখিত রোগের কারণে বিভিন্ন পশুতে ভালবো-ভ্যাজাইনাইটিস হয়। যথা—

- ◆ যোড়ার কয়টাল একজেনথেমা বা ভেসিকুলার ভেনেরাল ডিভিজ।

প্রসববিষ্য, গর্ভপাত, গর্ভফুল নির্গমনে ব্যাঘাত, কৃত্রিম প্রজনন বা জরায়ু পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহৃত টিউব ইত্যাদির কারণে জরায়ুগীবা বা সার্ভিঞ্চে প্রদাহ হয়।

যোনি ও যোনিমুখের প্রদাহকে ভালবো-ভ্যাজাইনাইটিস বলে।

- ◆ গাভীর ইনফেকশাস পাসচুলার ভালবো-ভ্যাজাইনাইটিস বা গ্র্যান্থুলার ভালবো-ভ্যাজাইনাইটিস বা ভেনেরাল ডিজিজ।
- ◆ গাভীর আলসারেটিভ ডার্মাটাইটিস।
- ◆ এছাড়াও আঘাত, গর্ভফুল আটকে যাওয়া, যোনির বহির্গমন ইত্যাদি।

লক্ষণ

- ◆ ঘোড়ার কয়টাল একজেনথেমা রোগে যোনি ও যোনিমুখে প্রথমে ছোট ছোট ফোক্ষা পড়ে, পরে সেখানে পুঁজ জমে ও শেষে ক্ষত বা ঘায়ের সৃষ্টি হয়।
- ◆ গাভীর গ্র্যান্থুলার ভালবো-ভ্যাজাইনাইটিস রোগে যোনি ও যোনিমুখে নডিউল সৃষ্টি হয়।

রোগ নির্ণয়

- ◆ দুহাতের আস্ফুল দিয়ে যোনিমুখের দুর্ঠোঁট ফাক করে সরাসরি চাকুষ পরীক্ষার মাধ্যমে এ রোগ নির্ণয় করা যায়।
- ◆ এছাড়াও ভ্যাজাইনাল স্পেকুলাম নামক যন্ত্রের সাহায্যে যোনি পরীক্ষা করে রোগ নির্ণয় করা যায়।

চিকিৎসা

যেসব রোগের কারণে এ রোগ সৃষ্টি হয় সেসব রোগের চিকিৎসা করলে এ রোগ সেড়ে যায়।

গর্ভপাত (Abortion)

জন্ম বা ফিটাস পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তা জরায় থেকে পড়ে যাওয়াকে গর্ভপাত বলে।

কারণ

গর্ভপাতের কারণ দুভাগে বিভক্ত। যথা—

সংক্রামক কারণ : বিভিন্ন সংক্রামক রোগে পশুর গর্ভপাত হয়। যেমন— ক্রসেলোসিস, ভিব্রিওসিস, লিস্টেরিওসিস, লেটোস্পাইরোসিস, মাইকোপ্লাজমোসিস, ক্ল্যামাইডিয়াসিস, ট্রাইট্রাইকোমোনিয়াসিস, ইনফেকশাস বোভাইন রাইনেট্রাকিয়াইটিস, এনজুটিক ভাইরাল অ্যাবরশন, এনজুটিক অ্যাবরশন অভ্যন্তর, বর্ডার রোগ, আটালিবাহিত জুর, রিফট্ ভ্যালি ফিভার ইত্যাদি।

অসংক্রামক কারণ : বিভিন্ন অসংক্রামক কারণে গৃহপালিত পশুর গর্ভপাত ঘটে। যেমন— আঘাত, পুষ্টির অভাব, ইস্ট্রোজেনসমৃদ্ধ ঘাস খেলে, আর্গেট বিষক্রিয়া, আইসোইমুনাইজেশন ইত্যাদি।

লক্ষণ

জ্বরের বৃদ্ধির যে কোনো পর্যায়ে গর্ভপাত হতে পারে।

রোগ নির্ণয়

- ◆ গর্ভপাতের ইতিহাস ও লক্ষণ দেখে।
- ◆ জীবাণু স্বতন্ত্রীকরণ ও চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে।
- ◆ এছাড়াও সিরোলজিক্যাল পরীক্ষার মাধ্যমে।

চিকিৎসা

কারণ অনুযায়ী ভেটেরিনারি সার্জনের পরামর্শমতো সঠিক উপায়ে চিকিৎসা করতে হবে।

জরায়ুপাক রোগ প্রায় সব প্রাণীতেই হতে পারে।

জরায়ু পাক (Uterine Torsion)

জরায়ুপাক সাধারণত একটি প্রসবপূর্ব ব্যাধি হিসেবে চিহ্নিত। তবে, সময়মতো রোগ শণাক্ত ও চিকিৎসা করতে না পারলে মা বা বাচ্চা বা উভয়ই মৃত্যুমুখে পতিত হতে পারে। এ রোগ গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, কুকুর, বিড়াল ইত্যদিসহ প্রায় সব প্রাণীতেই হতে পারে।

কারণ

এ রোগের কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ জানা না গেলেও নিম্নোক্তগুলোকে এজন্য দায়ী করা হয়। যথা—

- ◆ পূর্ণগর্ভাবস্থায় পশু হৃষ্টাং পড়ে গেলে।
- ◆ দেহের গাঠনিক বিন্যাসের কারণে।
- ◆ পাহাড়ি চারণভূমি বা বাসভূমির পশ্চতে।
- ◆ অশিথিল জরায়ুগ্রীবায় প্রসব বেদনা।
- ◆ পঁজজরায়ু।

লক্ষণ

- ◆ প্রাথমিক অবস্থায় ১০০% পশুর প্রসব বেদনা থাকে যা পরবর্তীতে হাস পায়।
- ◆ ক্ষুধামন্দা ও কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়।
- ◆ পশু প্রচুর পানি পান করে।
- ◆ যোনিনালি অপ্রশঙ্খ বা সংকীর্ণ থাকে।

রোগ নির্ণয়

- ◆ পূর্ণসং গর্ভাবস্থা ও প্রসবের লক্ষণ প্রকাশের পর বাচ্চা প্রসব না করেই প্রসব বেদনা বন্ধ হওয়ার ইতিহাস জেনে।
- ◆ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ দেখে।
- ◆ মলাধার ও যোনির মধ্যে হাত দিয়ে ফিটাসের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে।

চিকিৎসা

প্রধানত দুটো অবস্থায় জরায়ু পাকের চিকিৎসা করা হয়। যথা—

১. ফিটাস মৃত হলে—
 - ◆ দক্ষতার সঙ্গে উদর গহবরে অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ করে তা ঘুরিয়ে জরায়ু পাক সংশোধন করা যায়।
২. সিজারিয়ান সেকশনের মাধ্যমে—
 - ◆ এ পদ্ধতিতে অঙ্গোপচারের মাধ্যমে উদর ছেদ করে জরায়ু পাক চিকিৎসা করা যায়।

জরায়ু-যোনি নির্গমন (Utero-vaginal Prolapse)

স্ত্রী পশুর জরায়ু ও যোনির শেঞ্চা পর্দা সম্পূর্ণ বা আংশিক যোনিদার দিয়ে বেরিয়ে যাওয়াকে জরায়ু-যোনির নির্গমন বলে। অবশ্য আলদা আলাদাভাবে জরায়ু বা যোনির নির্গমনও ঘটতে পারে। জরায়ু-যোনির নির্গমন তিন প্রকার। যেমন— সাধারণ নির্গমন, মাঝারি নির্গমন ও তীব্র নির্গমন।

কারণ

যদিও জরায়ু-যোনি নির্গমনের সঠিক কারণ জানা যায় নি, তথাপি নিম্নলিখিতগুলোকে এজন্য দায়ী করা হয়। যথা—

- ◆ গর্ভাবস্থার শেষ পর্যায়ে প্রোজেস্টেরন হরমোন নিঃসরণ করে গিয়ে ইন্স্ট্রোজেন হরমোন নিঃসরণ বেড়ে গিয়ে অস্থিবন্ধনি ও জননতন্ত্রের সংযোগসমূহ শিথিল হলে।
- ◆ দেহে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অভাব হলে।
- ◆ অদক্ষ লোকের সাহায্যে আটকে যাওয়া গর্ভফুল বের করলে।
- ◆ যমজ বাচ্চাজনিত বা অন্য কোনো কারণে প্রসববিঘ্ন ও জোড়পূর্বক বাচ্চা বের করলে।
- ◆ যোনির চারপাশের সংযোজক কলায় অত্যধিক চর্বি জমলে।

লক্ষণ

এটি জরায় ও যোনির নির্গমনের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে। তবে, নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখা যায়।

যেমন—

- ◆ যোনিহার দিয়ে বেরিয়ে পড়া অঙ্গে ক্ষত ও অপচিতি হয়ে রক্তদুষ্টির সৃষ্টি হয়।
- ◆ ক্ষুধামন্দা ও স্বাস্থ্যহানি ঘটে এবং পশু মারা যায়।

চিকিৎসা

সাধারণত রোগের তীব্রতার ওপর চিকিৎসা নির্ভর করে। তবে, আক্রান্ত প্রাণীতে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা না হলে স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে এবং জীবাণু সংক্রমনের ফলে রক্তদুষ্টি হয়ে পশু মারা যেতে পারে। রোগের তীব্রতার ওপর চিকিৎসা নির্ভর করলেও নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সাধারণভাবে করতে হয়।

যেমন—

- ◆ প্রথমে পশুকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- ◆ অতঃপর একটি ভালো জীবাণুনাশক, যেমন— অ্যাক্রিফ্লাভিন সলুশন দিয়ে আক্রান্ত স্থান ধরে দিতে হবে।
- ◆ এরপর ঠান্ডা পানি, বরফ বা চিনি প্রয়োগ করে জরায়ু সংকুচিত করতে হবে।
- ◆ জরায়ু সংকুচিত হলে আঙুলের সাহায্যে তা ভিতরে চুকিয়ে কিছুক্ষণ চাপ দিয়ে রাখলে সাধারণ প্রকৃতির নির্গমন ঠিক হয়ে যায়। ছোট পশুতে অনেকসময় যোনিমুখে ট্রাস লাগাতে হয়।
- ◆ অনেক সময় প্রোজেস্টেরন হরমোন ইনজেকশন করতে হয়।
- ◆ বড় পশুর ক্ষেত্রে এমনকী যোনি সেলাইয়ের ও প্রয়োজন পড়তে পারে।
- ◆ পশুকে শাস্ত রাখার জন্য উভেজনা নিয়ন্ত্রণকারী ওষুধ, যেমন— হাইসোমাইড বা লারগ্যাকটিল মাংসপেশিতে প্রয়োগের প্রয়োজন পড়ে।

গর্ভফুল আটকে যাওয়া (Retained Placenta)

পশু বাচ্চা প্রসবের পর প্রধানত হরমোনের প্রভাবে ও জরায়ুর মাংসপেশির সংকোচনের ফলে সাধারণত ১/২-১২ ঘন্টার মধ্যে গর্ভফুল বা প্ল্যাসেন্টা পড়ে যায়। গাভী বা অন্য স্ত্রী পশু বাচ্চা প্রসবের ২৪ ঘন্টার মধ্যে স্বাভাবিকভাবে গর্ভফুল না পড়লে তাকে গর্ভফুল আটকে যাওয়া বলে।

কারণ

- ◆ অস্বাভাবিক সংক্ষিপ্ত ও দীর্ঘ গর্ভকাল।
- ◆ যমজ বাচ্চা বা জোরপূর্বক বাচ্চা টেনে বের করা।
- ◆ গর্ভপাত, মৃত বাচ্চা প্রসব ও প্রসববিঘ্ন (Dystocia)।
- ◆ সংক্রমণজনিত গর্ভফুলপ্রদাহ।
- ◆ ইন্স্ট্রোজেন হরমোনের অভাব।

- ◆ জরায়ুর শিথিলতা বা নিক্ষিয়তা।
- ◆ পুষ্টির অভাব।
- ◆ খৃতু, অধিক বয়স ইত্যাদি।

লক্ষণ

- ◆ গর্ভফুল যোনিমুখে ঝুলে থাকে।
- ◆ খাদ্য গ্রহণে অনীহা, দুর্বলতা, জ্বর ইত্যাদি দেখা যায়।
- ◆ বেশিদিন হলে জরায়ুপ্রদাহ ও রক্তদুষ্টি হয়।

চিকিৎসা

গর্ভফুল ঝুলে থাকা, খাদ্য গ্রহণে অনীহা, দুর্বলতা, জ্বর ইত্যাদি গর্ভফুল আটকে যাওয়ার লক্ষণ।

- ◆ দেহে জ্বর না থাকলে এবং ৪৮ ঘন্টা পার হয়ে গেলে হাত দিয়ে টেনে গর্ভফুল বের করা যায়। তবে, এ পদ্ধতিতে যথেষ্ট সর্তকতা অবলম্বন ও জীবাণুমুক্ত না হলে যথাক্রমে জরায়ুতে ক্ষত ও জীবাণু সংক্রমণ হতে পারে।
- ◆ জ্বর থাকলে অবশ্যই ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে। এক্ষেত্রে গাভীর জন্য ২.৫-৩.০ মি.লি. এবং ছাগী ও ভেড়ীর জন্য ১ মি.লি মাত্রায় অক্সিটেসিন মাস্সপেশিশে ইনজেকশন করতে হবে।
- ◆ এছাড়া প্রোস্টাগ্যাস্টিন এফ্. আলাফাও প্রয়োগ করা যায়।
- ◆ গর্ভফুল পড়ার পর যে কোনো একটি জীবাণুনাশক ওষুধ (যেমন— অ্যাক্রিফ্লাইন ০.১%) দিয়ে ধুয়ে ভেটেরিনারি সার্জনের পরামর্শমতো যে কোনো একটি অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে।

অত্যধিক রক্তপাতের ফলে পশু মারা যেতে পারে।

জরায়ুর রক্তস্রাব (Uterine Bleeding)

প্রস্বোত্তর বিভিন্ন কারণে জরায়ু থেকে রক্তক্ষরণ হতে পারে। অত্যধিক রক্তপাতের ফলে পশু মারা যেতে পারে।

কারণ

- ◆ আটকে যাওয়া গর্ভফুল জোর করে টেনে বের করলে।
- ◆ জরায়ু নিক্ষিয়তার জন্য সংকোচনের অভাবে।
- ◆ টেনে হেঁচড়ে বাচ্চা বের করলে।
- ◆ ফিটাস ছেদনের সময় আঘাত লাগলে।

লক্ষণ

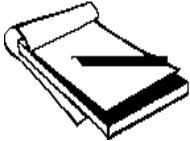
- ◆ অত্যধিক রক্তপাতে পশুর দেহের তাপমাত্রা কমতে থাকে।
- ◆ শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত হয়।
- ◆ চোখের পর্দা ফ্যাকাশে হতে থাকে।
- ◆ অবশেষে পশু মারা যায়।

চিকিৎসা

রক্তক্ষরণ বন্ধ করার জন্য নির্ধারিত মাত্রায় অ্যাড্রেনালিন, কোয়াঙ্গলেন, ক্যাপালিন, মেথারজিন প্রভৃতি ওষুধ ইনজেকশন আকারে প্রয়োগ করতে হবে।

- ◆ অগ্ন রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে ঠান্ডা বরফগলা পানির সঙ্গে ফিটকিরি বা পটাস অ্যালাম মিশিয়ে জনন তন্ত্রে সেচন করতে হবে।
- ◆ রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে নির্ধারিত মাত্রায় অ্যাড্রেনালিন, কোয়াঙ্গলেন, ক্যাপালিন, মেথারজিন প্রভৃতি ওষুধ ইনজেকশন আকারে প্রয়োগ করতে হবে।

- ◆ নির্ধারিত মাত্রায় ডেক্সট্রজ স্যালাইন ও ক্যালসিয়াম সল্শন শিরা ও চামড়ার নিচে ইনজেকশন করতে হবে।



অনুশীলন (Activity) ১০ টপরে আলোচিত স্তৰী পশুর জননতন্ত্রের বিভিন্ন রোগের নাম, কারণ, লক্ষণ ও চিকিৎসা সংক্ষেপে ছকের মাধ্যমে লিখুন।

পশুর সংক্রামক গর্ভপাত বা ব্রুসেলোসিস (Brucellosis)

গবাদিপশুর প্রজনন ব্যহতকারী সংক্রামক রোগের মধ্যে ব্রুসেলোসিস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ রোগ মানুষের মধ্যে সংক্রমিত হতে পারে। গর্ভবস্থার শেষ পর্যায়ে গর্ভপাত এবং পরবর্তীতে প্রজনন অক্রমতা এ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

কারণ

Brucella (ক্রসেলা) গণভুক্ত কয়েক প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া মানুষ ও গবাদিপশুতে ব্রুসেলোসিস রোগ সৃষ্টি করে। যেমন— *Brucella abortus* (ক্রসেলা অ্যাবোরটাস) গরুমহিষে, *Brucella melitensis* (ক্রসেলা মেলিটেনসিস) ছাগলভেড়ায়, *Brucella ovis* (ক্রসেলা ওভিস) ভেড়ায়, *Brucella canis* (ক্রসেলা ক্যানিস) কুকুরে রোগ সৃষ্টি করে। *Brucella ovis* ছাড়া অন্য সবগুলো ব্যাকটেরিয়া মানুষে আক্রান্ত হতে পারে।

লক্ষণ

- ◆ গর্ভপাত এবং জ্ঞাবরণ নির্গমনে ব্যাঘাত ও অনুর্বরতা এ রোগের প্রধান লক্ষণ।
- ◆ সাধারণত গর্ভকালের ৫-৭ মাসের মাথায় গর্ভপাত হয়।
- ◆ জীবাণু আক্রমণের ফলে জরায়ুর অন্তরাবরণিকার প্রদাহ দেখা দেয়। ফলে গর্ভপাতের পর জরায়ু সংকোচনে বিলম্ব ঘটে।
- ◆ পুঁজযুক্ত স্বাব নির্গত হয়।
- ◆ গর্ভপাতের পর অধিকাংশ গরুমহিষ বহুদিন পর্যন্ত অনুর্বর থাকে।

রোগ নির্ণয়

গর্ভবস্থার ৫-৭ মাসের পর গর্ভপাতের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রোগলক্ষণ থেকে প্রাথমিকভাবে এ রোগ নির্ণয় করা হয়।

চিকিৎসা

- ◆ ব্রুসেলোসিস রোগের চিকিৎসা বর্তমানে সাধারণত করা হয় না।
- ◆ সালফাডায়াজিন ও অধিকাংশ অ্যাস্টিবায়োটিক এ জীবাণু ধ্বংস করতে সক্ষম। তাই ভেটেরিনারি সার্জনের পরামর্শমতো এগুলো দিয়ে চিকিৎসা করানো যেতে পারে।

প্রতিরোধ

- ◆ স্বাস্থ্যসম্মত বিধিব্যবস্থা সঠিকভাবে পালনের মাধ্যমে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়।
- ◆ রোগপ্রতিরোধের জন্য, বিশেষত *Brucella abortus* এর বিরুদ্ধে টিকা দেয়া যায়। তবে, বাংলাদেশে এ টিকা প্রস্তুত হয় না।

লিস্টেরিওসিস (Listeriosis)

লিস্টেরিওসিস মানুষসহ অন্যান্য প্রায় সব পশুপাখির একটি সংক্রামক রোগ। রক্তদুষ্টি, গর্ভপাত ও মেনিনজো-এনসেফালাইটিস এ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বর্তমানে সাধারণত ব্রুসেলোসিস রোগের চিকিৎসা করা হয় না।

লিস্টেরিওসিস মানুষসহ
অন্যান্য প্রায় সব পশুপাখির
একটি সংক্রামক রোগ।

কারণ

Listeria monocytogenes (লিস্টেরিয়া মনোসাইটোজেনিস) নামক এক ধরনের ব্যাকটেরিয়ার ৫টি সিরোটাইপ মানুষসহ ৩৭ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, ১৭ প্রজাতির পাখি ও মাছকে আক্রান্ত করে। প্রায় সব বয়সের পশ্চাপাখি এতে আক্রান্ত হয়।

লক্ষণ

লিস্টেরিওসিস রোগ প্রধানত তিনি প্রকৃতির লক্ষণ প্রকাশ করে। যেমন—
সেপ্টিসেমিয়া প্রকৃতি : সাধারণত সরল পাকস্থলীবিশিষ্ট ও বাচ্চা রোমহুক পশ্চতে এ প্রকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পায়। এ প্রকৃতিতে—

- ◆ অবসাদ, দুর্বলতা, জ্বর ও ডায়রিয়া দেখা দেয়।
- ◆ স্বাস্থ্যের অবনতি হয়।
- ◆ সবশেষে অক্ষিগোলক ও মস্তিষ্কের বিল্লির প্রদাহে ১২ ঘন্টার মধ্যে আক্রান্ত পশু মারা যায়।

২. ভিসেরাল প্রকৃতি :

- ◆ গর্ভবস্থার প্রথম পর্যায়ে সংক্রমণ হলে গর্ভপাত হয়।
- ◆ গর্ভবস্থার শেষে পর্যায়ে সংক্রমণ হলে মৃত বাচ্চা প্রসব করে।
- ◆ গর্ভপাতের পর গর্ভফুল আটকে যায়।

৩. মেনিজো-এ্যানসেফালিইটিস প্রকৃতি :

- ◆ ঘূর্ণি হয় ও মাথা একদিকে কাত হয়ে থাকে।
- ◆ মুখমন্ডলের এক বা উভয়পাশে পক্ষাঘাত দেখা দেয়।
- ◆ লালা নিঃসরণ হয় ও মুখে খাদ্য ঝুলে থাকে।
- ◆ জ্বর হয় ও শেষে শাসীয় অকৃতকার্যতায় পশু মারা যায়।

চিকিৎসা

- ◆ তৈরি প্রকৃতির রোগে ও রোগের শেষ অবস্থায় চিকিৎসায় সুফল পাওয়া যায় না।
- ◆ বেশকিছু অ্যান্টিবায়োটিক এ রোগে কাজ করে না। তবে, টেট্রাসাইক্লিন ও ক্লোরামফেনিকল ভালো কাজ করে। ভেটেরিনারি সার্জনের পরামর্শমতো নির্ধারিত মাত্রায় এগুলো ব্যবহারে সুফল পাওয়া যেতে পারে।

রোগপ্রতিরোধ

- ◆ স্বাস্থসম্মত বিধিব্যবস্থা সঠিকভাবে মেনে চলতে হবে।
- ◆ লাইভ অ্যাটেনিউয়েটেড টিকার মাধ্যমে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়। তবে, এ টিকা এদেশে তৈরি করা হয় না।

ক্যাম্পাইলোব্যাকটেরিওসিস (Campylobacteriosis) বা ভিব্রিওসিস (Vibriosis)
ভিব্রিওসিস রোগের নতুন নামই হচ্ছে ক্যাম্পাইলোব্যাকটেরিওসিস। এ রোগে মানুষসহ বিভিন্ন পশু আক্রান্ত হয়।

কারণ

Campylobacter foetus (ক্যাম্পাইলোব্যাকটার ফিটাস) নামক ব্যাকটেরিয়ার কয়েকটি ভ্যারাইটি ও উপপ্রজাতি গরু, ছাগল, ভেড়া, মানুষ ও শুকরে এ রোগ সৃষ্টি করে।

লক্ষণ

- ◆ গর্ভপাত ও প্রজনন অক্ষমতা এ রোগের প্রধান লক্ষণ।
- ◆ অনেক সময় ডায়ারিয়া এবং ডিসেন্ট্রি বা আমাশয় দেখা যায়।
- ◆ পানশূন্যতা হতে পারে।

রোগের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ দেখে প্রাথমিকভাবে রোগ নির্ণয় করা হয়।

রোগ নির্ণয়

- ◆ রোগের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ দেখে প্রাথমিকভাবে রোগ নির্ণয় করা হয়।

চিকিৎসা

- ◆ ফুরাজোলিডন, জেন্টামাইসিন, অ্যামোক্রিসিলিন প্রভৃতি অ্যান্টিবায়োটিকের মাধ্যমে এ রোগ চিকিৎসা করা যায়।
- ◆ পানশূন্যতা সাড়াতে ডেক্সট্রোজ স্যালাইন ইনজেকশন করা যায়।

ক্লামাইডিয়ার আক্রমণে গরু, ছাগল ও ভেড়াতে গর্ভপাত হয়।

ক্লামাইডিয়াজনিত গর্ভপাত (Chlamydial Abortion)

ক্লামাইডিয়া জীবাণুর আক্রমণে গরু, ছাগল ও ভেড়াতে গর্ভপাত হয়।

লক্ষণ

- ◆ সাধারণত বাচ্চা প্রসবের নির্ধারিত সময়ের ২-৪ সপ্তাহ পূর্বে গর্ভপাত হয়।
- ◆ বাচ্চা অপুষ্ট ও মৃত হয়।

ইতিহাস ও লক্ষণ থেকে রোগ নির্ণয় করা যায়।

রোগ নির্ণয়

- ◆ রোগের ইতিহাস ও লক্ষণ থেকে এ রোগ নির্ণয় করা যায়।
- ◆ তাছাড়া বিভিন্ন অসের রোগতাত্ত্বিক পরিবর্তনও এ রোগ নির্ণয়ে সহায়তা করে।

চিকিৎসা

দীর্ঘস্থায়ী বা লং অ্যাকটিং অক্সিট্রেট্রাসাইক্লিন পশ্চতে প্রতি কেজি ওজনের জন্য ২০ মি.গ্রা. মাত্রায় মাসপেশিতে ইনজেকশন করলে সুফল পাওয়া যায়।

ট্রাইকোমোনিয়াসিস (Trichomoniasis)

এক প্রকার প্রোটোজোয়ার আক্রমণে গাড়ীতে বোভাইন ট্রাইকোমোনিয়াসিস রোগ হয়। এ রোগকে ট্রাইট্রাইকোমোনিয়াসিসও বলে।

কারণ

Trichomonas foetus (ট্রাইট্রাইকোমোনাস ফিটাস) বা *Trichomonas foetus* (ট্রাইকোমোনাস ফিটাস) নামক একপ্রকার এককোষি পরজীবী (Protozoan Parasite) এ রোগের কারণ।

লক্ষণ

- ◆ পাল দেয়ার ১-৬ সপ্তাহের মধ্যে গাড়ীর গর্ভপাত হয়।
- ◆ গর্ভপাতকৃত জ্বর এত ছেট থাকে যে তা পালনকারীর নজর এড়িয়েও যেতে পারে।
- ◆ গাড়ী অনিয়মিতভাবে গরম হয়, কিন্তু পাল রাখে না।

Trichomonas foetus রোগে
পাল দেয়ার ১-৬ সপ্তাহের
মধ্যে গাড়ীর গর্ভপাত হয়।

ট্রাইকোমোনিয়াসিস
পাল দেয়ার ১-৬ সপ্তাহের
মধ্যে গাড়ীর গর্ভপাত হয়।

- ◆ মোনি ও জরায়ুপ্রদাহের ফলে স্বাব নির্গত হয়।
- ◆ গর্ভপাতের পর গর্ভফুল না পড়লে পুঁজযুক্ত এডোমেট্রাইটিস হতে পারে।
- ◆ জরায়ুআবী বন্ধ থাকলে পায়োমেট্রা হতে পারে।
- ◆ গর্ভপাত না হলে অনেক সময় বিশুক্ষ বা মামিফাইড ফিটাস (Mummified Foetus) রূপান্তরিত হতে পারে।

রোগ নির্ণয়

- ◆ রোগের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ দেখে প্রাথমিকভাবে রোগ নির্ণয় করা যায়।
- ◆ তবে, সুনির্দিষ্টভাবে রোগ নির্ণয়ের জন্য প্রোটোজেয়া শণাক্ত ও পৃথক করতে হবে।

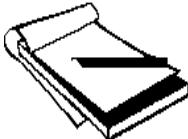
চিকিৎসা

- ◆ সাধারণত গর্ভপাতের পর গাড়ী এমনিতেই ভালো হয়ে উঠে। তবে, গাড়ীর যোনিপথ জীবাণুনাশক পদার্থ, যেমন— অ্যাক্রিফ্লুভিন প্লারা ৫-৬ দিন ফ্লাশ করলে ভালো হয়।
- ◆ জরায়ুতে পুঁজ হলে তা জীবাণুনাশক পদার্থ দিয়ে ফ্লাশ করে ভেটেরিনারি সার্জনের পরামর্শমতো জরায়ুতে কোনো একটি ওষুধ প্রবেশ করাতে হবে।

রোগপ্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ

- ◆ গর্ভপাতকৃত গাড়ী তিন মাসের মধ্যে গরম হলেও তাকে পাল না দিয়ে বিশ্রামে রাখতে হবে।
- ◆ পাল দেয়ার পূর্বে গাড়ীকে ভালোভাবে পরীক্ষা করতে হবে এবং কৃত্রিমভাবে প্রজনন করাতে হবে।
- ◆ আক্রান্ত শাঁড়কে জবাই বা খোঁজা করে ফেলতে হবে।

অনুশীলন (Activity) ৪ শাঁড় ও গাড়ীর অনুর্বরতার মধ্যকার পার্থক্যসমূহ লিখুন।



স্ত্রী জনন অঙ্গ অপেক্ষা পুরুষ জনন অঙ্গে রোগব্যাধি তুলনামূলকভাবে কম হলেও এগুলোর গুরুত্বও কোনো অংশে কম নয়। কোনো কোনো রোগ, যেমন— ট্রাইকোমেনিয়াসিস পুরুষ পশুর মাধ্যমে স্ত্রী পশুতে ছড়াতে পারে। পুরুষ প্রজনন অঙ্গের বিভিন্ন রোগের মধ্যে শুক্রাশয়প্রদাহ এপিডিডাইমাইটিস, জলকোষ, বীর্যস্থলী প্রদাহ, ব্যালানোপসথাইটিস, ফাইমোসিস, বৃহমুদা বা প্যারাফাইমোসিস ইত্যাদি প্রধান। এখানে এগুলোর কয়েকটি অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

শুক্রাশয়প্রদাহ (Orchitis)

প্রধানত শাঁড়, ভেড়া ও পাঠায় শুক্রাশয়প্রদাহ বেশি দেখা যায়। ক্রসেলোসিস, যক্ষারোগ, ভাইরাসজনিত রোগ, অ্যাকটিনোব্যাসিলোসিস, আঘাত, সিস্টেমিক বা তান্ত্রিক রোগ প্রভৃতি কারণে এ রোগ হতে পারে। এতে একটি বা দুটো অভকোষই আক্রান্ত হতে পারে। অভকোষ গরম হয়, ফুলে যায় ও ব্যাথা করে। রোগ দীর্ঘদিন স্থায়ী হলে পুঁজ স্থিত হতে পারে। এতে শুক্রাশয়ের জনন ক্ষমতা লোপ পায়। কুসুম গরম পানির সাথে বোরিক অ্যাসিড বা ম্যাগনেসিয়াম সালফেট মিশিয়ে ছ্যাক দিলে অভকোষ ফোলা করে যায়। জীবাণু সংক্রমণের ক্ষেত্রে ভেটেরিনারি সার্জনের পরামর্শ অনুযায়ী অ্যাস্টিবারোটিক প্রয়োগ করতে হয়।

বীর্যস্থলী প্রদাহ (Seminal Vesiculitis)

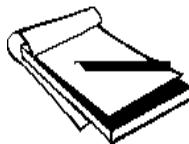
কয়েক ধরনের ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস এবং মাইকোপ্লাজমার আক্রমণে প্রধানত ষাঁড়ে এ রোগ হয়। এ রোগে প্রদাহের কারণে ষাঁড়ের সেমিনাল ভেসিকল ফুলে ঘাবে ও এর লিভিউলগুলো রেকটাল পরীক্ষায় বুরু ঘাবে না। বীর্যে পুঁজের স্তর দেখা যেতে পারে। এ বীর্য ব্যবহারে গাড়ী গর্ভবতী হলে ৬০–৯০ দিনের মধ্যে গর্ভধারণ অক্ষমতা ও জনের মৃত্যু ঘটবে। ভেটেরিনারি সার্জনের পরামর্শমতো কারণ অনুযায়ী এ রোগের চিকিৎসা করাতে হবে। তবে, *Brucella* জীবাণুর কারণে হলে চিকিৎসায় কোনো লাভ হবে না।

ব্যালানোপসথাইটিস (ইধ্বধহড়ড়ংয়রংং)

পুঁজিসের মূল বা অগভাগের প্রদাহকে ব্যালানাইটিস এবং লিঙ্গচর্মের প্রদাহকে পসথাইটিস বলে। আর যখন একসঙ্গে এ দুটোর প্রদাহ হয়, তখন তাকে ব্যালানোপসথাইটিস বলে।

পুঁজিসের মূল বা অগভাগের (Glans Penis) প্রদাহকে ব্যালানাইটিস (Balanitis) এবং লিঙ্গচর্মের (Prephce) প্রদাহকে পসথাইটিস (Posthitis) বলে। আর যখন একসঙ্গে এ দুটোর প্রদাহ হয়, তখন তাকে ব্যালানোপসথাইটিস বলে। এ রোগে প্রধানত ষাঁড়, ভেড়া, ও পাঠা বেশি আক্রান্ত হয়। প্রধানত *Corynebacterium renale* এবং *Escherichia coli* এ রোগ সৃষ্টি করে। তবে এর সঙ্গে আরও অন্যান্য কারণও থাকতে পারে। এ রোগে আক্রান্ত পশুর লিঙ্গচর্মে প্রদাহ ও পুঁজ হয়। প্রদাবের সাথে এ পুঁজ বেরিয়ে আসে। অনেক সময় মাছি এখানে মায়াসিস সৃষ্টি করে। মাছির মাধ্যমে সুস্থ পশুতে এ রোগ ছড়াতে পারে। প্রদাব বন্ধ হলে ইউরিমিয়া, টাঞ্জিমিয়া ও সেপ্টিসেমিয়ার কারণে পশু মারা যেতে পারে। চিকিৎসার জন্য জীবাণুনাশক ওষুধ, যেমন—অ্যাক্রিফ্লাভিন দিয়ে প্রিপিউস গহর প্রতিদিন ঘোত করতে হবে। এছাড়াও ভেটেরিনারি সার্জনের পরামর্শমতো অ্যান্টিবায়োটিক ও অন্যান্য ওষুধ নির্ধারিত মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে। পশুকে সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে ও স্বাস্থ্যসম্ভাবে পালন করতে হবে।

অনুশীলন (Activity) ৪ ষাঁড়ের শুক্রাশয়প্রদাহ, বীর্যস্থলী প্রদাহ ও ব্যালানোপসথাইটিস রোগের মধ্যকার প্রধান পার্থক্যগুলো লিপিবদ্ধ করুণ।



সারমর্ম ৪ জনন অঙ্গ পশুর বংশবৃদ্ধির অঙ্গ। এ অঙ্গও আক্রান্ত হতে পারে বিভিন্ন রোগে। স্ত্রী পশুর জনন অঙ্গের বিভিন্ন রোগের মধ্যে জরায়ুপ্রদাহ, পুঁজজরায়ু, জরায়ুগীবা প্রদাহ, ভালবো-ভ্যাজাইনাইটিস, গর্ভপাত, জরায়ু পাক, জরায়ু-মোনি নির্গমন, গর্ভফুল আটকে ঘাওয়া, জরায়ুর রক্তস্নাব, ক্রসেলোসিস, লিস্টেরিওসিস, ভিত্রিওসিস, ক্ল্যামাইডিয়াজনিত গর্ভপাত, ট্রাইকোমোনিয়াসিস ইত্যাদি প্রধান। পুরুষ পশুর জনন অঙ্গের বিভিন্ন রোগের মধ্যে শুক্রাশয়প্রদাহ, এপিডিডাইমাইটিস, জলকোষ, বীর্যস্থলী প্রদাহ, ব্যালানোপসথাইটিস, ফাইমোসিস, প্যারাফাইমোসিস ইত্যাদি প্রধান। স্ত্রী জনন অঙ্গের রোগ পুরুষ জনন অঙ্গের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশি এবং এগুলোর গুরুত্বও বেশি। গবাদিপশুর জনন অঙ্গের বিভিন্ন ধরনের রোগে উৎপাদনহাস, প্রজনন অক্ষমতা প্রত্যনিষহ পশুর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। এসব রোগ সঠিকভাবে চিকিৎসা ও প্রতিরোধ করার জন্য ভেটেরিনারি সার্জনের পরামর্শমতো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।



পাঠোভর মূল্যায়ন ৫.৪

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. কোন্ প্রোটোজোয়া ছাগী ও ভেড়ীতে জরায়ুপ্রদাহ সৃষ্টি করে?

- i) *Toxoplasma gondii*
- ii) *Trichomonas foetus*
- iii) *Balantidium coli*
- iv) *Entamoeba histolytica*

খ. পুঁজরায়ু রোগে কী রঙের স্বাব নির্গত হয়?

- i) সাদাটে
- ii) নীলচে
- iii) সবুজ বা হলদেটে
- iv) হলুদ বা লালচে

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. গর্ভপাত সংক্রামক ও অসংক্রামক দুই কারণেই হয়।

খ. প্রোজেস্টেরন হরমোনের অভাবে গর্ভফুল আটকে থাকে।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. অত্যধিক রক্তপাতে দেহের _____ কমতে থাকে।

খ. ব্রসেলোসিস রোগে গাড়ীর _____ মাসের গর্ভাবস্থায় গর্ভপাত হয়।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. ট্রাইকোমোনিয়াসিস রোগে গাড়ীতে কখন গর্ভপাত হয়?

খ. পুরুষ পশুর প্রজনন অঙ্গের তিনটি রোগের নাম লিখুন।

ব্যবহারিক

পাঠ ৫.৫ পশুর জনন অঙ্গে ওষুধ প্রয়োগ

এ পাঠ শেষে আপনি –

- গাভীর জরায় বা যোনিতে নিজ হাতে পেসারি প্রয়োগ করতে পারবেন।



স্ত্রী পশুর জনন অঙ্গে পেসারি
প্রবেশ করানো হয়।

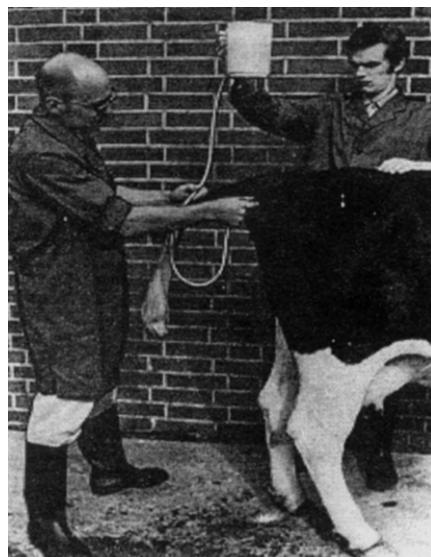
প্রাসঙ্গিক তথ্য

পশুর জনন অঙ্গে, বিশেষ করে স্ত্রী পশুর জনন অঙ্গের বিভিন্ন রোগচিকিৎসায় ওষুধ প্রয়োগের প্রয়োজন পড়ে। স্ত্রী পশুর জনন অঙ্গ অর্থাৎ জরায় ও যোনিতে পেসারি (Passary) প্রয়োগ করা হয়। পেসারি এক ধরনের কঠিন ওষুধ যা দেখতে কতকটা বড় বা ট্যাবলেটের মতো। সাধারণত অ্যান্টিবায়োটিকজাতীয় ওষুধ পেসারি হিসেবে স্ত্রী পশুর জনন অঙ্গে প্রয়োগ করা হয়। এ পাঠে গাভীর জরায় বা যোনিতে পেসারি প্রয়োগ করার পরিক্ষণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

গাভীর জরায় বা যোনিতে পেসারি প্রয়োগ

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. গাভী— একটি।
২. পেসারি— প্রয়োজনমতো।
৩. জনন অঙ্গ খোত করার জন্য অ্যান্টিসেপ্টিক, যেমন— অ্যাক্রিল্যাভিন— প্রয়োজনমতো।
৪. ডুশ ক্যান (নলসহ)— ১টি।
৫. জীবাণুনাশক ক্রিম— প্রয়োজনমতো।
৬. পরিষ্কার পানি— প্রয়োজনমতো।
৭. সাবান— ১টি।
৮. তোয়ালে— ১টি।
৯. ব্যবহারিক খাতা, পেন্সিল, কলম, রাবার, সার্পনার, ক্ষেল ইত্যাদি।



চিত্র ৪৬ : জীবাণুনাশক ওষুধ দিয়ে গাভীর জরায় ও যোনি খোতকরণ

কাজের ধারা

- ◆ প্রথমে সাবান ও পানি দিয়ে হাত ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিন।
- ◆ অতঃপর হাতে জীবাণুনাশক ক্রিম লাগান।
- ◆ ডুশ ক্যানটি নিন। এতে প্রয়োজনীয় মাত্রায় তরল অ্যাক্রিফ্লাইডিন নিয়ে আক্রান্ত গাভীর জরায়ু বা যোনি পরিষ্কার করে ঘৌত করুন।

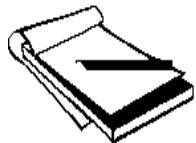


চিত্র ৪৭ : গাভীর জরায়ুতে ওষুধ প্রয়োগ

- ◆ ভালোভাবে ঘৌত হয়ে গেলে ডুশ ক্যান সরিয়ে নিন। লক্ষ্য রাখবেন, ঘৌত করার পর জরায়ু বা যোনিতে যেন কোনো তরল পদার্থ না থাকে।
- ◆ এবার যে হাতটির মাধ্যমে পেসারি চুকাবেন তা ভালোভাবে সাবান পানি দিয়ে পরিষ্কার করুন ও তাতে জীবাণুনাশক ক্রিম লাগান।
- ◆ পেসারি হাতে নিন ও হাত যোনি বা জরায়ুতে সাবধানে ওষুধসহ প্রবেশ করান।
- ◆ এবার পেসারি সুন্দর ও সঠিকভাবে জরায়ু বা যোনিতে স্থাপন করুন।
- ◆ অতঃপর হাতটি আস্তে আস্তে জনন অঙ্গ থেকে বের করে আনুন।
- ◆ হাত পরিষ্কার করুন ও তোয়ালে দিয়ে মুছে নিন।
- ◆ পুরো পরীক্ষণটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখুন এবং মূল্যায়নের জন্য তা টিউটরকে দেখান ও সই নিন।

সাবধানতা

- ◆ কখনও অপরিষ্কার হাত জনন অঙ্গে প্রবেশ করাবেন না।
- ◆ হাত এমনভাবে প্রবেশ করাবেন যেন পশু কোনো ব্যাথা না পায়।
- ◆ যথেষ্ট সর্তকতার সঙ্গে কাজটি করবেন।
- ◆ অনর্থক লোকজনকে ভীড় করতে দেবেন না।



চূড়ান্ত মূল্যায়ন - ইউনিট ৫

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন

- ১। পশ্চতে ভিটামিন এ এর অভাবে কী কী সমস্যা হয়?
- ২। ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ভিটামিন ডি এর অভাব কীভাবে পশ্চতে প্রকাশ পায়?
- ৩। কীভাবে ভিটামিন ই এর অভাব প্রতিরোধ করা যায়?
- ৪। পশ্চতে কীভাবে ভিটামিন কে এর অভাব নির্ণয় করবেন? এর চিকিৎসা লিখুন।
- ৫। দেহের জন্য অত্যাবশ্যকীয় খণ্ডপদার্থগুলোর নাম লিখুন।
- ৬। সোডিয়াম, পটাসিয়াম ও ক্লোরিনের অভাবে কী কী রোগলক্ষণ প্রকাশ পায়? কীভাবে এগুলোর চিকিৎসা করবেন?
- ৭। পশ্চতে ম্যাঙ্গানিজ ও জিঙ্কের অভাবের কারণ লিখুন।
- ৮। আয়োডিনের অভাবে কী হয়? কীভাবে এর চিকিৎসা করবেন।
- ৯। সেলেনিয়ামের অভাবে কী হয়? এর অভাবের কারণগুলো লিপিবদ্ধ করুন।
- ১০। অনুর্বরতা কী? গাভীতে অনুর্বরতার কারণগুলো কী কী?
- ১১। ঘাঁড়ের অনুর্বরতার কারণ ও চিকিৎসা বর্ণনা করুন।
- ১২। গাভীর জনন অঙ্গের বিভিন্ন রোগের তালিকা লিপিবদ্ধ করুন।
- ১৩। জরায়ুপ্রদাহের লক্ষণ বর্ণনা করুন।
- ১৪। ক্রসেলোসিস ও ট্রাইকোমোনিয়াসিস রোগের প্রধান প্রধান পার্থক্যগুলো লিখুন।
- ১৫। ঘাঁড়ের জনন অঙ্গের বিভিন্ন রোগের নাম লিখুন ও শুক্রাশয়প্রদাহ সম্পর্কে লিখুন।



উত্তরমালা - ইউনিট ৫

পাঠ ৫.১

- ১। ক. i ১। খ. iv ২। ক. মি ২। খ. স ৩। ক. অস্টিওম্যালাসিয়া ৩। খ. সেলেনিয়ামের
৪। ক. জেরোপথ্যালমিয়া ৪। খ. কোলেক্যালসিফেরল

পাঠ ৫.২

- ১। ক. iv ১। খ. ii ২। ক. স ২। খ. স ৩। ক. গলগড় ৩। খ. ফলিং
৪। ক. কোবাল্ট ৪। খ. নিউট্রিশনাল মাসকুলার ডিস্ট্রিফি

পাঠ ৫.৩

- ১। ক. iv ১। খ. iii ২। ক. স ২। খ. মি ৩। ক. ক্রোমোজোমের ৩। খ. বাইকার্বনেট
৪। ক. হ্যাঁ ৪। খ. করপাস লুটিয়াম

পাঠ ৫.৪

- ১। ক. i ১। খ. iv ২। ক. স ২। খ. মি. ৩। ক. তাপমাত্রা ৩। খ. ৫-৭
৪। ক. পাল দেয়ার ১-৬ সংগ্রহের মধ্যে ৪। খ. শুক্রাশয়প্রদাহ, বীর্যস্থলী প্রদাহ ও
ব্যালানোপসথাইটিস

ইউনিট ৬ গবাদিপশুর সাধারণ রোগব্যাধি

ইউনিট ৬ গবাদিপশুর সাধারণ রোগব্যাধি

আমাদের প্রাত্যহিক পরিবেশে রোগ সৃষ্টির যাবতীয় উপাদান সর্বদা বিরাজমান। ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক, পরজীবী প্রভৃতি রোগজীবাণু প্রতিনিয়ত গবাদিপশুর সংস্পর্শে আসছে। অভ্যন্তরীণ রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতার কারণে এসব রোগজীবাণু সচরাচর রোগ সৃষ্টি করতে পারে না। শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলে পশু এসব জীবাণুর প্রতি অধিকতর সংবেদনশীল হয় এবং রোগ দেখা দেয়। জীবাণুজনিত রোগ ছাড়াও অন্যান্য রোগ রয়েছে। এদের মধ্যে গবাদিপশুর বিষক্রিয়া অন্যতম। গ্রামাঞ্চলে কৃষকরা যথেচ্ছত্বে বিষাক্ত কৌটনাশক ক্ষেত্রে ব্যবহার করছে। এ কৌটনাশক প্রয়োগকৃত ঘাস খেয়ে প্রতিবছর অসংখ্য গবাদিপশু মারা যায়। বিষক্রিয়া ছাড়া পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন রোগব্যাধি গবাদিপশুর প্রধান সমস্যা। এসব রোগের মধ্যে পেটফাঁপা, উদরাময় ও কোষ্ঠকাঠিন্য উল্লেখযোগ্য। শল্যবিষয়ক কতিপয় রোগ, যেমন— জোয়াল কান্দা, কুজে ঘা, বিভিন্ন প্রকার ক্ষত প্রভৃতি রোগ গবাদিপশুতে প্রায়ই দেখা যায়। এসব রোগের কারণে পশু মারা না গেলেও পশুর দৈহিক ওজন, মাংস ও দুধ উৎপাদন হ্রাস পায়। ফলে কৃষক এবং দেশ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাছাড়া স্বাস্থ্যহীনতার কারণে গবাদিপশুতে প্রায়ই বাহ্যিক পরজীবীর আক্রমণ ঘটে এবং দাদসহ বিভিন্ন চর্মরোগ দেখা দেয়। এসব রোগব্যাধি থেকে গবাদিপশুকে রক্ষা করা তাই অতি গুরুত্বপূর্ণ।

এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে গবাদিপশুর বিষক্রিয়া, পেটফাঁপা, উদরাময় ও কোষ্ঠকাঠিন্য, জোয়াল কান্দা ও কুজে ঘা, বিভিন্ন প্রকার ক্ষত, দাদ ও বিভিন্ন প্রকার চর্মরোগ সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিকসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ৬.১ গবাদিপশুর বিষক্রিয়া ও প্রতিরোধ

এ পাঠ শেষে আপনি –

- বিষক্রিয়া ও বিষের প্রকারভেদ সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকার জৈব ও অজৈব বিষক্রিয়ার কারণ, লক্ষণ, রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকার বিষক্রিয়ার প্রতিরোধ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।



পশুর বিষক্রিয়া প্রধানত জৈব
ও অজৈব পদার্থ গ্লারা সৃষ্টি

বিষক্রিয়া কী?

বিভিন্ন প্রকার পদার্থ, বিশেষ করে বিষাক্ত জৈব ও অজৈব রাসায়নিক পদার্থ, খাদ্য, পানিয়, শ্বাসপ্রশ্বাস ও তুকের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করলে দেহের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যতৃত হয় এবং পশু অসুস্থ হয়ে পড়ে। এটিই বিষক্রিয়া (Poisoning)।

বিষক্রিয়া পৃথিবীর সকল দেশের গবাদিপশুতে সংঘটিত হয়। বাংলাদেশে প্রতিবছর অসংখ্য গবাদিপশু, বিশেষ করে গরু, এ বিষক্রিয়ার ফলে মারা যায়।

বিষের প্রকারভেদ

বিষ প্রধানত দুপ্রকার। যথা— ক. জৈব বিষ ও খ. অজৈব বিষ।

ক. জৈব বিষ (Organic Poisons) : হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড, নাইট্রেট ও নাইট্রাইট, ক্লোরিনেটেড হাইড্রোকার্বন, অর্গামোফসফেটস ও কার্বামেটস, ইউরিয়া প্রভৃতি।

খ. অজৈব বিষ (Inorganic Poisons) : এসব বিষের মধ্যে রয়েছে সিসা, আর্সেনিক, সেলেনিয়াম, ফসফরাস, মার্কারি, কপার, সোডিয়াম ক্লোরাইড, সালফার প্রভৃতি।

উপরে উল্লেখিত বিভিন্ন জৈব ও অজৈব বিষ খাওয়া সৃষ্টি বিষক্রিয়া সম্পর্কে একটি পাঠে এখানে স্বিস্তারে আলোচনা করা সম্ভব নয়। এ কারণে আমাদের দেশের প্রোক্ষাপটে গবাদিপশু সাধারণত যেসব বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয় সেগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড বিষক্রিয়া (Hydrocyanic Acid Poisoning)

এ বিষক্রিয়ার ফলে দেহের কোষসমূহে অক্সিজেন সরবরাহ ব্যতৃত হয়। বিষক্রিয়া তীব্র হলে পশুর শ্বাসকষ্ট, খিঁচুনি এবং অকস্মাত মৃত্যু হতে পারে। বিষক্রিয়া দীর্ঘস্থায়ী হলে নবজাতক পশুতে গলগড় বা ঘ্যাগ (Goiter) হতে পারে।

কারণ

তিসি, তিসির খেল, সদ্য গজানো বাঁশ, ভুট্টা, আখ প্রভৃতি ঘাস খেলে বিষক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে।

হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড বিষক্রিয়া শরীরের অক্সিজেন ব্যবহার প্রতিরোধ করে।

হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড বিষক্রিয়ায় শ্বাসকষ্ট, পেশি কম্পন, খিঁচুনি ও চক্ষুতারা প্রসারিত হয়।

বিকাশলাভ

হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড বিষক্রিয়ার কারণে শ্বাসপ্রশ্বাসের মাধ্যমে গৃহীত অক্সিজেন শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্বের কোষসমূহে পৌছাতে এবং ব্যবহৃত হতে পারে না। ফলে অক্সিজেন রক্তে জমা হয় এবং রক্ত উজ্জ্বল লাল বর্ণ ধারণ করে। মস্তিষ্কের কোষসমূহ অক্সিজেন স্বল্পতার প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল। এ কারণে আক্রান্ত পশুর পেশি কম্পন, খিঁচুনি ও শ্বাসকষ্ট দেখা দেয় এবং অবশেষে মারা যায়।

লক্ষণ

- ◆ তীব্র মাত্রার বিষক্রিয়ায় পশু ১-২ ঘন্টার মধ্যে মারা যায়। অতিতীব্র মাত্রার বিষক্রিয়ার ফলে বিষাক্ত খাদ্য গ্রহণের ১০-১৫ মিনিটের মধ্যে লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং লক্ষণ প্রকাশের ২-৩ মিনিটের মধ্যে পশু মারা যায়।
- ◆ আক্রান্ত পশুকে অস্ত্রির দেখায়। প্রচল শ্বাসকষ্ট পরিলক্ষিত হয় এবং পেশি কম্পন ও খিঁচুনি দেখা যায়। অবশেষে পশু মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ও মারা যায়।
- ◆ দৃশ্যমান বিল্লি আবরণী উজ্জ্বল লাল দেখায়, তবে মৃত্যুর পূর্বে নীল বর্ণ ধারণ করে।
- ◆ নাড়ির গতি দুর্বল ও দ্রুত গতিসম্পন্ন হয় এবং চক্ষুতারা প্রসারিত হয়।

রোগ নির্ণয়

- ◆ সায়ানাইডসমৃদ্ধ ঘাস খাওয়ার তথ্য থেকে এ রোগ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।
- ◆ রোগলক্ষণ পর্যালোচনা করে রোগ নির্ণয় করা যায়।
- ◆ পাকস্থলী থেকে সংগৃহীত অপরিপাককৃত বা অর্ধপরিপাককৃত খাদ্য (Ruminal or Stomach Content) গবেষণাগারে পরীক্ষা করে বিষাক্ত পদার্থের উপস্থিতি নির্ণয় করা যায়।

চিকিৎসা

১০% সোডিয়াম থায়োসালফেট সলুশন প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ৩০-৪০ মিলিলিটার হিসেবে শিরায় ইনজেকশন দিতে হবে। ইনজেকশন ছাড়াও এ ওষুধ মুখ দিয়ে খাওয়ানো যায়। এক্ষেত্রে একটি বড় গরুর জন্য সর্বোচ্চ ৪০-৬০ গ্রাম দেয়া যেতে পারে।

প্রতিরোধ

- ◆ হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিডসমৃদ্ধ ঘাস খাওয়ানো থেকে পশুকে বিরত রাখতে হবে।
- ◆ ক্ষুধার্ত গবাদিপশুকে দ্রুত বর্ধনশীল সিক্ত বিষসমৃদ্ধ ঘাস ক্ষেতে প্রবেশ করতে দেয়া যাবে না।

নাইট্রেট ও নাইট্রাইট বিষক্রিয়া (Nitrate & Nitrite Poisoning)

কারণ

যব, কচি গম, বার্লি, শ্যামা, হেলেঞ্চা, রোড়া প্রভৃতি ঘাস নাইট্রাইট বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে।

- ◆ গবাদিপঙ্ক্রিয়া নাইট্রেট বা নাইট্রাইটসমৃদ্ধ ঘাস খেলে এ বিষক্রিয়া দেখা দেয়। নাইট্রেট বিষাক্ত নয়, তবে পাকস্থলীতে প্রবেশের পর নাইট্রাইটে পরিণত হয় এবং বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।
- ◆ যব, কচি গম, বার্লি, শ্যামা, হেলেঞ্চা, রোড়া প্রভৃতি ঘাস খেলে এ বিষক্রিয়া দেখা দিতে পারে।
- ◆ সরিষা, সয়াবিন, নেপিয়ার, গাজর, তিসি, ভুট্টা প্রভৃতি খাদ্য খাওয়ানো ঝুঁকিপূর্ণ।
- ◆ এছাড়া গভীর নলকুপের পানিতেও এ বিষ রয়েছে।
- ◆ জমিতে অধিক সার ব্যবহার এবং অনেক দিন অনাবৃষ্টির পর হঠাতে বৃষ্টি হলে জমির ঘাসে ও ফসলে অধিক পরিমাণে নাইট্রেট জমতে পারে। এ ধরনের জমির ফসল ও ঘাস খাওয়ালে পঙ্কতে এ রকম বিষক্রিয়া দেখা দেয়।

বিকাশলাভ

নাইট্রাইট রক্তে প্রবেশ করার পর হিমোগ্লোবিনকে মিথেমোগ্লোবিনে রূপান্তরিত করে। ফলে পর্যাপ্ত হিমোগ্লোবিনের অভাবে পঙ্কত শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। দেহের ৭৫% হিমোগ্লোবিন মিথেমোগ্লোবিনে রূপান্তরিত হলে পঙ্ক মারা যায়।

লক্ষণ

- ◆ আক্রান্ত পঙ্কর মুখ থেকে লালা পড়ে এবং পেটের পীড়ির কারণে পেটে লাথি দেয়।
- ◆ উদরাময় ও বমি হতে পারে। শ্বাসকষ্ট হয় ও দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করে।
- ◆ পেশি কম্পন ও দুর্বলতা দেখা দেয়, নাড়ির গতি দুর্বল ও দ্রুত গতিসম্পন্ন হয়। দেহের তাপমাত্রা স্বাভাবিক অথবাহ্রাস পেতে পারে।
- ◆ ঘনঘন প্রদ্রাব ও গর্ভপাত হতে পারে।
- ◆ নাইট্রেট বিষক্রিয়া হলে অক্সিজেন স্বল্পতার (Anoxia) কারণে ১২–২৪ ঘন্টার মধ্যে পঙ্ক মারা যায়।

রোগ নির্ণয়

- ◆ বিষক্রিয়া সৃষ্টিকারী ঘাস খাওয়ার ইতিহাস এবং রোগলক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে রোগ নির্ণয় করা যায়।
- ◆ মিথাইলিন বু ইনজেকশন প্রয়োগে সুফল পাওয়া গেলে বুবা যাবে যে, পঙ্ক নাইট্রাইট বিষক্রিয়া হ্যারা আক্রান্ত ছিল।

চিকিৎসা

- ◆ ১% মিথাইলিন বু সলুশন প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ১–২ মিলিলিটার হিসেবে শিরায় ইনজেকশন দিতে হবে। এ চিকিৎসা অত্যন্ত ফলপ্রসূ।
- ◆ বিষক্রিয়া তীব্র হলে ৬ ঘন্টা পর দ্বিতীয় ইনজেকশন দেয়া যেতে পারে।
- ◆ ৫% ডেক্সট্রোজ স্যালাইন ১–২ লিটার হিসেবে শিরায় ইনজেকশন দেয়া যেতে পারে।

নাইট্রেট ও নাইট্রাইট
বিষক্রিয়ার
প্রধান প্রযুক্তি
মিথাইলিন বু।

নাইট্রেট ও নাইট্রেট বিষক্রিয়ার
প্রতিরোধে করতে হলে বিষাক্ত
ঘাস খাওয়ানো বন্ধ করতে
হবে।

প্রতিরোধ

- ◆ বিষাক্ত ঘাস খাওয়ানো বন্ধ করতে হবে।
- ◆ গভীর নলকুপের পানি খাওয়ানো যাবে না।

ক্লোরিনেটেড হাইড্রোকার্বন বিষক্রিয়া (Chlorinated Hydrocarbon Poisoning)

এসব বিষাক্ত পদার্থের মধ্যে ডি.ডি.টি., বেনজিন হেক্সাক্লোরাইড, অ্যালক্রিন, ডাই-অ্যালক্রিন, ক্লোরডেন, এন্ড্রিন প্রভৃতি প্রধান।

কারণ

উপরের বিষাক্ত পদার্থসমূহ কৃষিকাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। বিষ প্রয়োগকৃত এসব ফসল ও ঘাস গবাদিপদ্ধ থেকে বিষক্রিয়া দেখা দেয়। এছাড়াও নিম্নলিখিতভাবে এ বিষ পশুদেহে প্রবেশ করতে পারে। যেমন—

- ◆ শ্বাসনালি ও ক্ষত্যুক্ত ত্বকের মাধ্যমে এ বিষ রক্ত প্রবাহে প্রবেশ করতে পারে।
- ◆ অল্লবয়ক পশু অধিক বয়ক ও দুর্ঘানকারী পশু অপেক্ষা বেশি সংবেদনশীল।

রোগলক্ষণ

উত্তেজনা, পেশি কম্পন, দুর্বলতা, অবশতা ও খিচুনি ক্লোরিনেটেড হাইড্রোকার্বন বিষক্রিয়ার প্রধান লক্ষণ।

- ◆ আক্রান্ত পশু কিছুটা উত্তেজিত ও ক্রোধাপ্তিত হয়। পেশি কম্পন, দুর্বলতা, অবশতা ও খিচুনি দেখা দেয়।
- ◆ সম্পূর্ণ ক্ষুধামন্দা দেখা দেয়, থেকে থেকে দাঁত কড়মড় করে, শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট হয়, পিছনের দিকে হাঁটে, উদ্দেশ্যবিহীন ঝাপ দেয় এবং দেয়াল বেয়ে উঠার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।
- ◆ অবশেষে শ্বাসকষ্টের কারণে পশুর মৃত্যু হয়।

রোগ নির্ণয়

- ◆ কীটনাশক প্রয়োগকৃত ঘাস খাওয়ার তথ্য জেনে এবং রোগলক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে বিষক্রিয়া সম্পর্কে অনুমান করা যায়।
- ◆ গবেষণাগারে পাকস্থলী থেকে সংগৃহীত অর্ধপরিপাককৃত খাদ্য পরীক্ষা করে বিষাক্ত পদার্থ শণাক্ত করা যায়।

চিকিৎসা

চারকল ও পেটোবারবিটোন ওষুধ প্লাস্ট ক্লোরিনেটেড হাইড্রোকার্বন বিষক্রিয়ার চিকিৎসা করা যেতে পারে।

- ◆ শরীরে বিষাক্ত পদার্থ লেগে থাকলে তা উত্তমরূপে পরিষ্কার করতে হবে।
- ◆ খাদ্যের মাধ্যমে বিষক্রিয়া হলে অ্যাক্টিভেটেড কার্ট কয়লা (Activated Charcoal) ১-২ কেজি হিসেবে খাওয়াতে হবে। এ চিকিৎসা ১-২ সপ্তাহ চালাতে হবে।
- ◆ আক্রান্ত পশুকে খাদ্যের সাথে প্রতিদিন ৫ গ্রাম করে একমাস যাবৎ ফেনোবারবিটাল সোডিয়াম খাওয়াতে হবে।
- ◆ ক্লোরাল হাইড্রেট ৩০ গ্রাম ও ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ৬০ গ্রাম একত্রে পানিতে মিশিয়ে খাওয়ালে ভালো ফল পাওয়া যায়। এছাড়া ২৫০ মি.লি. ক্যালসিয়াম বোরোগ্লুকোনেট শিরায় ইনজেকশন দিলে উপকার পাওয়া যায়।

প্রতিরোধ

- ◆ কীটনাশক প্রয়োগকৃত ঘাস খাওয়ানো বন্ধ করতে হবে। কীটনাশক ব্যবহারের পর পশু যেন এই ক্ষেত্রে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- ◆ কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহার এবং বেশি ঘনত্বের কীটনাশক ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

অরগানোফসফেট ও কার্বামেট বিষক্রিয়া (Organophosphate & Carbamate Poisoning)

এ গ্রুপের কীটনাশকের মধ্যে ম্যালাথিওন, ডায়াজিনন, সেভিন, ফুরাডান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

কারণ

- ◆ এসব কীটনাশক কৃষিখাতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া পশুর ত্বক আক্রমণকারী পরজীবী নিধনের জন্যও এসব পদার্থ ব্যবহার করা হয়। কীটনাশক প্রয়োগকৃত ঘাস খেলে অথবা পশুর শরীরে প্রয়োগ করলে বিষক্রিয়া দেখা দিতে পারে।
- ◆ কীটনাশক রাখার পাত্রে খাদ্য সরবরাহ করলে অথবা অসাধানতাবশত কীটনাশক খাদ্যের সাথে মিশ্রিত হলে বিষক্রিয়া দেখা দেয়।

রোগলক্ষণ

অতিরিক্ত আন্ত্রিক স্ক্রিয়তার কারণে উদরাময় এবং মুখ থেকে লালা নির্গত হয়।

- ◆ এ জাতীয় কীটনাশক অত্যন্ত বিষাক্ত। খাদ্যের সাথে, শ্বাসপ্রশ্বাসের সাথে, এমনকী ত্বক এবং চোখের মাধ্যমে এ বিষ শরীরে প্রবেশ করতে পারে।
- ◆ অতি মাত্রায় আন্ত্রিক স্ক্রিয়তার কারণে উদরাময় দেখা দেয় এবং মুখ থেকে অতিরিক্ত লালা নির্গমণ হয়।
- ◆ শ্বাসনালি সংকুচিত হয় ও অতিরিক্ত শ্লেষ্মা নিঃসরণ হয়।
- ◆ চক্ষুতারার সংকোচন হয় এবং দ্বিতীয় ব্যতীত হয়।
- ◆ তীব্র প্রকৃতির বিষক্রিয়ায় জিহ্বা বেরিয়ে আসে। পেশি কম্পন, খিচুনি, দুর্বলতা, অবশতা ও অজ্ঞানতা দেখা যায়।
- ◆ অবশেষে পশুর পেট ফুলে যায়, মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ও পশু মারা যায়।

রোগ নির্ণয়

- ◆ অর্গানোফসফেট ও কার্বামেট বিষযুক্ত ঘাস বা খাদ্য খাওয়ার তথ্য এবং রোগলক্ষণ পরীক্ষা করে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।
- ◆ পাকস্থলী থেকে সংগ্রহীত অর্ধপরিপাককৃত খাদ্য গবেষণাগারে বিশ্লেষণ করে রোগ নির্ণয় করা যায়।

চিকিৎসা

- ◆ বিষাক্ত পদার্থ শরীরে লেগে থাকলে তা ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে।
- ◆ অ্যাট্রোপিন সালফেট এ রোগের জন্য অত্যন্ত ফলপ্রসূ। প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ০.২৫ মিলিগ্রাম অ্যাট্রোপিন সালফেট ইনজেকশন দিতে হবে। বিষক্রিয়া তীব্র হলে এ ওষুধ ৪–৫ ঘন্টা পরপর ২৪–৪৮ ঘন্টা পর্যন্ত ব্যবহার করতে হবে।
- ◆ ক্যালসিয়াম বোরোগ্যুকোনেট ও ডেক্সট্রোজ স্যালাইন শিরায় ইনজেকশন দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

প্রতিরোধ

- ◆ সদ্য কীটনাশক প্রয়োগকৃত ক্ষেত্রে গবাদিপশুর প্রবেশ বন্ধ করতে হবে।
- ◆ কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহার এবং ব্যবহারের পূর্বে এর ঘনত্বহ্রাস করতে হবে।

ইউরিয়া বিষক্রিয়া (Urea Poisoning)

কারণ

- ◆ আমাদের দেশে রাসায়নিক ইউরিয়া সার কৃষিজমিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পশু মোটাতাজাকরণের জন্য খাদ্যের সাথে ইউরিয়া মিশ্রণ প্রচলিত হয়েছে। এতে রোমস্তুক পশুর আমিষের চাহিদা সহজেই পূরণ হয়। তবে, খাদ্যের সাথে ইউরিয়ার পরিমাণ অধিক হলে বিষক্রিয়া দেখা দেয়।

বাড়িতে রাস্কিত ইউরিয়া সার হঠাৎ করে গরুছাগলে অধিক মাত্রায় খেয়ে ফেললে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

- ◆ বাড়িতে রাস্কিত ইউরিয়া সার হঠাৎ করে গরুছাগলে অধিক মাত্রায় খেয়ে ফেললে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।
- ◆ গরুর প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ০.৪৪ গ্রাম ইউরিয়া খেলে ১০ মিনিটের মধ্যে রোগলক্ষণ দেখা দেয়। ইউরিয়ার এ পরিমাণ কেজিপ্রতি ১.০-১.৫ গ্রামে বৃদ্ধি করলে পশু মারা যায়।

রোগলক্ষণ

ইউরিয়া বিষক্রিয়ার আক্রমণ গরুতে তীব্র পেট ব্যথা, পেশি কম্পন, ভারসাম্যহীনতা, দুর্বলতা, শ্বাসকষ্ট, পেটফাঁপা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। এছাড়া এ বিষক্রিয়ার কারণে গরু উত্তেজিত হয় এবং হাঁসা হাঁসা ডাকতে থাকে।

রোগ নির্ণয়

- ◆ ইউরিয়ামিশ্রিত খাবার খাওয়ার ইতিহাস জেনে এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে রোগ নির্ণয় করা যায়।
- ◆ পাকস্থলী থেকে সংগৃহীত অর্ধপরিপাককৃত খাদ্য ও রক্তে অ্যামোনিয়ার মাত্রা অধিক পাওয়া গেলে বিষক্রিয়া সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়।

চিকিৎসা

- ◆ ছাগল ও তেড়োর জন্য ০.৫-১.০ লিটার এবং গরুর জন্য ২-৪ লিটার ভিনেগার খাওয়াতে হবে। ভিনেগার পাকস্থলীর অ্যামোনিয়াকে নিক্রিয় করে দেয়।
- ◆ স্টেমাক টিউব ফ্লারা অথবা অঙ্গোপচারের মাধ্যমে পাকস্থলী থেকে সকল তরল খাদ্য বের করে ফেলতে হবে।

প্রতিরোধ

- ◆ খাদ্যে সঠিক মাত্রায় এবং সঠিক মিশ্রণের মাধ্যমে ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে।
- ◆ অনভ্যস্ত পশুতে কম মাত্রায় ইউরিয়া দিতে হবে।

আর্সেনিক বিষক্রিয়া (Arsenic Poisoning)

কারণ

- ◆ খাদ্য ও পানির সাথে বিষাক্ত পদার্থ শরীরে প্রবেশ করে।
- ◆ ক্ষতযুক্ত ত্বকের মাধ্যমেও এ বিষ শরীরে প্রবেশ করতে পারে।
- ◆ আর্সেনিক প্রধানত দুটো অবস্থায় থাকে। যথা— সোডিয়াম আর্সেনাইট ও আর্সেনিক ট্রাইঅক্সাইড। সোডিয়াম আর্সেনাইট অধিক বিষাক্ত এবং কোনো গরু প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ৭.৫ মিলিগ্রাম গ্রহণ করলে বিষক্রিয়া দেখা দেয়।

রোগলক্ষণ

- ◆ পাকস্থলী ও আস্ত্রিক প্রদাহের কারণে পেটে ব্যথা হয় এবং পাতলা পায়খানা করে।
- ◆ শ্বাসপ্রশ্বাসের হার বৃদ্ধি পায়, পশু অস্থির হয়ে পড়ে ও গোঙায়।
- ◆ লালা ক্ষরণ হয়, দাঁত কটমট করে এবং নাড়ির গতি বৃদ্ধি পায়।
- ◆ লক্ষণ প্রকাশের ৩-৪ ঘন্টার মধ্যে পশু মারা যায়।

- ◆ তীব্র ত্বক্ষা ও পানিস্থল্লতা দেখা দেয়, গাভীর দুধ কমে যায়, গর্ভপাত হতে পারে এবং আক্রান্ত গাভী মৃত বাচ্চা প্রসব করতে পারে।

রোগ নির্ণয়

- ◆ আর্সেনিক বিষের সংস্পর্শে আসার ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ দেখে রোগ নির্ণয় করা যায়।
- ◆ আক্রান্ত পশুর মলমূত্র পরীক্ষা করে আর্সেনিকের উপস্থিতি নির্ণয় করা যায়।

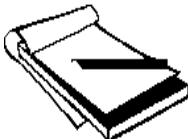
চিকিৎসা

সোডিয়াম থায়োসালফেট
আর্সেনিক বিষক্রিয়া সাড়াতে
ব্যবহৃত হয়।

- ◆ তীব্র বিষক্রিয়ার ক্ষেত্রে চিকিৎসা তেমন একটা ফলপ্রসূ হয় না। কিন্তু যেহেতু আক্রান্ত পশুর মাংস খাওয়ার অযোগ্য, সেহেতু প্রচলিত চিকিৎসা প্রদান করা যুক্তিযুক্ত।
- ◆ ১৫-৩০ গ্রাম সোডিয়াম থায়োসালফেট ১০০-২০০ মি.লি. পানিতে মিশিয়ে শিরায় প্রয়োগ করতে হবে। পরবর্তীতে ১৫-৩০ গ্রাম ওষুধ ৬ ঘন্টা পরপর মুখ দিয়ে খাওয়াতে হবে।
- ◆ পানিস্থল্লতা মোকাবেলার জন্য শিরায় স্যালাইন প্রয়োগ করতে হবে।

প্রতিরোধ

- ◆ আর্সেনিকজাতীয় বিষাক্ত পদার্থ সাবধানতার সাথে সংরক্ষণ ও ব্যবহার করতে হবে।
- ◆ কোনো ওষুধে আর্সেনিক থাকলে তা দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার পরিহার করতে হবে।



অনুশীলন (Activity) : গ্রামাঞ্চলে গরুতে কোন বিষক্রিয়া সর্বাপেক্ষা বেশি দেখা যায় বলে আপনি মনে করেন? এ বিষক্রিয়া থেকে গবাদিপশুকে রক্ষার জন্য কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে?



সারমর্ম : আমাদের দেশে গবাদিপশুর বিষক্রিয়া একটি প্রধান সমস্যা। প্রতিবছর অসংখ্য পশু বিষক্রিয়ার কারণে মারা যায়। জৈব বিষসমূহ এক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে। কৃষিতে কীটনাশকের ব্যাপক ব্যবহার গবাদিপশুর সিংহভাগ বিষক্রিয়ার জন্য দায়ী। এসব কীটনাশকের মধ্যে অ্যালড্রিন, ডাই-অ্যালড্রিন, ক্লোরডেন, এনড্রিন, ম্যালাথিওন, ডায়াজিনল, সেভিন, ফুরাডান প্রভৃতি প্রধান। রাসায়নিক ইউরিয়া সারের ব্যাপক ব্যবহার এবং বিশেষ করে পশু মোটাতাজাকরণের জন্য গোখাদ্যে ইউরিয়ার ক্রমবর্ধমান ব্যবহারও বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে। অন্যান্য জৈব বিষের মধ্যে হাইড্রসায়ানিক অ্যাসিড, নাইট্রোট ও নাইট্রাইট অন্যতম। অজৈব বিষের মধ্যে আর্সেনিকের প্রভাব আমাদের দেশে বেশি। বিভিন্ন বিষক্রিয়ার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপসর্গ রয়েছে। এসব উপসর্গ বা লক্ষণসমূহ বিশেষণের মাধ্যমে বিষক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এছাড়া আক্রান্ত পশু থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন নমুনা গবেষণাগারে পরীক্ষা করে বিষাক্ত পদার্থ শণাক্ত করা যায়। বিভিন্ন প্রকার বিষক্রিয়ার জন্য ফলপ্রসূ চিকিৎসা রয়েছে। এসব চিকিৎসা যথাসময়ে প্রয়োগ করে বিষক্রিয়া থেকে গবাদিপশুকে রক্ষা করা যায়। বিষক্রিয়া প্রতিরোধ করা কষ্টসাধ্য হলেও কৃষক বা খামারি অধিকতর সতর্ক ও মনোযোগী হলে অনেকাংশে এর ব্যাপকতা কমানো সম্ভব।



পাঠোভর মূল্যায়ন ৬.১

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. কোন্ বিষক্রিয়ায় রক্ত উজ্জ্বল লাল বর্ণ ধারণ করে?

- i) ইউরিয়া
- ii) হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড
- iii) এন্ড্রিন
- iv) ফুরাডান

খ. কোন্ বিষক্রিয়ায় রক্তে মিথেমোগ্লোবিন বৃদ্ধি পায়?

- i) আসেনিক
- ii) সেভিন
- iii) নাইট্রেট ও নাইট্রাইট
- iv) সোডিয়াম ক্লোরাইড

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. ইউরিয়া একটি জৈব বিষ।

খ. নাইট্রাইট বিষক্রিয়ায় মিথাইলিন ব্লু ব্যবহার করা হয়।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. অর্গানোফসফেট বিষক্রিয়ায় চক্ষুতারা _____ হয়।

খ. নাইট্রেট ও _____ বিষক্রিয়ায় গাভীর গর্ভপাত হতে পারে।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. কোন্ বিষক্রিয়ায় শরীরে অক্সিজেন ব্যবহৃত হতে পারে না?

খ. কোন্ বিষক্রিয়ায় ভিনেগার খাওয়ানো হয়?

পাঠ ৬.২ গবাদিপশুর পেটফাঁপা ও তার প্রতিরোধ



এ পাঠ শেষে আপনি –

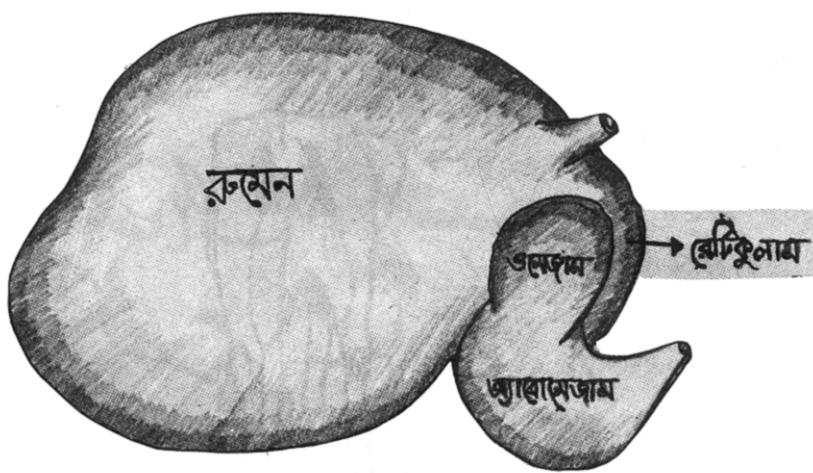
- গবাদিপশুর পেটফাঁপা রোগ কী তা বলতে পারবেন।
- গবাদিপশুর পাকস্থলীতে গ্যাসের উৎপাদন ও বিতাড়ি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- পেটফাঁপা রোগের সংঘটন, কারণ ও লক্ষণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- গবাদিপশুর পেটফাঁপা রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা ও প্রতিরোধ সম্পর্কে লিখতে পারবেন।



রোমছক প্রাণীর রুমেনে গ্যাস জমা হয়ে স্ফীত হলে পেটফাঁপা রোগ হয়।

পেটফাঁপা (Tympanites/Bloat)

পেটফাঁপা রোগ প্রধানত রোমছক প্রাণীতে হয়। যেসব প্রাণী রোমছন বা জাবর কাটে অর্ধাং গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি পশুতে এ রোগ বেশি দেখা যায়। তবে, এদের মধ্যে গরু সর্বাপেক্ষা বেশি আক্রান্ত হয়। এসব পশুর পাকস্থলীর চারটি আলাদা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রকোষ্ঠ রয়েছে। এ প্রকোষ্ঠগুলোর নাম রুমেন, রেটিকুলাম, ওমেজাম ও অ্যাবোমেজাম। এদের মধ্যে রুমেন সর্ববৃহৎ। রুমেন ও রেটিকুলাম পেটফাঁপা রোগের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত। বিভিন্ন কারণে রুমেন ও রেটিকুলামে অতিরিক্ত গ্যাস জমা হয়। ফলে পাকস্থলীর এ দুটো অংশ স্ফীত হয়। পাকস্থলীর এ স্ফীতাবস্থাকে পেটফাঁপা বলে।



চিত্র ৪৮ : রোমছক প্রাণীর পাকস্থলীর বিভিন্ন অংশ

পাকস্থলীতে গ্যাসের উৎপাদন ও বিতাড়ি

রোমছক প্রাণীর রুমেনে স্বাভাবিক অবস্থায় ব্যাকটেরিয়ার গাঁজনের (Bacterial Fermentation) মাধ্যমে গ্যাস উৎপন্ন হয়। গরুর রুমেনে প্রতিদিন প্রায় ৬০০ লিটার গ্যাস উৎপন্ন হয়। এ গ্যাসে ৬৬% কার্বন-ডাই-অক্সাইড, ২৬% মিথেন, ৬% নাইট্রোজেন, ০.১% হাইড্রোজেন সালফাইড এবং প্রায় ১% অক্সিজেন থাকে। এ বিপুল পরিমাণ গ্যাস প্রতিনিয়ত চেকুরের মাধ্যমে শরীর থেকে বিতাড়িত হয়।

সংঘটন

পেটফাঁপা পৃথিবীর সকল দেশেই রোমছক প্রাণীর একটি সমস্যা। বাংলাদেশে এ রোগের প্রাদুর্ভাব ব্যাপক এবং প্রতিবছর অসংখ্য গবাদিপশু এ রোগে মারা যায়। গবাদিপশুর মধ্যে গরুই বেশি সংবেদনশীল।

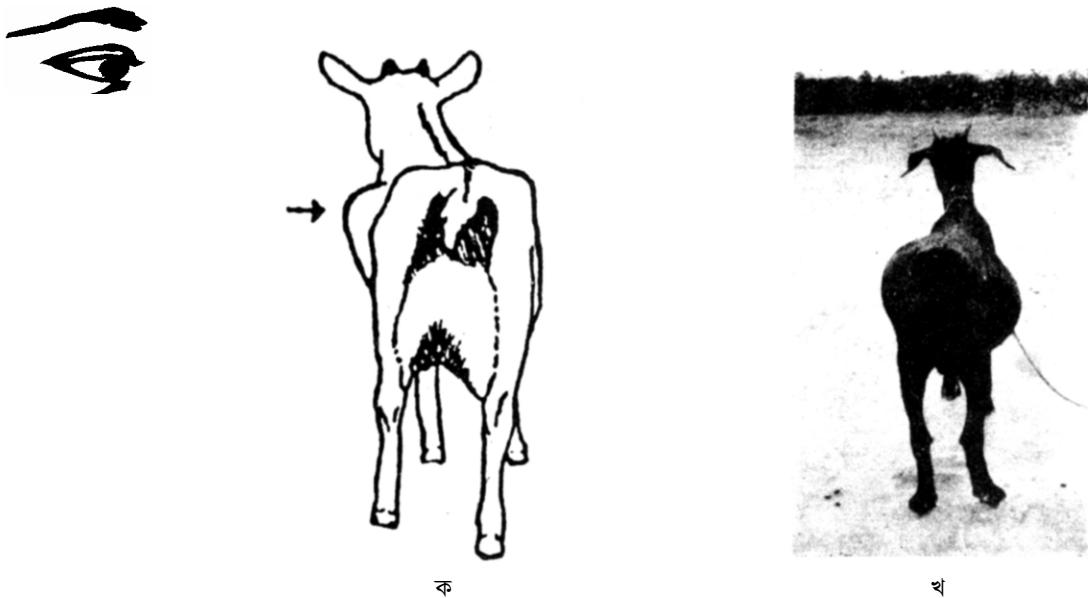
কারণ

পেটফাঁপা দুভাবে হতে পারে। যথা— প্রাথমিক ও মাধ্যমিক।

প্রাথমিক পেটফাঁপা ডালজাতীয়
খাদ্য গ্রহণের কারণে সৃষ্টি

প্রাথমিক পেটফাঁপা (**Primary Bloat**) t এ জাতীয় পেটফাঁপা খাদ্যের প্রক্রিতির সাথে সম্পর্কিত। কিছু কিছু খাদ্য পাকস্থলীতে প্রবেশ করার পর ফেনার সৃষ্টি করে। এ ফেনা পাকস্থলীতে সৃষ্টি গ্যাস আটকে রাখে এবং শরীর থেকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় চেকুরের মাধ্যমেও তার নির্গমণ হয় না। ফলস্বরূপ রুমেন স্ফীত হয় ও পেটফাঁপা রোগ দেখা দেয়। সাধারণত ডালজাতীয় ঘাস খাওয়ার ফলে প্রাথমিক পেটফাঁপা সৃষ্টি হয়। এসব ঘাসের পাতায় একপ্রকার দ্রবণীয় প্রোটিন রয়েছে যা ফেনা সৃষ্টিতে সহায়তা করে। মটরশুটি, কলাই, সিম, খেসারি প্রভৃতি ঘাস গরুর জন্য বিপদজনক। জমিতে অতিরিক্ত রাসায়নিক সার, যেমন— ইউরিয়া প্রয়োগের ফলে ঘাসে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় যা রুমেনে ফেনা সৃষ্টিতে সহায়তা করে। রোমশক পশুর খাদ্যে অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট যুক্ত হলেও রুমেনে একজাতীয় আঁঠালো পদার্থের সৃষ্টি হয় যা গ্যাস আটকে রাখাতে সাহায্য করে। চুর্ণ দালজাতীয় খাদ্য রুমেনে ফেনা সৃষ্টি করে।

খাদ্য গ্রহণের সময় লালাগ্রস্থিতে প্রচুর লালা ক্ষরণ হয়। এ লালা খাদ্যের সাথে রুমেনে প্রবেশ করে এবং ফেনা সৃষ্টিতে বাধা দেয়। কোনো কারণে লালা ক্ষরণ হ্রাস পেলে এবং রুমেনে লালার পরিমাণ অপ্রতুল হলে সহজেই ফেনা সৃষ্টি হয় এবং পেটফাঁপা রোগ দেখা দেয়।



চিত্র ৪৯ (ক, খ) : পেটফাঁপা রোগে আক্রান্ত গরু (ক) ও ছাগল (খ)

রুমেনে সৃষ্টি মুক্ত গ্যাস চেকুরের মাধ্যমে বিতাড়িত হতে না পারলে পেটফাঁপা রোগ দেখা দেয়।

মাধ্যমিক পেটফাঁপা (**Secondary Bloat**) t এ জাতীয় পেটফাঁপায় রুমেনে খাদ্য ফেনায়িত হয় না। তবে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি গ্যাস রুমেন থেকে বের হতে পারে না। ফলে রুমেন স্ফীত হয় এবং পেটফাঁপা রোগ দেখা দেয়। যেসব কারণে রুমেন থেকে মুক্ত গ্যাস চেকুরের মাধ্যমে বিতাড়িত হতে পারে না তা নিচে উল্লেখ করা হয়েছে। যথা—

- ◆ কোনো কারণে অল্লনালি বন্ধ হলে চেকুর বন্ধ হয়ে যায়। ফলে রুমেন গ্যাস গ্লারা স্ফীত হয়। গাজর, মূলা, আলু, আপেল, আমের আঁটি প্রভৃতি বন্ধ অনেক সময় অল্লনালিতে আটকে যায়।
- ◆ অল্লনালির টিউমার, ফোঁড়া বা অন্য কোনো কারণে সংকুচিত হলে স্বাভাবিক চেকুর প্রক্রিয়া ব্যতৃত হলে গ্যাস ক্রমান্বয়ে রুমেনে জমতে থাকে।

- ◆ রুমেনের সংকোচন ক্ষমতা বিলুপ্ত হলে চেকুর বন্ধ হয়ে যায় এবং রুমেন স্ফীত হয়। অন্ননালি ও রুমেনে প্রদাহ হলে এবং অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ করলে রুমেন নিষ্ক্রিয় ও নিশ্চল হয়ে পড়ে।
- ◆ বংশগত কারণে কিছু পশু পেটফাঁপার প্রতি সংবেদনশীল থাকে। যে কোনো খাদ্য গ্রহণেই এসব পশুর পেট ফাঁপে।

লক্ষণ

বাম পেট স্ফীত হয়, চেকুর বন্ধ হয়, শ্বাসকষ্ট হয়, মুখ থেকে লালা ক্ষরণ হয়।

- ◆ রুমেন গ্যাস প্লারা প্রসারিত হবার ফলে বামদিকের পেট ফুলে যায়।
- ◆ রুমেন স্ফীত হবার কারণে ফুসফুসের উপর চাপ পড়ে এবং এর ফলে শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়।
- ◆ অন্ননালি বন্ধ অথবা রুমেনের নিষ্ক্রিয়তার কারণে চেকুর বন্ধ হয়ে যায়।
- ◆ পশু খাদ্য গ্রহণ করে না। মাধ্যমিক পেটফাঁপা রোগে মুখ থেকে লালা নির্গত হয়।
- ◆ গাড়ীর ক্ষেত্রে দুধ উৎপাদন হ্রাস পায়।
- ◆ নাড়ির গতি দুর্বল ও দ্রুত গতিসম্পন্ন হয়।
- ◆ রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস পায় ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া রুমেন থেকে মিথেনের মতো বিষাক্ত গ্যাস রক্তে শোষিত হয়।
- ◆ দৃশ্যমান বিল্লি আবরণী নীল হয়ে যায়, পশু মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে মারা যায়।



চিত্র ৫০ : পেটফাঁপা রোগ নির্ণয়ের জন্য গরু পরীক্ষা করা হচ্ছে

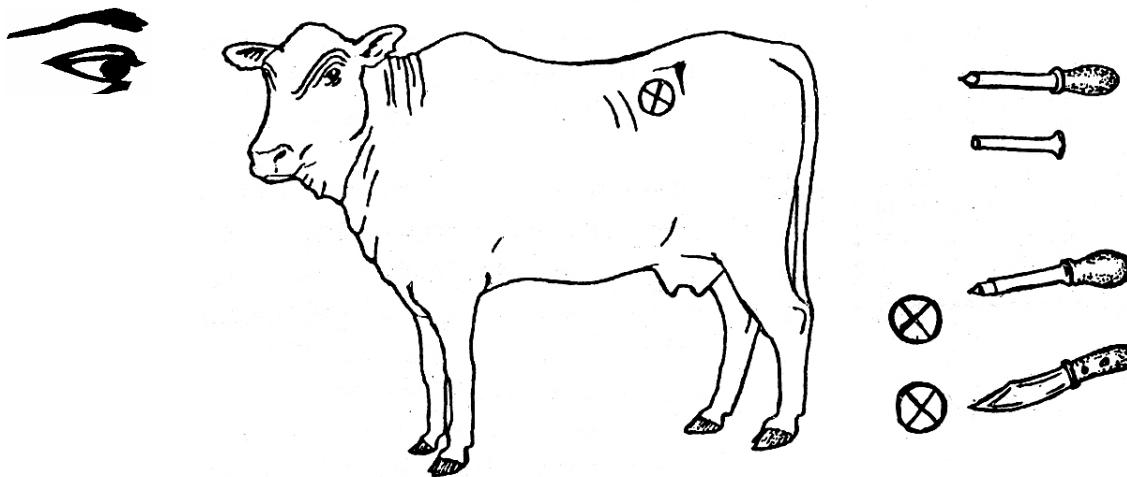
রোগ নির্ণয়

পশুর মালিক বা পালকের নিকট থেকে ডালজাতীয় ঘাস খাওয়ার তথ্য জেনে এবং উপরে বর্ণিত রোগলক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে সহজেই পেটফাঁপা রোগ নির্ণয় করা যায়।

চিকিৎসা

- ◆ টিম্পাসল (ব্রেমার ফার্মা) : গরু, মহিষ— ১০০ মি.লি., ছাগল, ভেড়া— ৪০-৫০ মি.লি., নিয়ামাবলী— ১ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।
- ◆ ডালজাতীয় খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করতে হবে।

স্টমাক টিউব প্লারা রুমেন থেকে গ্যাস বের করতে হবে। রুমেনে আধা লিটার তিসি বা সয়াবিন তেল প্রয়োগ করতে হবে। জরুরি অবস্থায় অঙ্গোপচার করতে হয়।



চিত্র ৫১ : চিহ্নিত স্থানে ট্রিকার ও ক্যানুলা বা ছুরি প্রয়োগে পেটকাঁপা রোগে আক্রান্ত গরুর গ্যাস বের করা হয়

- ◆ স্টমাক টিউব ব্যবহার করে রুমেন থেকে মুক্ত গ্যাস সহজেই বিতাড়ন করা যায়। তবে অন্নালি বন্ধ থাকলে এ টিউব রুমেনে প্রবেশ করে না। এক্ষেত্রে অঙ্গোপচারের মাধ্যমে অন্নালির প্রতিবন্ধকতা দূর করলে রুমেনের গ্যাস আপনাআপনিই চেকুরের মাধ্যমে বের হয়ে যায়।
- ◆ রুমেনে প্রবেশ করানোর পর গ্যাস নির্গত না হলে বুঝতে হবে গ্যাস ফেনার মধ্যে আটকা পড়ে আছে। এক্ষেত্রে ফেনানিরোধক ওষুধ টিউবের মাধ্যমে সরাসরি রুমেনে প্রয়োগ করতে হবে। এসব ওষুধের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার উত্তিজ্জ তেল, যেমন— তিসি, সয়াবিন, পিনাট, তারপিন তেল ও ফরমালিন রয়েছে। একটি গরলতে আধা লিটার উত্তিজ্জ তেল রুমেনে প্রয়োগ করা যেতে পারে। তারপিন ও ফরমালিনের মাত্রা যথাক্রমে ৩০—৬০ এবং ১৫—৩০ মি.লি.।
- ◆ তীব্র আকারের পেটকাঁপা হলে বাম পেট ট্রিকার ও ক্যানুলার সাহায্যে ছিদ্র করে গ্যাস বের করা যেতে পারে। ক্যানুলার মাধ্যমে রুমেনে সরাসরি ওষুধ প্রয়োগ করা যায়।
- ◆ পেটকাঁপা অতিতীব্র হলে এবং কোনো রকম সময় ক্ষেপণের ফলে পশুর মৃত্যুর আশংকা থাকলে তৎক্ষণিকভাবে অঙ্গোপচারের মাধ্যমে রুমেন থেকে ফেনায়িত দ্রব্যাদি বের করে ফেলা হয়।
- ◆ স্টমাক টিউব, ট্রিকার ও ক্যানুলা, অথবা অঙ্গোপচারের মাধ্যমে রুমেন থেকে গ্যাস পরিশ্রারের পর পুনরায় যাতে গ্যাস উৎপাদন না হয় সেজন্য রুমেনে গ্যাস নিরোধক ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে।
- ◆ পশুর শরীরে পানিসংক্রান্ত দেখা দিলে ১—২ লিটার ৫% ডেক্সোট্রোজ স্যালাইন শিরায় ইনজেকশন আকারে দিতে হবে।

প্রতিরোধ

গবাদিপশুকে ডালজাতীয় ও দ্রুত বর্ধনশীল কচিঘাস খাওয়ানো বন্ধ করতে হবে।

- ◆ ডালজাতীয় ঘাস উৎপাদন হ্রাস করতে হবে এবং এ জাতীয় ঘাস পশুকে কম খাওয়াতে হবে।
- ◆ পশুকে চূর্ণ দানাজাতীয় খাদ্য যথাসম্ভব কম দিতে হবে।
- ◆ এসব ঘাসের সাথে সামান্য উত্তিজ্জ তেল মিশিয়ে খাওয়ালে ভালো ফল পাওয়া যায়।
- ◆ পশুকে দ্রুত বর্ধনশীল কচি ঘাস অধিক পরিমাণে খেতে দেয়া যাবে না।



অনুশীলন (Activity) : গ্রামাঞ্চলে কোনো কৃষকের গরুর পেটফাঁপা রোগ হলে আপনি তাকে কী পরামর্শ দেবেন?

সারমর্ম : রোমস্থক প্রাণীর রূমেনে ব্যাকটেরিয়ার গাঁজনের মাধ্যমে গ্যাস সৃষ্টি হয়। এ গ্যাস ঢেকুরের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত শরীর থেকে বিতাড়িত হয়। কোনো কারণে এ প্রক্রিয়া ব্যহত হলে রূমেন গ্যাস গ্লারা স্ফীত হয়। এ স্ফীতাবস্থা মুক্ত অথবা ফেনায়িত গ্যাস গ্লারা হতে পারে। অন্নালি বন্ধ হলে কিংবা রূমেন নিশ্চল হলে পেটফাঁপা রোগ দেখা দেয়। ডালজাতীয় ঘাস গ্রহণ এ রোগের প্রধান কারণ। আক্রান্ত পশুর বামদিকের পেট ফুলে যায়, খাদ্য গ্রহণ বন্ধ করে দেয়, মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ও মারা যায়। স্টেমাক টিউব, ট্রিকার-ক্যাম্বলা এবং অঙ্গোপচারের মাধ্যমে এ রোগ চিকিৎসা করা হয়। বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিজ্জ তেল, তারপিন তেল এবং ফরমালিন এ রোগের প্রধান ঔষুধ। ডালজাতীয় ঘাস খাওয়ানো বন্ধ করতে পারলে রোগের সংঘটন অনেকাংশে প্রতিরোধ করা সম্ভব।



পাঠ্যের মূল্যায়ন ৬.২

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. পেটফাঁপা রোগ কোন্ পশুতে বেশি হয়?

- i) গরু
- ii) ঘোড়া
- iii) কুকুর
- iv) বিড়াল

খ. কোন্ খাদ্য অতিরিক্ত খেলে পেটফাঁপা রোগ হতে পারে?

- i) শুকনো খড়
- ii) দুর্বা ঘাস
- iii) গমের ভুশি
- iv) ডালজাতীয় খাদ্য

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. পেটফাঁপা রোগ প্রধানত রোমস্থক প্রাণীতে হয়।

খ. রূমেন নিক্রিয় হলে ঢেকুর বেড়ে যায়।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. গরুর রূমেনে প্রতিদিন প্রায় _____ লিটার গ্যাস উৎপন্ন হয়।

খ. পেটফাঁপা রোগে পশুর _____ পেট ফুলে যায়।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. রূমেন থেকে মুক্ত গ্যাস বের করার যন্ত্রের নাম কী?

খ. পেটফাঁপা রোগ চিকিৎসায় তিসির তেল ব্যবহার করা যায় কী?

পাঠ ৬.৩ গবাদিপশুর উদরাময় এবং কোষ্ঠকাঠিন্য রোগ



এ পাঠ শেষে আপনি –

- উদরাময় এবং ব্যাকটেরিয়াজনিত উদরাময় সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- উদরাময় সৃষ্টিকারী বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ, যেমন— কলিব্যাসিলোসিস, সালমোনেলোসিস, জোনস্ ডিজিজ প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে পারবেন।
- উদরাময় সৃষ্টিকারী বিভিন্ন ভাইরাস রোগ, যেমন— ভাইরাস ডায়ারিয়া, রোটাভাইরাস সংক্রমণ, রিভারপেস্ট, পি.পি.আর. প্রভৃতি সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- বিভিন্ন পরজীবী ও খাদ্যজনিত ডায়ারিয়ার বর্ণনা দিতে পারবেন।
- পশুর কোষ্ঠকাঠিন্য রোগ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।



পশু স্বাভাবিকের চেয়ে ঘনঘন
পাতলা পায়খানা করলে
তাকে উদরাময় বা ডায়ারিয়া
বলে।

উদরাময় কী?

পশু স্বাভাবিকের চেয়ে ঘনঘন পাতলা পায়খানা করলে তাকে উদরাময় বা ডায়ারিয়া (Diarrhoea) বলে। উদরাময় অপেক্ষা ডায়ারিয়া কথাটিই আমাদের দেশে বেশি প্রচলিত। ডায়ারিয়া প্রধানত বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও পরজীবীজনিত রোগের লক্ষণ হিসেবে দেখা দেয়। সংক্রমণ ছাড়াও খাদ্যজনিত কারণেও ডায়ারিয়া দেখা দিতে পারে। গবাদিপশুর ডায়ারিয়া সৃষ্টিকারী কিছু গুরুত্বপূর্ণ রোগ সমন্বে এ পাঠে আলোচনা করা হয়েছে।

নিম্নলিখিত গণের ব্যাকটেরিয়াগুলো প্রধানত পশুর ডায়ারিয়ার জন্য দায়ী। যথা—

- ◆ *Escherichia*(ইক্সেরিশিয়া)
- ◆ *Salmonella* (সালমোনেলা)
- ◆ *Mycobacterium* (মাইকোব্যাকটেরিয়াম)
- ◆ *Pseudomonas* (সিউডোমোনাস)
- ◆ *Proteus* (প্রোটিয়াস)
- ◆ *Pasteurella* (পাসচুরেলা)

এসব ব্যকটেরিয়ার মধ্যে ইক্সেরিশিয়া, সালমোনেলা ও মাইকোব্যাকটেরিয়াম অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

কলিব্যাসিলোসিস (ঈড়বষরনধপরষষড়ংরং)

নবজাতক বাচ্চুর শালদুধ থেকে
বঞ্চিত হলে রোগপ্রতিরোধ
ক্ষমতা হ্রাস পায়। এতে এরা
বিভিন্ন রোগের প্রতি সহজেই
সংবেদনশীল হয়।

কলিব্যাসিলোসিস রোগকে বাচ্চুরের সাদা পায়খানা বা সাদা বাহ্য (Calf Diarrhoea or White Scour) বলা হয়। *Escherichia coli* (ইক্সেরিশিয়া কলাই) নামক ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে এ রোগ সৃষ্টি হয়। এ রোগ প্রধানত নবজাতক পশুতে দেখা যায়। মাতৃগর্ভের জীবাণুমুক্ত পরিবেশ থেকে ভূমিষ্ঠ হবার পর নবজাতক বাচ্চুর বিভিন্ন রোগজীবাণুর সংস্পর্শে আসে। এসব জীবাণু প্রধানত নাভিরজ্জু, শ্বাসনালি এবং খাদ্যের সাথে শরীরে প্রবেশ করে। নবজাতকের অভ্যন্তরীণ রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতার ভারসাম্যের ওপর রোগ সৃষ্টি হওয়া নির্ভর করে। জন্মের পর শালদুধ গ্রহণের মাধ্যমে এ রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু কুসংস্কারজনিত কারণে নবজাতক বাচ্চুর শালদুধ থেকে বঞ্চিত হলে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় এবং বিভিন্ন রোগের প্রতি সহজেই সংবেদনশীল হয়। নবজাতক বাচ্চুর জন্মের ৩ দিনের মধ্যেই কলিব্যাসিলোসিস রোগে আক্রান্ত হতে পারে। আক্রান্ত বাচ্চুরের মৃত্যুর হার ৫০% পর্যন্ত হতে পারে।

রোগলক্ষণ

কলিব্যাসিলোসিস প্রধানত দুপ্রকৃতির হয়ে থাকে। যথা— সেপ্টিসেমিক ও এন্টারোট্রিক।

সেপ্টিসেমিক প্রকৃতি (Septicemic Type) : জন্মের ৪ দিনের মধ্যে এ রোগ হয়। জীবাণু অতি দ্রুত রক্ত প্রবাহে প্রবেশ করে এবং টক্সিমিয়া (Toxaemia) তৈরি করে। আক্রান্ত বাচ্চুর লক্ষণ প্রকাশের ৯৬ ঘন্টার মধ্যে মারা যায়। মৃত্যুর পূর্বে ক্ষুধামন্দা, দুর্বলতা, ডায়ারিয়া প্রভৃতি দেখা দেয়।

পায়খানার রঙ ফ্যাকাশে হলুদ
বা সাদাটে হয় যা অত্যন্ত
দুর্গন্ধযুক্ত হয় এবং এর সাথে
রক্ত থাকতে পারে।

এন্টেরোটক্সিক প্রকৃতি (Enterotoxic Type) : অনুর্ধ্ব ৫ দিনের বাছুরে এ রোগ হয়। এতে বাছুর দুর্বল হয়, দৈহিক তাপমাত্রা হ্রাস পায় এবং বিল্ডি আবরণী ফ্যাকাশে হয়ে যায়। নাড়ির গতি শুথ ও অসমস্তি হয়, মৃদু খিঁচুনি ও শ্বাসহীনতা দেখা দেয়। তরল পদার্থ জমার কারণে পেট ফুলে যায়, পাতলা পায়খানা দেখা দেয় এবং ২-৬ ঘণ্টার মধ্যে মারা যায়।

পায়খানার রঙ ফ্যাকাশে হলুদ অথবা সাদাটে হয়। মলে গ্যাস থাকলে ফেনা ফেনা দেখা যায়। লেজ এবং মলগ্নারের চারদিকে পায়খানা মেখে যায়। তাই এ রোগকে বাছুরের সাদা বাহ্য বা হোয়াইট স্ফাউরও (White Scour) বলা হয়। অনেক সময় পায়খানার সাথে রক্ত থাকতে পারে এবং পায়খানা অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হয়। লেজ ও পশ্চাদদেশ সর্বদা ময়লাযুক্ত থাকে এবং বাছুর গাভীর ওলান থেকে দুধ পান করে না।

রোগ নির্ণয়

লক্ষণ দেখে রোগ সমন্বে ধারণা করা যায়। তবে, চূড়ান্তভাবে রোগ নির্ণয়ের জন্য আক্রান্ত বাছুর থেকে সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষা করে *Escherichia coli* জীবাণু শণাক্ত করা প্রয়োজন।

চিকিৎসা

নিম্নলিখিতভাবে এ রোগের চিকিৎসা করা হয়। যথা—

খাদ্য পরিবর্তন : দুধ পান করানো বন্ধ করে দিতে হবে। দুধের পরিবর্তে ৫% ডেক্সট্রোজ স্যালাইন মুখ দিয়ে পান করাতে হবে।

ফ্লাইড ও ইলেক্ট্রোলাইট প্রয়োগ : সোডিয়াম বাইকার্নেট ও ডেক্সট্রোজ ইনজেকশন দেয়া অত্যন্ত ফলপ্রসূ। ডায়ারিয়ার ফলে তীব্র পানিসংস্থান দেখা দিলে প্রথম ৪-৬ ঘন্টা প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ১০০ মি.লি. এবং পরবর্তী ২০ ঘন্টা ১৪০ মি.লি. হারে প্রয়োগ করাতে হবে।

জীবাণুদমনকারী ওষুধ প্রয়োগ : প্রধানত সালফাডায়াজিন, সালফাডিমিডিন, সালফাপাইরিডিন এবং স্ট্রেপটোমাইসিন সালফেট ফ্লারা তৈরি ওষুধ এ রোগের চিকিৎসার জন্য খুবই কার্যকর। বর্তমানে বাজারে স্ট্রিনাসিন ট্যাবলেট নামে এ ওষুধ পাওয়া যায়। প্রতি ৪০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ৫ গ্রাম ট্যাবলেটই দৈনিক যথেষ্ট। চিকিৎসার মেয়াদ ৩ দিন।

রোগ নিয়ন্ত্রণ

- ◆ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর ঘরে বাচ্চা প্রসবের ব্যবস্থা করাতে হবে।
- ◆ মলগ্নারের চারপাশ ও ওলান প্রসবের পূর্বে ভালোভাবে পরিষ্কার রাখতে হবে।
- ◆ জন্মের পরপরই নবজাতকের নাভিরজ্জু ২% আয়োডিন ফ্লারা পরিষ্কার করাতে হবে এবং নাভি পেটের সমান করে সুতো দিয়ে বেঁধে দিতে হবে।
- ◆ আক্রান্ত বাছুরকে পৃথক স্থানে রেখে চিকিৎসা করাতে হবে।
- ◆ জন্মের পরপরই বাছুরকে পর্যাপ্ত শালদুধ পান করানো নিশ্চিত করাতে হবে। বাছুর নিজে পান না করতে পারলে ওলান থেকে দুধ সংগ্রহ করে বোতল অথবা স্টমাক চিউব দিয়ে পান করাতে হবে।
- ◆ প্রসবের তিন সপ্তাহ পূর্বে গাভী অথবা নবজাতক বাছুরে এ রোগের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক প্রয়োগ করাতে হবে।

সালমোনেলোসিস (Salmonellosis)

এটি একটি ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ। *Salmonella typhimurium* (সালমোনেলা টাইফিমুরিয়াম) *Salmonella dublin* (সালমোনেলা ডাবলিন) ও *Salmonella neuport* (সালমোনেলা নিউপোর্ট)

জন্মের পরপর নবজাতক
বাছুরকে পর্যাপ্ত শালদুধ পান
করাতে হবে।

নামক তিনটি ব্যাকটেরিয়া গরুমহিষে এ রোগ সৃষ্টি করে। অন্যান্য গবাদিপশুও সালমোনেলা ইচ্পের জীবাণু ফ্লারা সংক্রমিত হতে পারে। এসব জীবাণু ফ্লারা সৃষ্টি রোগকে সালমোনেলোসিস বলা হয়। প্রধানত বাচ্চুর এবং অন্যান্য বাচ্চা প্রাণীর জন্মের প্রথম কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এ রোগ হয়ে থাকে।

জীবাণু সংক্রমণ

খাদ্য অথবা মলের মাধ্যমে জীবাণু সংক্রমিত হয়। অনেক সময় জীবাণু বহনকারী বয়স্ক পশুর মাধ্যমে রোগজীবাণু বাচ্চুরে সংক্রমিত হতে পারে। একবার সংক্রমণ দেখা দিলে খুব তাড়াতাড়ি রোগ ছড়িয়ে পড়ে।

রোগলক্ষণ

তীব্র প্রকৃতির অস্ত্রপ্রদাহে দৈহিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং দুর্গন্ধযুক্ত ডায়ারিয়া দেখা দেয়।

- ◆ শরীরের তাপমাত্রা 41.1° সে. (106° ফা.) পর্যন্ত উঠতে পারে।
- ◆ আক্রান্ত পশুতে তীব্র ও দীর্ঘমেয়াদী অস্ত্রপ্রদাহ দেখা দেয়। তীব্র প্রকৃতির অস্ত্রপ্রদাহে দৈহিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং দুর্গন্ধযুক্ত ডায়ারিয়া হয়। পায়খানার সাথে শ্লেষ্মা ও রক্ত থাকতে পারে।
- ◆ পরবর্তীতে দৈহিক তাপমাত্রা হ্রাস পেতে পারে এবং পানিস্বল্পতা দেখা দেয়। ব্যাকটেরিয়াজনিত বিষক্রিয়া এবং পানিস্বল্পতার কারণে আক্রান্ত পশুর শতকরা ৭৫ ভাগ কয়েকদিনের মধ্যেই মারা যায়।

রোগ নির্ণয়

লক্ষণ ও আক্রান্ত পশু থেকে সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষা করে রোগ নির্ণয় করা যায়।

চিকিৎসা

সালমোনেলোসিস চিকিৎসায় অ্যাস্ট্রিবায়োটিক, অ্যাস্ট্রিনজেন্ট ও স্যালাইন প্রয়োগ করতে হবে।

- ◆ আক্রমণকারী ব্যাকটেরিয়া দমনের লক্ষ্যে প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ২০ মিলিগ্রাম ক্লোরামফেনিকল ৬-১২ ঘন্টা পরপর ৩ দিন ইনজেকশন আকারে দিতে হবে।
- ◆ অস্ত্রপ্রদাহের জন্য প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ২০ মিলিগ্রাম নাইট্রোফিটেরাজোন ৫ দিন পর্যন্ত খাওয়াতে হবে।
- ◆ ডায়ারিয়া বন্ধের জন্য অ্যাস্ট্রিনজেন্ট (Astringent) ওষুধ খাওয়াতে হবে।
- ◆ ডায়ারিয়াজনিত পানিস্বল্পতা প্রতিরোধ করার জন্য সাধারণ বা ডেক্সট্রোজ স্যালাইন ইনজেকশন দেয়া যেতে পারে।
- ◆ দৈহিক তাপমাত্রা বেশি থাকলে ৫% সোডিয়াম বাইকার্বনেট শিরায় ইনজেকশন দেয়া হলে উপকার পাওয়া যায়।

নিয়ন্ত্রণ

- ◆ আক্রান্ত পশুকে পৃথক স্থানে রেখে চিকিৎসা করতে হবে।
- ◆ গোশালা পরিক্ষার-পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুযুক্ত রাখতে হবে।
- ◆ প্রতিষেধক টিকা ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ◆ নবজাতক বাচ্চুরে পর্যাপ্ত শালদুধ পান করাতে হবে।

জোনস ডিজিজ (Johne's Disease)

Mycobacterium paratuberculosis (মাইকোব্যাকটেরিয়াম প্যারাটুবার্কুলোসিস) নামক ব্যাকটেরিয়া এ রোগ সৃষ্টি করে। আক্রান্ত পশুতে তীব্র অস্ত্রপ্রদাহ দেখা দেয় এবং এ কারণে

দীর্ঘমেয়াদী ডায়ারিয়ার কারণে পশু হাতিদসার হয়ে যায় এবং দুর্বলতার কারণে মারা যায়।

দীর্ঘমেয়াদী ডায়রিয়া হয়। ডায়রিয়াজনিত কারণে পানিস্লন্তা দেখা দেয়, দৈহিক ওজনহ্রাস পায়, গরু হাড়িসার হয়ে যায় এবং অবশেষে দুর্বলতার কারণে মারা যায়।

চিকিৎসা

- ◆ প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ৫০ মিলিগ্রাম স্ট্রেপ্টোমাইসিন ৬ ঘন্টা পরপর খাওয়ানো যেতে পারে।
- ◆ ৫০০ মিলিগ্রাম ডাই-হাইড্রোস্ট্রেপ্টোমাইসিন পেশিতে ইনজেকশন দেয়া যেতে পারে।

ভাইরাসজনিত ডায়রিয়া (Viral Diarrhoea)

বিভিন্ন ধরনের ভাইরাসের আক্রমণে গবাদিপঙ্কুতে ভাইরাস ডায়রিয়া দেখা দেয়। যেমন— বোভাইন ভাইরাস ডায়রিয়া, রোটাভাইরাস ডায়রিয়া, রিভারপেস্ট, পি.পি.আর. ইত্যাদি। নিম্নে এগুলো সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে।

বোভাইন ভাইরাস ডায়রিয়া (Bovine Virus Diarrhoea)

এ জাতীয় ডায়রিয়া গরুর একটি অত্যন্ত সংক্রামক রোগ। এ রোগে শতকরা ৮০-১০০ ভাগ গরু আক্রান্ত হয় এবং শতকরা ৫-১০ ভাগ মারা যায়। বাংলাদেশে এ রোগের ব্যাপক প্রাদুর্ভাব রয়েছে। ভাইরাস ডায়রিয়াকে মিউকোজাল ডিজিজও (Mucosal Disease) বলে।

কারণ

ভাইরাস ডায়রিয়া ভাইরাস বা মিউকোজাল ডিজিজ ভাইরাস নামক ভাইরাস এ রোগের কারণ।

লক্ষণ

জ্বর, ক্ষুধামন্দা, পেটফাঁপা, নাক দিয়ে শ্লেংশা নির্গমণ ও দুর্গন্ধযুক্ত পাতলা পায়খানা দেখা যায়।

ভাইরাস ডায়রিয়া প্রধানত তীব্র ও দীর্ঘমেয়াদী প্রকৃতির হয়ে থাকে। তীব্র প্রকৃতির ডায়রিয়ার ক্ষেত্রে দৈহিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়, ক্ষুধামন্দা দেখা দেয়, দুঁফ উৎপাদন হ্রাস পায় এবং নাক দিয়ে শ্লেংশাজাতীয় পদার্থ নির্গত হয়। পরবর্তীতে দুর্গন্ধযুক্ত পাতলা পয়খানা শুরু হলে পানিস্লন্তার কারণে দুর্বল হয়ে পশু মারা যায়। দীর্ঘমেয়াদী প্রকৃতির ডায়রিয়ার ক্ষেত্রে পাতলা পায়খানা, ক্ষুধামন্দা, পেটফাঁপা, শ্বাসকষ্ট, নাক দিয়ে শ্লেংশা নির্গমণ প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয়। অক্তের ক্ষত সাধারণত নিরাময় হয় না।

রোগ নির্ণয়

- ◆ রোগলক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে ভাইরাস ডায়রিয়া সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যায়।
- ◆ এ রোগে রক্তের মোট শ্বেতকণিকার সংখ্যা অস্বাভাবিক পর্যায়ে হ্রাস পায়। কাজেই রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে এ রোগ চিহ্নিত করা যায়।
- ◆ আক্রান্ত পশু থেকে অন্যান্য নমুনা সংগ্রহ করে গবেষণাগারে ভাইরাস শণাক্ত করে চূড়ান্তভাবে রোগ নির্ণয় করা যায়।

চিকিৎসা

ভাইরাসজনিত রোগ বিধায় ভাইরাস ডায়রিয়ার কোনো কার্যকর চিকিৎসা নেই। তবে, লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

রোটাভাইরাস সংক্রমিত ডায়রিয়া

বাংলাদেশে এ রোগের প্রাদুর্ভাব যথেষ্ট রয়েছে। অল্লবংক গরুমহিষ এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয়।

কারণ

রোটাভাইরাস (Rotavirus) সংক্রমণ।

রোটাভাইরাস সংক্রমিত
ডায়ারিয়ায় মল ফ্যাকাশে হলুদ
হয় এবং সাথে শ্লেষ্মা ও রক্তের
উপস্থিতি থাকতে পারে।

লক্ষণ

- ◆ ক্ষুদ্র ও বৃহদন্ত্র আক্রান্ত হবার ফলে ডায়ারিয়া দেখা দেয়।
- ◆ মল ফ্যাকাশে হলুদ হয় এবং সাথে শ্লেষ্মা ও রক্তের উপস্থিতি থাকতে পারে।
- ◆ ডায়ারিয়ার কারণে পানিস্পন্দনা দেখা দেয় এবং পশু ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে।

রোগ নির্ণয়

- ◆ লক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে এ রোগ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।
- ◆ তবে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয়ের জন্য আক্রান্ত পশু থেকে সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষা অপরিহার্য।

চিকিৎসা

এ রোগের কোনো কার্যকর চিকিৎসা নেই। তবে, লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসা প্রদান করা যেতে পারে। ডায়ারিয়া প্রতিরোধে অ্যাস্ট্রিনজেন্ট ও পানিস্পন্দনার জন্য স্যালাইন প্রয়োগ করা যেতে পারে।

রিন্ডারপেস্ট (Rinderpest)

এটি গবাদিপশুর একটি ভাইরাসজনিত সংক্রমক রোগ। রিন্ডারপেস্ট ভাইরাস সংক্রমণে এ রোগ সৃষ্টি হয়।

রিন্ডারপেস্ট রোগে ক্ষুদ্র ও বৃহদন্ত্রে প্রদাহের কারণে শ্লেষ্মা
ও রক্তমিশ্রিত দুর্গন্ধযুক্ত
ডায়ারিয়া দেখা দেয়।

লক্ষণ

- ◆ দৈহিক তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ৪–৫° ফা. পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে।
- ◆ চোখ ও নাকমুখ দিয়ে পানি পড়ে।
- ◆ ক্ষুদ্র ও বৃহদন্ত্রে প্রদাহের কারণে শ্লেষ্মা ও রক্তমিশ্রিত দুর্গন্ধযুক্ত ডায়ারিয়া দেখা দেয়।
- ◆ পানিস্পন্দনা দেখা দেয়, পশু দুর্বল হয়ে পড়ে, নাড়ির গতি ও শ্বাসপ্রশ্বাসের হার বৃদ্ধি পায়
এবং অবশ্যে পশু মারা যায়।

রোগ নির্ণয়

রোগলক্ষণ পর্যবেক্ষণ ও ভাইরাস শণাক্তকরণের মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করা হয়।

চিকিৎসা

এ রোগের কোনো চিকিৎসা নেই। আক্রান্ত পশু সাধারণত মারা যায়। তবে, লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

রোগপ্রতিরোধ

প্রতিমেধক বা টিকা প্রয়োগের মাধ্যমে এ রোগ দমন করা যায়। জি.টি.ভি. (G.T.V) নামক টিকা প্রয়োগ করে এ রোগের হাত থেকে গবাদিপশুকে রক্ষা করা যায়।

পি.পি.আর. রোগ ছোট
আকৃতির রোমস্তক প্রাণী,
যেমন— ছাগল ও ভেড়া এ
রোগের প্রধান শিকার।

পি.পি.আর. রোগ (P.P.R. Disease)

ছোট আকৃতির রোহস্তক প্রাণী, যেমন— ছাগল ও ভেড়া এ রোগের প্রধান শিকার। অত্যন্ত সংক্রামক এ রোগে আক্রান্ত পশুর শতকরা ৮০ ভাগ মারা যায়। বাংলাদেশের ছাগল ও ভেড়াতে প্রতিবছর এ রোগ মহামারী আকারে দেখা দেয়।

কারণ

পেস্ট-ডেস-পেটিটস্-রুমিন্যান্টস্ (Peste des Petits Ruminants) নামক ভাইরাস এ রোগ সৃষ্টি করে।

লক্ষণ

পি.পি.আর. রোগে নাক দিয়ে শ্লেংজাতীয় পদার্থ নির্গত হয় এবং নাসারন্দে তা শুকিয়ে লেগে থাকে। এতে তীব্র ডায়রিয়া দেখা দেয়।

- ◆ জ্বর, ক্ষুধামন্দা ও দুর্বলতা দেখা দেয়।
- ◆ নাক দিয়ে শ্লেংজাতীয় পদার্থ নির্গত হয় এবং নাসারন্দে তা শুকিয়ে লেগে থাকে।
- ◆ তীব্র ডায়রিয়া দেখা দেয় এবং আক্রান্ত পশুর লেজ ও পশ্চাদদেশ ময়লাযুক্ত থাকে।
- ◆ পানিস্বল্পতা দেখা দেয় এবং এক পর্যায়ে পশু মারা যায়।

রোগ নির্ণয়

লক্ষণ থেকে প্রাথমিকভাবে এ রোগ নির্ণয় করা যায়। তবে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য নমুনা পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

চিকিৎসা

এ রোগের কোনো চিকিৎসা নেই। লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসা প্রদান করা যেতে পারে। তবে, তেমন ফলপ্রসূ হয় না। দেহের পানিস্বল্পতা রোধ করার জন্য শিরায় স্যালাইন দেয়া যেতে পারে।



চিত্র ৫২ : ডায়রিয়া আক্রান্ত ছাগলে স্যালাইন প্রয়োগ

পাকস্থলী ও অন্দের পরজীবীজনিত রোগে অন্ত্রপ্রদাহ সৃষ্টি হয় এবং আন্ত্রিক অতিসক্রিয়তার কারণে ডায়রিয়া দেখা দেয়।

পরজীবীজনিত ডায়রিয়া (Parasitic Diarrhoea)

পরিপাকতন্ত্র, বিশেষ করে পাকস্থলী, ক্ষুদ্রাত্ম ও বৃহদস্ত্রে বসবাসকারী পরজীবী গবাদিপশুতে ডায়রিয়া সৃষ্টি করে। যেসব পরিপাকতন্ত্রের কৃমি ও এককোষি প্রাণী ডায়রিয়া সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে Ascaris (অ্যাসকেরিস) বা Toxocara (টক্সোকারা), Anchyllostoma (অ্যানকাইলোস্টোমা), Bunostomum (বুনোস্টোমাম), Oesophagostomum (ইসোফেগোস্টোমাম), Paramphistomum (প্যারাফিস্টোমাম), Coccidia (কক্সিডিয়া), Balantidium (ব্যালান্টিডিয়াম), Entamoeba (অ্যান্টামিবা), Giardia (জিয়ারডিয়া) প্রভৃতি প্রধান।

এসব পরজীবীজনিত ডায়রিয়া রোগ সম্পর্কে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন পরজীবী গ্লারা সৃষ্টি এসব রোগে আন্ত্রিক উত্তেজনা অথবা প্রদাহ সৃষ্টি হয়। ফলে, আন্ত্রিক অতিসক্রিয়তার কারণে ডায়রিয়া হয়। প্রদাহের মাত্রার ওপর ভিত্তি করে ডায়রিয়ার সংগে শ্লেংশা অথবা রক্তমিশ্রিত থাকতে পারে। অবিরাম অথবা সবিরাম ডায়রিয়ার কারণে শরীরে পানিস্বল্পতা দেখা দেয়, পশু দুর্বল হয়ে পড়ে। খাদ্য গ্রহণে অনিহার কারণে দৈহিক ওজন হ্রাস পায়, দুঁফ ও মাংস উৎপাদন কমে যায়। যথাসময়ে চিকিৎসা প্রয়োগ না করলে আক্রান্ত পশু মারা যায়।

পরজীবীজনিত রোগ নির্ণয়ের জন্য আক্রান্ত পশুর মল সংগ্রহ করে অগুরীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করা হয়। বিভিন্ন পরজীবীর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ডিম শণাক্ত করে সহজেই রোগ নির্ণয় করা যায়।

রোগ নির্ণয়ের পর নির্দিষ্ট কৃমিনাশক প্রয়োগ করলে সহজেই এসব রোগ নিরাময় হয়। পশুর পানিস্থলাতা দূর করার জন্য ডেক্সট্রোজ স্যালাইন, ক্যালসিয়াম বোরোগুকোনেট প্রভৃতি শিরায় প্রয়োগ করলে সুফল পাওয়া যায়।

এছাড়া ডায়ারিয়া প্রতিরোধ করার জন্য অ্যাস্ট্রিনজেন্ট খাওয়ানো যেতে পারে।

খাদ্যজনিত ডায়ারিয়া

এ জাতীয় ডায়ারিয়া সব বয়সের এবং সকল প্রজাতির পশুতে হতে পারে। তবে, নবজাতক পশুতে এ রোগের প্রকোপ বেশি।

নিকৃষ্টমানের দুধের বিকল্প খাদ্য ও
হঠাতে অতিরিক্ত দুধ পান করালে
খাদ্যজনিত ডায়ারিয়া হয়।

কারণ

- ◆ নিকৃষ্টমানের দুধের বিকল্প খাবার সরবরাহ করা।
- ◆ আমিষমুক্ত শর্করাজাতীয় খাদ্য অধিক পরিমাণে গ্রহণ করা।
- ◆ দুধের বিকল্প খাদ্যে অতিরিক্ত সয়াবিন এবং মাংস্য আমিষের উপস্থিতি।
- ◆ অতিরিক্ত দুঃখ পান।
- ◆ হঠাতে খাদ্য পরিবর্তন।

রোগের ত্রুটিকাশ

স্বাভাবিক অবস্থায় নবজাতক পশু দুঃখ পান করার কয়েক মিনিটের মধ্যে পাকস্থলীতে জমাট বেঁধে যায় এবং ৫-১০ মিনিটের মধ্যে ক্ষুদ্রাত্মে প্রবেশ করে। কোনো নবজাতক বাচ্চুর হঠাতে অতিরিক্ত দুঃখ পান করলে পাকস্থলী স্ফীত হয় এবং আংশিকভাবে দুধ জমাট বাঁধে। এ অবস্থায় তরল ও জমাট বাঁধা দুধ অধিক পরিমাণে অন্ত্রে প্রবেশ করে, কিন্তু সঠিকভাবে শোষিত হতে পারে না। অন্ত্রে তরল পদার্থের পরিমাণ বেড়ে যায়, ব্যাকটেরিয়া অধিকতর সবল হয় এবং ডায়ারিয়া দেখা দেয়।

লক্ষণ

খাদ্যজনিত ডায়ারিয়ায় আক্রান্ত
তিনি সগ্নাহ বয়সের বাচ্চুরে
পায়খানা হালকা হলুদ বর্ণের ও
দুর্গক্ষয়কৃত হয়।

- ◆ তিনি সগ্নাহ বয়সের বাচ্চুরে পায়খানা হালকা হলুদ বর্ণের ও দুর্গক্ষয়কৃত হয়।
- ◆ মলগ্লারের চারপাশ এবং লেজে পাতলা পায়খানা লেগে থাকে।
- ◆ অনেক বাচ্চুরে দীর্ঘমেয়াদী ডায়ারিয়া দেখা দেয়। দৈহিক ওজন কমে যায় এবং পানিস্থলাতার কারণে বাচ্চুর মারা যায়।

রোগ নির্ণয়

হঠাতে খাদ্য পরিবর্তনের পর ডায়ারিয়া হওয়ার ইতিহাস থেকে এ রোগ নির্ণয় করা হয়।

চিকিৎসা

- ◆ দুধ পান করা তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করতে হবে এবং ২৪ ঘন্টা পর্যন্ত মুখ দিয়ে স্যালাইন খাওয়াতে হবে।
- ◆ কোনো চিকিৎসা ছাড়াই অনেক সময় বাচ্চুর কয়েকদিনের মধ্যে ভালো হয়ে যেতে পারে।
- ◆ ডায়ারিয়া বন্ধ হওয়ার পর ক্রমান্বয়ে দুধ পান করানো শুরু করতে হবে।

অনুশীলন (Activity) : গরুর বিভিন্ন প্রকার ডায়ারিয়া সম্পর্কে একটি রচনা লিখুন।



কোষ্ঠকাঠিন্য (Constipation)

আন্তিক শিথিলতার কারণে পায়খানা স্বাভাবিকের চেয়ে শক্ত হলে তাকে কোষ্ঠকাঠিন্য বলে। এ রোগ গর্ভমহিষে কদাচিৎ দেখা যায়। তবে কুকুর ও বিড়ালে মাঝেমধ্যেই এ রোগ সংঘটিত হয়।

কারণতত্ত্ব

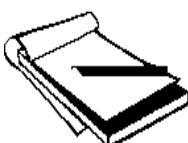
- ◆ কোষ্ঠকাঠিন্যতা কোনো কোনো রোগের লক্ষণ হিসেবে প্রকাশ পেতে পারে। যেমন— গাভীর দুঃস্ফুর হলে ক্যালসিয়াম ঘাটতিজনিত কারণে আন্তিক শিথিলতা দেখা দেয়ায় কোষ্ঠকাঠিন্য হয়। ক্যালসিয়াম ইনজেকশনের মাধ্যমে দুঃস্ফুর আরোগ্য হলে কোষ্ঠকাঠিন্যতাও বিলুপ্ত হয়।
- ◆ ভেড়াতে ভিটামিন এ ঘাটতিজনিত কারণে এ রোগ হতে পারে।
- ◆ ঘাসের সাথে মাটি ও বালি শরীরে প্রবেশ করলে এ রোগ হতে পারে।
- ◆ অতিরিক্ত অপরিপাকযোগ্য খাদ্য গ্রহণ ও শরীরে পানিস্পন্দনতা এ রোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করে।
- ◆ ব্যারিয়াম সালফেট, অ্যান্টিসিড, নার্কোটিক, অ্যান্টিকোলিনার্জিক ও অ্যান্টিহিস্টাসিন জাতীয় ওষুধ প্রয়োগে এ রোগ হতে পারে।
- ◆ কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের রোগ, যেমন— সিসা বিষক্রিয়া, জলাতক্ষ প্রভৃতিতে কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দিতে পারে।
- ◆ আন্তিক সংকীর্ণতা, মলনালির বহিগমন (Rectal Prolapse), মলঘার ও মলনালির বেদনা এ রোগ সৃষ্টির সহায়ক।
- ◆ অপর্যাপ্ত ব্যায়ামের কারণেও এ রোগ হতে পারে।

রোগ নির্ণয়

- ◆ পশুর মালিক অথবা পালকের নিকট থেকে ইতিহাস জেনে এ রোগ নির্ণয় করা যায়।
- ◆ কুকুরবিড়ালের ক্ষেত্রে পেটের নির্দিষ্ট স্থান আঙুল ফ্লারা চাপ দিয়ে কোষ্ঠকাঠিন্যতা অনুমান করা যায়।
- ◆ রেডিওগ্রাফির সাহায্যে সহজেই রোগ নির্ণয় করা যায়।

চিকিৎসা

- ◆ যেসব রোগের উপসর্গ হিসেবে কোষ্ঠকাঠিন্যতা দেখা দেয়, সেসব রোগের চিকিৎসা করতে হবে।
- ◆ আক্রান্ত পশুকে বেশি করে সবুজ ঘাস খাওয়াতে হবে।
- ◆ গরুর এ রোগ হলে লবণ, বোলাগুড় ও নাক্কাভোমিকা একসাথে মিশিয়ে খাওয়ালে সহজেই আরোগ্য লাভ করে।
- ◆ আধালিটার তেল ও নাক্কাভোমিকা মিশিয়ে খাওয়ালেও সুফল পাওয়া যায়।



অনুশীলন (Activity) : কোষ্ঠকাঠিন্য রোগ হলে পশুর কী কী অসুবিধা হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?



সারমর্ম : গবাদিপঙ্ক্রে, বিশেষ করে অল্পবয়স্ক বাচ্চুরে, ডায়রিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশি। এ রোগে প্রতি বছর অসংখ্য পশু মারা যায়। বিভিন্ন প্রকার ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, পরজীবী, এমনকী খাদ্যজনিত কারণেও এ রোগ হতে পারে। ডায়রিয়ার কারণে আক্রান্ত পশুর শরীরে পানি ও ইলেক্ট্রোলাইট স্বল্পতা দেখা দেয়। ফলে পশু ক্রমান্বয়ে দুর্বল ও নিষ্ঠেজ হয়ে পড়ে এবং শেষে মারা

যায়। রোগলক্ষণ পর্যবেক্ষণ ও গবেষণাগারে নমুনা পরীক্ষার মাধ্যমে এসব রোগের কারণ নির্ণয় করা যায়। নির্দিষ্ট কারণ নির্ণয়পূর্বক তদানুযায়ী যথাযথ চিকিৎসা প্রদান করলে ডায়ারিয়া থেকে আক্রান্ত পশু আরোগ্য লাভ করতে পারে। উল্লেখ্য ভাইরাসজনিত ডায়ারিয়ার বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর চিকিৎসা নেই। তবে, সহায়ক চিকিৎসা হিসেবে অ্যান্টিনজেন্ট, ফ্লুইড ও ইলেক্ট্রোলাইট প্রভৃতি প্রয়োগ করলে সুফল পাওয়া যায়। কোষ্ঠকাঠিন্য রোগ গরুমহিয়ে কদাচিং দেখা যায়। তবে, কুকুরবিড়ালে এ রোগের প্রাদুর্ভাব রয়েছে। আন্তরিক নিষ্ক্রিয়তা ও শিথিলতার কারণে প্রধানত এ রোগ দেখা দেয়। আক্রান্ত পশুর পায়খানা স্বাভাবিকের চেয়ে শক্ত হয়। কোষ্ঠকাঠিন্য অনেক সময় অন্যান্য রোগের উপসর্গ হিসেবে দেখা দেয়, যেমন— গাভীর দুঃখজ্বর। খাওয়ার লবণ, বোলাণ্ড় ও নাক্সানোমিকা এ রোগ চিকিৎসায় বেশ কার্যকর।



পাঠোভর মূল্যায়ন ৬.৩

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. নবজাতক বাচুরে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কী প্রয়োজন?

- i) শালদুধ
- ii) স্যালাইন
- iii) অ্যান্টিবায়োটিক
- iv) সালফোনেমাইড

খ. কোন্ রোগের উপসর্গ হিসেবে গাভীতে কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা যায়?

- i) জোনস্ ডিজিজ
- ii) দুঃখজ্বর
- iii) নিউমোনিয়া
- iv) ঘক্ষা

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. সালমোনেলোসিস একটি ভাইরাসজনিত রোগ।

খ. কোষ্ঠকাঠিন্য রোগ কুকুরবিড়ালে বেশি দেখা যায়।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. উদরাময় রোগের অপর নাম _____।

খ. কলিব্যাসিলোসিস রোগে পায়খানা অত্যন্ত _____ হয়।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. হঠাৎ খাদ্য পরিবর্তন করলে বাচুরে কী রোগ হতে পারে?

খ. রিভারপেস্ট রোগের টিকার নাম কী?

পাঠ ৬.৪ জোয়াল কান্দা, কুঁজে ঘা ও অন্যান্য ক্ষত



এ পাঠ শেষে আপনি –

- জোয়াল কান্দা রোগ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে পারবেন।
- কুঁজে ঘা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বলতে ও লিখতে পারবেন।
- পোড়াক্ষত বিশদভাবে আলোচনা করতে পারবেন।



জোয়াল কান্দা (Yoke Gall)

চাষাবাদ ও মাল পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত গরুমহিষের কাঁধে জোয়ালের ঘর্ষণে সৃষ্টি প্রদাহজনিত ফোঁড়াকে জোয়াল কান্দা বা জোয়াল ঘর্ষণ বলে।

সংঘটন (Occurrence)

যেসব দেশে চাষাবাদ ও মালামাল পরিবহনের জন্য গরুমহিষ ব্যবহার করা হয়, সেসব দেশেই প্রধানত জোয়ালকান্দা রোগ দেখা যায়। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশে এ রোগ প্রায়ই দেখা যায়। এ রোগ প্রধানত ঝাঁড় বা বলদ গরুমহিষে দেখা যায়। কারণ, এসব পশুই সাধারণত লাঙ্গল ও গাড়ি টানার কাজে ব্যবহৃত হয়।

কারণতত্ত্ব (Oetiology)

- ◆ অনভাস্ত বা আনকোরা গরুমহিষকে হঠাতে লাঙ্গল বা গাড়ি টানার কাজে ব্যবহার করা।
- ◆ বন্ধুর বা উঁচুনিচু রাস্তায় দীর্ঘক্ষণ অতিরিক্ত মালামাল পরিবহণ করা।
- ◆ খামারে শক্ত মাটি কর্ষণ করা।
- ◆ অমসৃণ জোয়াল ব্যবহার করা।
- ◆ লাঙ্গল ও গাড়ি টানার কাজে অসম উচ্চতার পশু ব্যবহার করা।

রোগলক্ষণ

- ◆ কাঁধের উপরদিকে জোয়াল রাখার স্থান ফোলা দেখা যায়।
- ◆ তৈরিতার ওপর ভিত্তি করে এ ফোলার আকৃতি সুপারি থেকে শুরু করে ফুটবলের ন্যায় হতে পারে।
- ◆ ফোলা অংশ সাধারণত ফোঁড়া অথবা টিউমারের মতো মনে হয়। ফোঁড়া প্রকৃতির জোয়াল কান্দা অনেক সময় আপনাআপনি ফেটে গিয়ে পুঁজাতীয় পদার্থ নির্গত হতে পারে।
- ◆ জোয়াল কান্দা তৈরি প্রকৃতির হলে অত্যন্ত বেদনাদায়ক হয় এবং পশু উক্ত স্থান স্পর্শ করতে দেয় না।
- ◆ অধঃতৃক প্রদাহের কারণে চামড়া ক্ষীত হয় ও ভাঁজ পড়ে।
- ◆ দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতির জোয়াল কান্দায় আক্রান্ত স্থান শক্ত প্রতীয়মান হয় এবং কোনো বেদনা থাকে না।

রোগনির্ণয়

- ◆ ইতিহাস ও রোগলক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে সহজেই এ রোগ নির্ণয় করা যায়।
- ◆ ফোলাস্থান থেকে সংগৃহীত রস পরীক্ষা করেও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

চিকিৎসা

- ◆ আক্রান্ত পশুকে তাংক্ষণিকভাবে পূর্ণ বিশ্রাম প্রদান করতে হবে।
- ◆ তৈরি বেদনা উপশমের জন্য সোডিয়াম স্যালিসাইলেট ইনজেকশন দেয়া যেতে পারে।

পরিপক্ষ জোয়াল কান্দা
অঙ্গোপচারের মাধ্যমে পুঁজমুক্ত
করতে হবে।

জোয়াল কান্দা রোগ থেকে
মায়াসিস বা কীড়া পড়া রোগ
হতে পারে।

- ◆ ফেঁড়াজাতীয় জোয়াল কান্দা পাকানোর জন্য ম্যাগনেসিয়াম সালফেট গ্লারা ফোলাস্থানে গরম ছ্যাক (Hot Fomentation) দেয়া যেতে পারে।
- ◆ পরিপক্ষ জোয়াল কান্দা অঙ্গোপচারের মাধ্যমে পুঁজমুক্ত করতে হবে।
- ◆ পুঁজ সম্পূর্ণভাবে নিষ্কাশিত হলে ক্ষতস্থান জীবাণুনাশক গ্লারা উত্তমরূপে ঘোত করতে হবে। এবং টিক্কচার আয়োডিনমিশ্রিত গজ গ্লারা আরোগ্য লাভ করা পর্যন্ত ড্রেসিং করতে হবে।
- ◆ অ্যান্টিবায়োটিক ৩-৪ দিন প্রয়োগ করলে ক্ষত নিরাময় তরাণিত হয়।
- ◆ জোয়াল কান্দা শক্ত প্রকৃতির হলে অঙ্গোপচারের মাধ্যমে শক্ত অংশটুকু কেটে ফেলতে হবে। এবং ক্ষতস্থান সেলাই করে দিতে হবে।
- ◆ অঙ্গোপচারের পর ৩-৪ দিন অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করতে হবে।

জটিলতা

জোয়াল কান্দা রোগ থেকে মায়াসিস (Myiasis) বা কীড়া পড়া রোগ হতে পারে। অন্যান্য জটিলতার মধ্যে কুঁজে ঘা রোগ প্রধান। এ দুটো জটিলতাই মাছির আক্রমণে ঘটে থাকে। এসব জটিলতা থেকে পশুকে রক্ষার জন্য ক্ষতের চারপাশে মাছি বিতাড়ণকারী ওষুধ, যেমন— তারপিন তেল প্রয়োগ করা যেতে পারে। এছাড়া ক্ষতস্থানে নেগুভন (Neguvon) ব্যবহার করলে উল্লেখিত জটিলতা নিরসনে সুফল পাওয়া যায়।

ক্ষতিকর প্রভাব (Bad Effects)

জোয়াল কান্দা রোগে আক্রান্ত পশুকে চাষাবাদ ও পরিবহণ কাজে ব্যবহার করা যায় না। ফলে কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চামড়ার গুণগত মান হ্রাস পায়।

প্রতিরোধ

- ◆ অনভ্যস্ত ও আনকোরা গরুমহিষকে হঠাতে লাঙ্গল ও গাড়ি টানার কাজে দীর্ঘক্ষণ ব্যবহার না করা।
- ◆ গাড়িতে ঝাঁকুনি নিরোধক ব্যবস্থা সংযোজন করা।
- ◆ অমসৃণ জোয়াল ব্যবহার না করা।
- ◆ লাঙ্গল বা গাড়ি টানার পূর্বে জোয়ালে তেলাক্ত পদার্থ মেখে নেয়া।

কুঁজে ঘা

এটি একটি পরজীবীজনিত রোগ। এ রোগে গরুমহিষের কুঁজ বা কাঁধের চূড়ায় এবং তৎসংলগ্ন স্থানে একপ্রকার প্রদাহজনিত ক্ষত সৃষ্টি হয়।

সংঘটন

পৃথিবীর সকল দেশেই এ রোগ রয়েছে। তবে, আমাদের উপমহাদেশে এ রোগের প্রাদুর্ভাব অত্যধিক। এক সরীক্ষায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে শতকরা ২০-২৫ ভাগ গরুমহিষ কুঁজে ঘা রোগে আক্রান্ত হয়। এক বছরের কম বয়স্ক গরুমহিষে সাধারণত এ রোগ হয় না। কুঁজে ঘা সব খাতুতে দেখা গেলেও বসন্তে এবং গ্রীষ্মকালে এ রোগের প্রকোপ অপেক্ষাকৃত বেশি। এ রোগ ছোঁয়াচে হবার কারণে খামার এলাকায় এর প্রাদুর্ভাব বেশি। দুঃখামারে শতকরা ৯০-১০০ ভাগ গাভী কুঁজে ঘা রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

কারণতত্ত্ব

Stephanofilaria assamensis (স্টেফানোফাইলেরিয়া আসামেনসিস) নামক একপ্রকার ফাইলেরিয়া পরজীবী কৃমি এ রোগ সৃষ্টি করে।

সংক্ষিপ্ত

Musca conducens নামক একপ্রকার মাছি কুঁজে ঘা আক্রান্ত পশু, সুস্থ পশুতে সংক্রমিত করে রোগ ছড়ায়।

আক্রান্ত গরুমহিমের ক্ষতস্থানে রোগসৃষ্টিকারী পরজীবীর অসংখ্য শূককাট বা লার্ভা সঞ্চিত থাকে। এসব লার্ভাকে *Microfilaria* (মাইক্রোফাইলেরিয়া) বলে। কুঁজে ঘায়ের স্থানে প্রচন্ড চুলকানি অনুভূত হওয়ায় পশু স্বজোড়ে ক্ষতস্থান কোনো গাছ বা স্থির বস্তুর সাথে ঘর্ষণ করতে থাকে। ফলে ক্ষতস্থান থেকে রক্তমিশ্রিত রস নির্গত হয়। এ রসে অসংখ্য মাইক্রোফাইলেরিয়া থাকে। এ অবস্থায় পরিবেশ থেকে *Musca conducens* (মাস্কা কনডিউসেস) নামক একপ্রকার মাছি সহজেই প্রলুক্ত হয় এবং ক্ষতস্থানের রস শোষণ করে উদর পূর্তি করে। শোষিত রসের সাথে অসংখ্য লার্ভা বা মাইক্রোফাইলেরিয়া মাছির পেটে প্রবেশ করে। প্রথম পর্যায়ের (First Stage) এসব লার্ভা তিনি সপ্তাহের মধ্যে মাছির পেটে খোলস বদলিয়ে তৃতীয় পর্যায়ের (Third Stage) লার্ভাতে পরিণত হয়। এসব মাছি সুস্থ পশুর কুঁজ বা কাঁধের কোনো ক্ষুদ্র সাধারণ ঘায়ে বসলে তৃতীয় পর্যায়ের লার্ভাসমূহ মাছি থেকে সহজেই সংক্রমিত হয়। এ সংক্রমণের আড়াই মাসের মধ্যে সুস্থ পশু কুঁজে ঘা রোগে আক্রান্ত হয়।



চিত্র ৫৩ : কুঁজে ঘায়ে আক্রান্ত একটি গরু

রোগলক্ষণ

গরুমহিমের কুঁজ, কাঁধ বা তৎসংলগ্ন স্থানে কুঁজে ঘা রোগের ক্ষত পরিলক্ষিত হয়। চর্মপ্রদাহ ও চুলকানির কারণে পশু ক্ষতস্থান গাছ বা কোনো শক্ত বস্তুর সাথে ঘর্ষণ করতে থাকে। ঘর্ষণের ফলে নির্গত রক্তমিশ্রিত রস শুকিয়ে ক্ষতস্থানে শক্ত আবরণ সৃষ্টি করে। ক্ষতস্থানের পরিবর্তন তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে।

প্রাথমিক পর্যায় (Initial Stage) : আক্রান্ত স্থানের ব্যাস ১.০–২.০ সেন্টিমিটার হয়। লোম পড়ে যায় ও ত্বক খসখসে হয়। ক্ষতস্থান থেকে সামান্য রস নির্গত হয় এবং তা শুকিয়ে আবরণ সৃষ্টি করে। মৃদু ঘর্ষণের ফলে ক্ষতস্থান থেকে সামান্য রক্তপাত হতে পারে।

তীব্র পর্যায় (Acute Stage) : এক্ষেত্রে কুঁজে ঘায়ের ব্যাস ৩.০–৪.৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হতে পারে। ক্ষতের কেন্দ্র লাল ও সিঙ্গ থাকে এবং রস নির্গত হয়। এ রস শুকিয়ে গেলে ঘায়ের উপর চট্টা পড়ে। ঘর্ষণের ফলে এ চট্টা সরে গেলে রক্তপাত হয়।

দীর্ঘস্থায়ী পর্যায় (Chronic Stage) : ৬.০–১০.৫ সেন্টিমিটার ব্যাসবিশিষ্ট কুঁজে ঘা এ পর্যায়ে গণ্য করা হয়। ক্ষতের মধ্যস্থলের ত্বক সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। দীর্ঘদিনযাবৎ ঘর্ষণের ফলে ত্বক পুরু হয়, ত্বকে ভাঁজ পড়ে ও শক্ত হয়।

রোগ নির্ণয়

পশুর কুঁজ, কাঁধ ও তৎসংলগ্ন স্থানে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ক্ষত পর্যবেক্ষণ করে সহজেই এ রোগ নির্ণয় করা যায়। এছাড়া ক্ষতস্থান থেকে সংগৃহীত নমুনা অগুরীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করে পরজীবী শণাক্তকরণের মাধ্যমে এ রোগ চূড়ান্তভাবে নির্ণয় করা যায়।

চিকিৎসা

কুঁজে ঘা চিকিৎসার জন্য
নেগুভন অত্যন্ত ফলপ্রসূ ওষুধ।

এ রোগ চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন প্রকার কৃমিনাশক, কীটনাশক, অ্যালার্জি নিরোধক প্রত্তি ওষুধ ব্যবহার করা হয়। কুঁজে ঘা চিকিৎসার জন্য নেগুভন (Neguvon^(R), Bayer) অত্যন্ত ফলপ্রসূ।

- ◆ শতকরা ১২ ভাগ নেগুভনসমৃদ্ধ মলম দিনে দুবার করে ৩২–৪৫ দিন পর্যন্ত ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করলে শতকরা ৬০ ভাগ পশু আরোগ্য লাভ করে।
- ◆ শতকরা ১০ ভাগ নেগুভন ও ৫ ভাগ সালফানিলামাইড সমষ্টিয়ে গঠিত মলম প্রত্যহ দুবার ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করলে ঘায়ের আকৃতির ওপর নির্ভর করে ২০–৪৪ দিনের মধ্যে এ রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।
- ◆ শতকরা ১০ ভাগ নেগুভন, ৫ ভাগ সালফানিলামাইড ও ৫ ভাগ জিঙ্ক অক্সাইডসমৃদ্ধ মলম এ রোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে সর্বাধিক কার্যকর। এ মলম দিনে দুবার ব্যবহারে ১০–৩০ দিনের মধ্যে কোনো জটিলতা ছাড়াই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।
- ◆ উপরের যে কোনো একটি মলম প্রথমবার ব্যবহারের পূর্বে ক্ষতস্থান ভালোভাবে আঁচড়িয়ে (Scrapping) পরিষ্কার করে নিতে হবে এবং কোনো বহিরাবরণ বা চটা (Crust) থাকলে তা উঠিয়ে ফেলতে হবে। অতঃপর জীবাণুনাশক ফ্লারা ক্ষতস্থান উত্তমরূপে পরিষ্কার করে নিতে হবে।
- ◆ লিভামিজল হাইড্রোক্লোরাইড, টেট্রামিজল হাইড্রোক্লোরাইড, অ্যান্টিমোসান, নিলভার্ম প্রত্তি ওষুধসমূহও এ রোগ চিকিৎসায় কার্যকর।
- ◆ ক্ষতস্থান সীমিত আকৃতির হলে অঙ্গোপচারের মাধ্যমে তা সহজেই অপসারণ করা যায়। অপসারণের পর ক্ষতস্থান সেলাই করা হয়। সেলাই বরাবর উপরের যে কোনো একটি মলম দিনে দুবার ব্যবহার করলে ১৫–২০ দিনের মধ্যে শতকরা ১০০ ভাগ পশু এ রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করে।

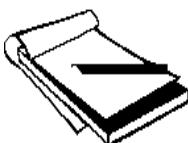
কুঁজে ঘায়ে আক্রান্ত পশুর খাদ্য
গ্রহণ হ্রাস পাবার কারণে
দেহিক ওজন, দুধ ও মাংস
উৎপাদন করে যায়।

ক্ষতিকর প্রভাব

কুঁজে ঘায়ে আক্রান্ত পশু সাধারণত মারা যায় না। তবে, খাদ্য গ্রহণ হ্রাস পাবার কারণে আক্রান্ত পশুর দৈহিক ওজন, দুধ ও মাংস উৎপাদন করে যায়। ফলশ্রুতিতে কৃষক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উল্লেখ্য, কুঁজে ঘাস অন্যান্য চর্মরোগের কারণে চামড়ার গুণগত মান হ্রাস পাওয়ায় প্রতি বছর বাংলাদেশের ৯০০ কোটি টাকা ক্ষতি হয়।

প্রতিকার

গরমহিঁরের কুঁজ, কাঁধ ও তৎসংলগ্ন স্থানে কোনো ক্ষুদ্র সাধারণ ক্ষত দেখা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে তা চিকিৎসা করতে হবে। ক্ষতস্থানে মাছি বিভাড়নকারী ওষুধ, যেমন— তারপিন তেল প্রয়োগ করতে হবে।



অন্যান্য ক্ষত
অন্যান্য ক্ষত
বিভিন্ন প্রকার ক্ষত সমন্বে পাঠ ৬.৫ এ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কাজেই এ পাঠে

শুধুমাত্র পোড়াক্ষত সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

পোড়াক্ষত (Burns)

শরীরের কোনো অংশ পুড়ে
যাবার ফলে যে ক্ষত সৃষ্টি হয়
তাকে পোড়াক্ষত বলে।

কারণতত্ত্ব

- ◆ গোশালায় আণুন ধরে গেলে গরুমহিষ পুড়ে যেতে পারে।
- ◆ সন্ধ্যাবেলায় মশা বিতাড়নের জন্য গোয়াল ঘরে যে অগ্নিধোঁয়া দেয়া হয় তা থেকে গবাদিপশুর নিম্নাঙ্গ পুড়ে যেতে পারে।
- ◆ নিক্ষিপ্ত গরম পানি পশুর শরীরে পড়লে পোড়াক্ষতের সৃষ্টি হয়।
- ◆ পশু নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত রশির ঘর্ষণে শরীরের অংশবিশেষ পুড়ে যেতে পারে।
- ◆ অ্যাসিড বা ক্ষার হ্লারা পোড়াক্ষত সৃষ্টি হতে পারে।

লক্ষণ

তীব্রতার ওপর ভিত্তি করে
পোড়াক্ষে প্রধানত ৪ ভাগে ভাগ
করা যায়। যথা— প্রথম, দ্বিতীয়,
তৃতীয় ও চতুর্থ মাত্রার পোড়া।

তীব্রতার ওপর ভিত্তি করে পোড়াক্ষে প্রধানত ৪ ভাগে ভাগ করা যায়। নিচে বিভিন্ন মাত্রার পোড়ার বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। যথা—

ক. প্রথম মাত্রার পোড়া (First Degree Burn) : মৃদু মাত্রার এ পোড়ায় লোম পুড়ে যায়, তুক লাল হয় এবং তুকের উপরিভাগ (Epidermis) সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

খ. দ্বিতীয় মাত্রার পোড়া (Second Degree Burn) : তুকের পুরুত্বের একটা অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ফোক্ষা পড়তে পারে। তাপমাত্রা 60° সে এর উপরে গেলে সাধারণত ফোক্ষা পড়ে।

গ. তৃতীয় মাত্রার পোড়া (Third Degree Burn) : তুকের গোটা পুরুত্ব ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এর অংশবিশেষ খসে পড়তে পারে। ফলে কাঁচা ঘায়ের সৃষ্টি হয় এবং ঘা থেকে রক্তরস নির্গত হয়।

ঘ. চতুর্থ মাত্রার পোড়া (Fourth Degree Burn) : পুরো তুক এবং তুকের নিচের কলাসমূহ সম্পূর্ণ ঝালসে যায়। এ ঝালসানো অংশ প্রথমে শক্ত ও পরে কালো হয়ে সম্পূর্ণটা খসে পড়ে এবং কাঁচা ঘা থেকে অবিরাম রক্তরস নির্গত হতে থাকে।

রোগ নির্ণয়

ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ দেখে বিভিন্ন প্রকার পোড়া নির্ণয় করা যায়।

পরিণতি

পোড়াক্ষতের পরিণতি এর অবস্থান, বিস্তৃতি, গভীরতা, আক্রান্ত পশুর বয়স ও সার্বিক শারীরিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে। ছোট আকারের গভীর ক্ষত অপেক্ষা বড় আকারের অগভীর ক্ষত অধিক বিপজ্জনক। পোড়াক্ষত থেকে অবিরত পানি ও ইলেক্ট্রোলাইট নিঃসরণের ফলে রক্তের ঘনত্ব বেড়ে যায় এবং শক (Shock) হয়ে পশু মারা যায়।

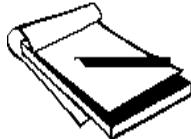
চিকিৎসা

পশুর শরীরের ৫০ ভাগের অধিক অংশ পুড়ে গেলে কোনো চিকিৎসাই ফলপ্রসু হয় না। এসব ক্ষেত্রে মানবিক কারণে পশুকে বেদনামুক্তভাবে মেরে ফেলা বাধ্যনীয়। ক্ষত চিকিৎসাযোগ্য হলে নিম্নলিখিত চিকিৎসা প্রদান করা যেতে পারে। যথা—

- ◆ জীবাণু সংক্রমণ প্রতিরোধকল্পে পশুকে জীবাণু সংক্রমণ থেকে রক্ষা করতে হবে। পুড়ে গেলে তুক খসে পড়ে এবং সহজেই জীবাণু সংক্রমণ ঘটে। এ সংক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয়।

পশুর শরীরের ৫০ ভাগের
অধিক অংশ পুড়ে গেলে
কোনো চিকিৎসাই ফলপ্রসু হয়

- ◆ পানিস্বল্পতা রোধ— চতুর্থ মাত্রার পোড়াক্ষত থেকে অবিরাম পানি ও ইলেক্ট্রোলাইট নির্গমণের ফলে শরীরে পানিস্বল্পতা দেখা দেয়। এ পানিস্বল্পতা রোধ করার জন্য ৫% ডেক্সট্রোজ স্যালাইন শিরায় ইনজেকশন দেয়া যেতে পারে।
- ◆ ক্ষতস্থানের প্রদাহ নিবারণ ও বেদনা উপশমের জন্য কর্টিকোস্টেরয়েড ইনজেকশন দেয়া যেতে পারে।
- ◆ ক্ষতস্থান থেকে নির্গত হিস্টামিন শক সৃষ্টিতে সহায়তা করে। অ্যান্টিহিস্টামিনজাতীয় ওষুধ প্রয়োগে এ সম্ভাবনা দূর করা যায়।
- ◆ ক্ষতস্থানে জীবাণুমুক্ত ব্যান্ডেজ প্রয়োগ করা ভালো।
- ◆ ভিটামিন সি প্রয়োগ করলে আরোগ্য তরাণ্মিত হয়।
- ◆ অ্যাসিড গ্লারা কোনো ক্ষত হলে তৎক্ষণাত্ম সাবান পানি এবং ক্ষার গ্লারা ক্ষত হলে ভিনেগার প্রয়োগ করা উচিত।



অনুশীলন (Activity) : গ্রামাঞ্চলে পশুর পোড়াক্ষত চিকিৎসার জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়?



সারমর্ম : জোয়াল কান্দা রোগ লাঙ্গল ও গাড়িটানা গরুমহিষের কাঁধে জোয়ালের ঘর্ষণজনিত কারণে সৃষ্টি হয়। ক্ষতস্থান সাধারণত ফেঁড়ার ন্যায় ফুলে যায় এবং তীব্র বেদনা অনুভূত হয়। অঙ্গোপচারের মাধ্যমে পুঁজ অপসারণ ও টিক্কচার আয়োডিনমিশ্রিত গজ গ্লারা ৩-৪ দিন দ্রেস করলে পশু আরোগ্য লাভ করে। কুঁজে ঘা পরজীবীজনিত রোগ। গরুমহিষের কুঁজ ও তৎসংলগ্ন স্থানে অবস্থিত ক্ষুদ্র সাধারণ ক্ষতে মাছি গ্লারা পরিবাহিত লার্ভা সংক্রমণে এ রোগ সৃষ্টি হয়। চর্মপ্রদাহ ও চুলকানির কারণে আক্রান্ত পশু ক্ষতস্থান স্বজোড়ে গাছ বা অন্য কোনো শক্ত বস্তুর সাথে ঘর্ষণ করে। ফলে রক্তপাত হয় এবং ক্ষতস্থান বিস্তৃতি লাভ করে। নেগেভন, সালফানিলামাইড ও জিংক অক্সাইড সমষ্টিয়ে তৈরি মলম এ রোগ চিকিৎসায় অত্যন্ত কার্যকর। অঙ্গোপচারের মাধ্যমেও এ রোগ চিকিৎসা করা যায়। পোড়াক্ষত প্রধানত আগুন, গরম তরল পদার্থ, অ্যাসিড ও ক্ষার গ্লারা সৃষ্টি হয়। পোড়াক্ষতের কারণে সৃষ্টি জীবাণু সংক্রমণ, পানিস্বল্পতা ও রক্তের ঘনত্ব বৃদ্ধির ফলে পশু মারা যায়। অ্যান্টিবায়োটিক, স্যালাইন, অ্যান্টিহিস্টামিন, কর্টিকোস্টেরয়েড, ভিটামিন সি প্রভৃতি ওষুধ প্রয়োগে পোড়াক্ষত চিকিৎসা করা যায়।



পাঠোভৰ মূল্যায়ন ৬.৪

১। সঠিক উত্তৰের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

- ক. জোয়াল কান্দা রোগ কোন্ জাতীয় পশ্চতে হয়?
i) দুঃখবতী গাভীতে
ii) গাভীন পশ্চতে
iii) লাঙল ও গাড়ি টানার কাজে ব্যবহৃত গৱৰ্মহিষে
iv) সৌধিন ঘোড়াতে

- খ. কুঁজে ঘা চিকিৎসার সর্বাধিক ফলপ্রসূ ওষুধের নাম কী?
i) সালফানিলামাইড
ii) নেপতুন
iii) জিংক অক্সাইড
iv) পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

- ক. বালিমাটি কৰণে জোয়াল কান্দা রোগ বেশি হয়।
খ. এক বছৱ বয়ক গৱৰ্মহিষে কুঁজে ঘা বেশি হয়।

৩। শূন্যস্থান পূরণ কৰুন।

- ক. জোয়ালকান্দা রোগের অপৰ নাম _____ ঘৰ্ষণ।
খ. কুঁজে ঘা সৃষ্টিকাৰী পৱজীবীৰ নাম _____ *assamensis*।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তৰ দিন।

- ক. জোয়াল কান্দা রোগের দৃটো জটিলতাৰ নাম লিখুন।
খ. অ্যাসিড ঘারা সৃষ্ট ক্ষতেৱ চিকিৎসা কী?

পাঠ ৬.৫ বিভিন্ন রকমের ক্ষত



এ পাঠ শেষে আপনি –

- ক্ষত কী, ক্ষতের কারণ ও শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকার উন্মুক্ত ক্ষতের বৈশিষ্ট্য, লক্ষণ, সম্ভাব্য পরিনতি এবং চিকিৎসা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকার অভ্যন্তরীণ ক্ষতের বৈশিষ্ট্য ও চিকিৎসা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ক্ষতের জটিলতাসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।



ক্ষত কী?

শরীরের বহিরাবরণ বা ত্বক এবং অভ্যন্তরীণ আবরণ বা শ্লেষ্মিক বিল্লি (Mucous Membrane) কোনো আঘাতজনিত কারণে বিভক্ত হওয়াকে ক্ষত (Wound) বলে।

কারণ

ক্ষত প্রধানত শারীরিক (Physical), রাসায়নিক (Chemical) ও যান্ত্রিক (Mechanical) কারণে সংগঠিত হয়। শারীরিক কারণের মধ্যে আগুন, রশ্মি; রাসায়নিক কারণের মধ্যে অ্যাসিড; ক্ষার; এবং যান্ত্রিক কারণের মধ্যে দুর্ঘটনা, আঘাত প্রভৃতি উল্লেখ করা যেতে পারে।

শ্রেণিবিভাগ

ক্ষত প্রধানত দুপ্রকার। যথা— ১. উন্মুক্ত ক্ষত ও ২. অভ্যন্তরীণ ক্ষত। এসব ক্ষত সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

১. উন্মুক্ত ক্ষত (Open Wound)

দেহের বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ আবরণীতে এ ক্ষত সীমাবদ্ধ থাকে। উন্মুক্ত ক্ষত প্রধানত সাত প্রকার। যথা—

ক. ছেঁদন ক্ষত (Incised Wound) : সাধারণত ধারালো যন্ত্রপাতি, যেমন— ছুরি, কঁচি, দা, কাঁচের টুকরো প্রভৃতি গ্লারা এ ক্ষত সৃষ্টি হয়। রংগীর অঙ্গোপচারকালেও ছেঁদন ক্ষত তৈরি হয়। এরূপ ক্ষতের পার্শ্বদ্বয় মসৃণ থাকে।

খ. ছেঁড়া ক্ষত (Lacerated Wound) : কোনো প্রতিকূল অবস্থায় ত্বক ছেঁড়ে গেলে এ জাতীয় ক্ষত তৈরি হয়। পশুর শরীরের কোনো অংশ কাটাতারে আটকে পড়লে ত্বক ছেঁড়ে যেতে পারে। এরূপ ক্ষতের প্রাত্তসীমা সাধারণত অসম থাকে।

গ. ছিদ্র ক্ষত (Punctured Wound) : তীক্ষ্ণ এবং সুচালো কোনো কিছু গ্লারা শরীরের কোথাও ছিদ্র হলে এরূপ ক্ষত তৈরি হয়। সুচাকৃতির জিনিসের মধ্যে সুচ, পেরেক, তারকাঁটা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ ধরনের ক্ষত হলে টিটেনাস হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এসব সুচাকৃতির জিনিস কখনও ত্বক ছিদ্র করে দেহাভ্যন্তরের কোনো গহ্বরে প্রবেশ করলে তাকে ভেদকারী ক্ষত (Penetrating Wound) বলে।

ঘ. বুলেট ক্ষত (Gunshot Wound) : আঘেয়ান্ত্র থেকে নিষ্কেপিত বুলেট পশুর দেহে প্রবেশ করলে এ ক্ষত সৃষ্টি হয়।

ঙ. বিষাক্ত ক্ষত (Poisoned Wound) : পশুর শরীর কোনো বিষাক্ত পদার্থ, যেমন— অ্যাসিড, ক্ষার প্রভৃতির সংস্পর্শে আসলে এ ক্ষত সৃষ্টি হয়।

ক্ষত প্রধানত দুপ্রকার। যথা—
উন্মুক্ত ও অভ্যন্তরীণ ক্ষত।

ক. ছেঁদন ক্ষত ধারালো অস্ত্র গ্লারা
সৃষ্টি হয়।

খ. ছেঁড়া ক্ষত কাটা তার গ্লারা সৃষ্টি
হয়।

গ. ছিদ্র ক্ষত জিনিস গ্লারা ছিদ্র
ক্ষত তৈরি হয়।

চ. পুঁজস্ত্রাবী ক্ষত (Ulcerating Wound) : কোনো ক্ষত থেকে যখন অনবরত পুঁজ বা কষানি নির্গত হয় এবং সাধারণ চিকিৎসায় নিরাময় হয় না তখন তাকে পুঁজস্ত্রাবী বা দুষ্টক্ষত বলে। বিশেষ ধরনের জীবাণু সংক্রমণের ফলে ক্ষতের এ বৈশিষ্ট্য হয় বলে অনেকের ধারণা।

ছ. গ্রানুলেটিং ক্ষত (Granulating Wound) : শরীরের কোথাও ক্ষত হলে তা সাধারণত গ্রানুলেশন টিস্যুর বিস্তৃতির মাধ্যমে আরোগ্য লাভ করে। এ টিস্যু বা কলা ক্ষতের তলদেশ থেকে বংশবৃদ্ধি করে উপরের দিকে ওঠে। লালচে এ কলাতে জীবাণু সংক্রমণের ফলে এজাতীয় ক্ষত তৈরি হয়।

ক্ষতের লক্ষণ

ক্ষতের বিভিন্ন লক্ষণের মধ্যে
রক্তপাত, বেদনা, ক্ষতের ফাঁক,
পুঁজ, তাপমাত্রা বৃদ্ধি ইত্যাদি
প্রধান।

ক. রক্তপাত (Haemorrhage) : রক্তপাত ক্ষতের একটি প্রধান লক্ষণ। রক্তপাতের মাত্রা ক্ষতস্থানের রক্ত সরবরাহ ও সঞ্চালনের ওপর নির্ভরশীল। ক্ষতস্থানে অবস্থিত কোনো বৃহৎ রক্তনালি জথম হলে রক্তপাত বেশি হয়। আবার ক্ষুদ্র রক্তনালি আক্রান্ত হলে রক্তপাত কম হয়।

খ. বেদনা (Pain) : শরীরের কোথাও ক্ষত হলে বেদনা অনুভূত হয়। এ বেদনার মাত্রা ঐ স্থানের মাঝে সরবরাহের ওপর নির্ভর করে। ক্ষতস্থানে স্নায়ুকোষ বেশি থাকলে বেদনা বেশি এবং কম থাকলে বেদনা কম অনুভূত হয়। এছাড়া ক্ষতস্থানে জীবাণু সংক্রমণের কারণে বেদনা বৃদ্ধি পায়।

গ. ক্ষতের ফাঁক (Wound Gap) : ক্ষতস্থানে সাধারণত ফাঁক সৃষ্টি হয়। এ ফাঁক উক্ত স্থানের স্থিতিস্থাপকতার ওপর নির্ভর করে। তৃকের ক্ষতে ফাঁক বেশি হয়। হাড়, শিং এবং মুরে ফাঁক কম হয়। তাছাড়া পেশিতে লম্বালম্বিভাবে ক্ষত হলে ফাঁক কম এবং আড়াআড়িভাবে ক্ষত হলে ফাঁক বেশি হবে।

ঘ. সদ্য সৃষ্টি ক্ষতস্থানে জীবাণু, রক্ত ও মৃত কলার অনুপস্থিতিতে ক্ষতের পার্শ্বদ্বয় মুখোমুখি থাকলে ক্ষতস্থান কোনো জাটিলতা ছাড়াই আরোগ্য লাভ করে।

ঙ. ক্ষতস্থানে জীবাণু সংক্রমণ হলে পুঁজ হয়। এ পুঁজ শুকিয়ে উপরে চটা পড়ে এবং নিচে গ্র্যানুলেশন কলা তৈরি হয়। পরে উপরের চটা পড়ে যায় ও ক্ষতস্থানের মেরামত সম্পন্ন হয়।

চ. ক্ষতস্থানে জীবাণু সংক্রমণের ফলে শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে।

সম্ভাব্য পরিণতি

ক্ষতের সম্ভাব্য পরিণতি জীবাণু
সংক্রমণের ওপর নির্ভর করে।

কোনো ক্ষতের পরিণতি জীবাণু সংক্রমণের ওপর নির্ভর করে। সংক্রমণমুক্ত ক্ষত সরাসরি আরোগ্য লাভ করে। পক্ষান্তরে, ক্ষত সংক্রমিত হলে আরোগ্যলাভ বিলম্বিত হয় এবং অনেক সময় জটিল আকার ধারণ করে।

চিকিৎসা

সংক্রমণমুক্ত ক্ষত (Aseptic Wound)-

- ◆ রক্তপাত বন্ধ করতে হবে।
- ◆ ক্ষতস্থানের চারপাশের তৃক জীবাণুনাশক গ্লারা পরিষ্কার করতে হবে।
- ◆ সেলাইয়ের পূর্বে ক্ষতের অভ্যন্তরে সালফানিলামাইড পাউডার প্রয়োগ করতে হবে।
- ◆ ক্ষতস্থান সেলাই করতে হবে। তৃকের সেলাইয়ের জন্য নাইলন সুতো ব্যবহার করা হয়।
ক্ষতস্থান সেড়ে গেলে (সেলাইয়ের ৭-১০ দিন পর) এ সুতো কেটে ফেলে দিতে হয়।
- ◆ ব্যাডেজ প্রয়োগ— পরিবেশ থেকে জীবাণু সংক্রমণ রোধ করার জন্য সেলাইকৃত স্থান জীবাণুমুক্ত প্যাড, তুলো ও গজ গ্লারা ব্যাডেজ করা হয়।
- ◆ বাহ্যিক প্রভাবমুক্ত থাকলে ক্ষতস্থান তাড়াতাড়ি সেরে যায়। সে কারণে পশ্চকে বিশ্রাম দেয়া আবশ্যিক।

সংক্রমিত ক্ষত জীবাণুনাশক ও অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করে নিরাময় করা যায়।

সংক্রমিত ক্ষত (Septic Wound)

প্রথমে ক্ষতস্থানের চারপাশের লোম ঢেঁছে নিতে হবে। ক্ষতস্থান জীবাণুনাশক গ্লারা পুরুষাগুপজ্ঞানপে ধোত করতে হবে এবং ক্ষতের অভ্যন্তরের সকল দুষ্যত পদার্থ পরিষ্কার করতে হবে।



চিত্র ৫৪ : কুকুরে একটি সংক্রমিত ক্ষত

- ◆ **ক্ষতস্থান ছেটে ফেলা (Excision of the Wound)**— কোনো ক্ষুদ্র ক্ষত দীর্ঘদিনযাবৎ আরোগ্যলাভ না করলে অঙ্গোপচারের মাধ্যমে ছেটে ফেলা যেতে পারে। সংক্রমণমুক্ত ক্ষত পরবর্তীতে সেলাইয়ের মাধ্যমে সহজেই সেড়ে ওঠে।
- ◆ **জীবাণুনাশক গ্লারা ধোত করা (Antiseptic Washing)** : ক্ষতস্থানের জীবাণু ধ্বংস করার জন্য বিভিন্ন জীবাণুনাশক ব্যবহার করা হয়। এদের মধ্যে হাইড্রোজেন পারঅ্যাইড, টিক্ষচার আয়োডিন, কার্বোলিক অ্যাসিড, পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, কোয়ার্টারনারি অ্যামোনিয়াম কম্পাউন্ড, ডাস্টৎ পাউডার, বিসমাথ আয়োডোফরম প্যারাফিন পেস্ট, ডেটল, স্যাভলন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।
- ◆ **নিষ্কাশন (Drainage)** : ক্ষতস্থানের দুষ্যত পদার্থ নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকলে ক্ষত সাড়ে না। কাজেই আরোগ্যলাভের জন্য নিষ্কাশন সুবিধা নিশ্চিত করা আবশ্যিক।
- ◆ **সাধারণ চিকিৎসা (General Treatment)** : ক্ষতস্থান তাড়াতাড়ি সেরে ওঠার জন্য অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ আবশ্যিক। বিভিন্ন শ্রেণীর অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা যায়। এদের মধ্যে পেনিসিলিন, অক্সিটেট্রাসাইক্লিন, ক্লোরটেট্রাসাইক্লিন উল্লেখযোগ্য।
- ◆ এছাড়া অতিরিক্ত রক্তপাত হলে শিরায় স্যালাইন প্রয়োগ করতে হতে পারে।

২. অভ্যন্তরীণ ক্ষত (Closed Wound)

অভ্যন্তরীণ ক্ষত তিনি প্রকার।
যথা— প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাত্রার ক্ষত।

কোনো ভোঁতা জিনিস গ্লারা আঘাতের ফলে যদি ত্বক অক্ষত থকে এবং ত্বকের নিচের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে তাকে অভ্যন্তরীণ ক্ষত বলে। এরপ ক্ষতকে প্রধানত তিনি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা—

ক. প্রথম মাত্রার ক্ষত (First Degree Wound) : এক্ষেত্রে আঘাতপ্রাপ্ত স্থানের কৈশিকনালি জখম হয় এবং কলাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবিন্দু দৃশ্যমান হয়। এতে মৃদু প্রদাহ ও সামান্য ব্যথা অনুভূত হয়। এ ধরনের ক্ষত আপনাআপনি সেরে যায়। তবে, ক্ষতস্থানে তাৎক্ষণিকভাবে ঠান্ডা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

খ. দ্বিতীয় মাত্রার ক্ষত (Second Degree Wound) : এক্ষেত্রে ত্বকের নিচের অপেক্ষাকৃত বড় রক্তনালিতে ক্ষত হয় এবং ক্ষতস্থান থেকে নিঃস্ত রক্ত ত্বকের নিচে জমাট বেঁধে স্ফীত হয়। একে হিমাটোমা (Haematoma) বলে। এ জাতীয় ক্ষতে তীব্র প্রদাহ ও বেদনা অনুভূত হয়। আঘাতপ্রাপ্তির

হিমাটোমা পুরাতন হলে
অঙ্গোপচারের মাধ্যমে জমাট
বাঁধা রক্ত সরিয়ে ফেলতে হয়।

তৃতীয় মাত্রার ক্ষতে গ্যাংগ্রিন
বা পচন দেখা দিতে পারে।

ক্ষতের জটিলতার মধ্যে
রক্তপাত, শক, জ্বর, টিটেনাস,
গ্যাংগ্রিন প্রভৃতি হতে পারে।

সঙ্গে সঙ্গে উক্ত স্থানে ঠাণ্ডা প্রয়োগ করলে স্থানীয় রক্তনালিসমূহ সংকুচিত হয় এবং রক্তপাত কম হয়। এছাড়া ক্ষীত অংশ মর্দন করলে উপকার পাওয়া যায়। হিমাটোমা পুরাতন হলে অঙ্গোপচারের মাধ্যমে জমাট বাঁধা রক্ত সরিয়ে ফেলতে হয়। এর সাথে সৃষ্টি গহরে টিক্ষচার আয়োডিনমিশ্রিত গজ ঘারা ড্রেসিং করতে হয়। একদিন পরপর একসঙ্গাত অনুরূপভাবে ড্রেসিং করলে ক্ষতস্থান সম্পূর্ণ নিরাময় হয়। অঙ্গোপচারের পর ৪/৫ দিন অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করতে হয়।

গ. তৃতীয় মাত্রার ক্ষত (Third Degree Contusion) : এক্ষেত্রে আঘাতপ্রাণ্তি স্থানের বড় বড় রক্তনালি, মাঝু, পেশি প্রভৃতি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ফলশ্রুতিতে গ্যাংগ্রিন বা পচন দেখা দিতে পারে। আঘাতপ্রাণ্তি স্থানে জীবাণুবাশক প্রয়োগ করতে হবে। এছাড়া উক্ত স্থানে আর্দ্র তাপ প্রয়োগ করে রক্ত সঞ্চালন বাড়াতে হবে। এতে গ্যাংগ্রিন সৃষ্টির সম্ভাবনা কমে যায়।

ক্ষতের জটিলতা (Wound Complications)

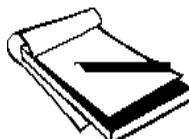
ক্ষতের বিভিন্ন জটিলতা রয়েছে। নিচে প্রধান কয়েকটি জটিলতা উল্লেখ করা হয়েছে। যথা—

ক. রক্তপাত (Haemorrhage) : রক্তপাত ক্ষতের একটা প্রধান জটিলতা। অধিক রক্তপাত হলে পশু রক্তশূন্যতার শিকার হতে পারে। কাজেই ক্ষতস্থান থেকে রক্তপাত হলে তা অন্তিবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। আঙুলের চাপ (Digital Compression), মন্ত্রার চাপ (Forcippressure), রক্তনালি বাঁধা (Ligation), রক্তপাত বন্ধকারী রাসায়নিক, যেমন— টিক্ষচার ফেরিপারক্লোরাইড প্রয়োগ করে রক্তপাত বন্ধ করা যায়। এছাড়া ক্ষতস্থানে গরম ছাঁকের মাধ্যমেও (Thermocautery) রক্ত বন্ধ হয়। অতিরিক্ত রক্তপাত হলে পশু অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। এ অবস্থায় হৃৎপিণ্ডসহ শরীরের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দেহস্তোষের কর্মকাণ্ড মান্দাক পর্যায়ে হ্রাস পায়। এ অবস্থাকে শক (Shock) বলে। শিরায় রক্ত ও স্যালাইন প্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

খ. আঘাতজনিত জ্বর (Traumatic Fever) : ক্ষতস্থানে জীবাণু সংক্রমণ হলে একপ্রকার বিষাক্ত পদার্থ (Toxin) তৈরি হয়। এ বিষাক্ত পদার্থ ক্ষতস্থান থেকে রক্ত প্রবাহে শোষিত হলে শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। অ্যান্টিবায়োটিক ও সালফারজাতীয় ঔষুধ প্রয়োগ করলে এ জ্বর সেরে যায়।

গ. টিটেনাস (Tetanus) : ক্ষতস্থান *Clostridium tetani* (ক্লোস্ট্রিডিয়াম টেটানি) জীবাণু ঘারা আক্রান্ত হলে এ রোগ হতে পারে। সকল প্রজাতির পশুতেই টিটেনাস হতে পারে, তবে ঘোড়া ও ছাগলভেড়াতে এ রোগের প্রকোপ বেশি। এ রোগের লক্ষণ একবার দেখা দিলে আরোগ্যলাভ অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। কাজেই এ রোগ নিরাময়ের চেয়ে প্রতিরোধ করা শ্রেণি। ক্ষত সৃষ্টির পরপরই টিটেনাস টক্সিমেড (Tetanus Toxoid) ইনজেকশন প্রয়োগে এ রোগ সহজেই প্রতিরোধ করা যায়।

অনুশীলন (Activity) : আপনার এলাকার গবাদিপঙ্ক্রতে কী কী প্রকার ক্ষত পাওয়া যায়? বৈশিষ্ট্যসহ লিখুন।



সারমর্ম : ক্ষত প্রধানত দুপ্রকার। যেমন— উন্মুক্ত ও অভ্যন্তরীণ। উন্মুক্ত ক্ষত সাত প্রকার ও অভ্যন্তরীণ ক্ষত তিন প্রকার। আগুন, রশ্মি, রাসায়নিক পদার্থ, দুর্ঘটনা, আঘাত প্রভৃতি কারণে এসব ক্ষত সৃষ্টি হয়। উন্মুক্ত ক্ষতের মধ্যে ছেঁদন, ছেঁড়া ও পুঁজিমারী ক্ষত বেশি সংঘটিত হয়। রক্তপাত, বেদনা, পুঁজি ইত্যাদি ক্ষতের প্রধান লক্ষণ। ক্ষতের পরিণতি জীবাণু সংক্রমণে ওপর নির্ভর করে। সংক্রমণমুক্ত ক্ষত সহজেই নিরাময় হয়। পক্ষান্তরে, সংক্রমিত ক্ষতে অনেক সময় জটিলতা দেখা দেয়। অভ্যন্তরীণ ক্ষতের ২য় মাত্রায় হিমাটোমা এবং তৃতীয় মাত্রায় গ্যাংগ্রিন হতে পারে। ক্ষতের জটিলতাসমূহের মধ্যে রক্তপাত, জ্বর, টিটেনাস, গ্যাংগ্রিন প্রভৃতি প্রধান। ক্ষত দীর্ঘস্থায়ী হলে খাদ্য গ্রহণ করে যায় এবং দৈহিক ওজনহ্রাস পেতে পারে।



পাঠোভর মূল্যায়ন ৬.৫

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

- ক. ছেদন ক্ষত কখন তৈরি হয়?
- i) লাঠি গুরা আঘাত করলে
 - ii) শরীরে পেরেক ঢুকলে
 - iii) দুর্ঘটনা হলে
 - iv) ছুরি গুরা আঘাত করলে

খ. ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ প্রয়োগ করা হয় কেন?

- i) বেদনা নিরসনের জন্য
- ii) সংক্রমণ রোধের জন্য
- iii) শোভাবৃদ্ধির জন্য
- iv) মনস্তাত্ত্বিক কারণে

২। সত্য হলে ‘স’ এবং মিথ্যা হলে ‘মি’ লিখুন।

- ক. ক্ষারক পদার্থ ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে।
খ. প্রথম মাত্রার অভ্যন্তরীণ ক্ষত আপনাআপনি সেরে যায়।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

- ক. ক্ষতের পরিণতি _____ সংক্রমণের ওপর নির্ভরশীল।
খ. ভোঁতা জিনিমের আঘাতে _____ ক্ষত সৃষ্টি হয়।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

- ক. সুচাকৃতির জিনিস কী ক্ষত সৃষ্টি করে?
খ. কোন্ মাত্রার ক্ষতে হিমাটোমা পাওয়া যায়?

পাঠ ৬.৬ গবাদিপশুর দাদ ও অন্যান্য চর্মরোগ



এ পাঠ শেষে আপনি –

- গবাদিপশুর দাদের কারণ, লক্ষণ, রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সমস্কে বলতে ও লিখতে পারবেন।
- গবাদিপশুর একজিমা, তৃক পুরু হওয়া, চর্মপ্রদাহ, চুলকানি, ইমপেটিগো, আর্টিকেরিয়া, মেনজ ও আলসার সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- তৃকের স্থিতিস্থাপকতা, ম্যাকুল, প্যাপুল, ভেসিক্যাল ও পাসচুল কী তা বর্ণনা করতে পারবেন।



দাদ ফাংগাসজনিত সংক্রামক রোগ। এ রোগের ফলে লোম পড়ে যায় ও উপরে ছালট পড়ে।



দাদ (Ringworm)

কয়েক প্রজাতির ছত্রাক বা ফাংগাস (Fungus) গুরা দাদ সৃষ্টি হয়। দাদ প্রধানত গোলাকৃতির দেখায় বলে একে রিংওয়ার্ম বলে। *Trichophyton verrucosum* (ট্রাইকোফাইটন ভেরংকোসাম) গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়াতে এবং *Microsporum canis* (মাইক্রোস্পোরাম কেনিস) কুকুরবিড়ালে এ রোগ সৃষ্টি করে। সব প্রজাতির পশুতেই এ রোগ হতে পারে। তবে, গরু, ঘোড়া এবং কুকুরবিড়ালে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি। দাদ সারাবছরই হতে পারে। তবে, শীতকালে এ রোগ বেশি দেখা যায়। সাধারণত ঘাড়, মাথা, কান ও মলগ্লারের চারপাশে এ রোগ বেশি হয়। কখনও কখনও সারা শরীরেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। ক্ষতস্থান অনেকটা ধূসুর সাদা ও গোলাকার দেখায়। চামড়ার গভীর অংশ আক্রান্ত হলে প্রদাহ ও পুঁজ হতে পারে। লোম পড়ে যায় ও উপরে পুরু 'ছালট' পড়ে। গরুতে চোখের চারপাশে, কান, মাজেল (উপরের ঠোঁট) ও ঘাড়ে দাদ বেশি দেখা যায়। বাচ্চুরে এ রোগ বেশি হয়।



চিত্র ৫৫ : দাদে আক্রান্ত বাচ্চুর

ঘোড়াতে এ রোগ প্রথমে বুক, পেট, পিছনের অংশ এবং পরবর্তীতে ঘাড়, মাথা ও বাহ্যতে হয়। আক্রান্ত স্থানের লোম পড়ে যায় এবং উপরে পুরু ছালট পড়ে। ঘোড়ার দাদ সৃষ্টিকারী ফাংগাসের নাম *Trichophyton equinum* (ট্রাইকোফাইটন ইকুইনাম)।

কুকুরবিড়ালে দাদ প্রধানত মাথা ও সামনের পায়ে হয়। ক্ষতস্থানের লোম পড়ে যায় এবং উপরে পুরু ছালট পড়ে।

দাদ অত্যন্ত সংক্রামক রোগ। এ রোগ এক পশু থেকে অন্য পশুতে এবং পশু থেকে মানুষে স্পর্শের মাধ্যমে সহজেই সংক্রমিত হয়। গ্রামে প্রায় ৮০% দাদ পশু থেকে মানুষে সংক্রমিত হয়।

লক্ষণ দেখে দাদ নির্ণয় করা যায়। তবে চূড়ান্তভাবে নির্ণয়ের জন্য নমুনা পরীক্ষা প্রয়োজন। ক্ষতস্থানের স্ক্র্যাপিং (Scraping) ও লোম অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করে এ রোগ নির্ণয় করা যায়। সংগৃহীত নমুনা একটি কাঁচের পাইডে রাখা হয়। এতে কয়েক ফোটা ১০% পটাশিয়াম হাইড্রোকাইট (KOH) মিশানো হয়। এরপর উপরে একটা কভার পিপ দিয়ে কয়েক ঘন্টা রেখে দেয়া হয়। পরবর্তীতে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করে এ রোগ নির্ণয় করা হয়।

ক্ষতস্থান থেকে সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষা করে দাদ নির্ণয় করা যায়।

দাদ চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন ওষুধ রয়েছে। প্রথমে ক্ষতস্থান ভালোভাবে ত্বাশ করে নিতে হবে যেন উপরের সমস্ত ‘ছালট’ পরিষ্কার হয়ে যায়। ক্ষতস্থানে নিম্নলিখিত ওষুধগুলো লাগানো যেতে পারে। যথা—

- ◆ হাইটফিল্ড মলম।
- ◆ ১০% অ্যামোনিয়েটেড মারকারি মলম।
- ◆ কোয়ার্টারনারি অ্যামোনিয়াম কম্পাউন্ড।
- ◆ নেটোমাইসিন।

পশ্চতে দাদ নিয়ন্ত্রণ করা বেশ কঠিন।

স্থানীয়ভাবে ওষুধ প্রয়োগের পাশাপাশি দাদের বিস্তৃতি বেশি হলে পশুর শিরায় ১০% সোডিয়াম আয়োডাইড ইনজেকশন দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়। পশ্চতে দাদ নিয়ন্ত্রণ করা বেশ কঠিন। তবে নিচের পদ্ধতিগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে। যথা—

- ◆ আক্রান্ত পশু থেকে যেন অন্য পশ্চতে সংক্রমিত হতে না পারে সেজন্য আলাদা করে রাখতে হবে।
- ◆ আক্রান্ত পশুর ঘর কার্বলিক অ্যাসিড অথবা সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট দ্রবণ গ্লারা নিয়মিত স্প্রে করতে হবে। ফরমালিডাইড এবং সোডিয়াম হাইড্রোক্লাইডও একাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ◆ খামারের সকল গরুকে একই দ্রবণ গ্লারা সঞ্চাহে দুবার স্প্রে করতে হবে।

একজিমা (Eczema)

তুকের অ্যালার্জি সৃষ্টিকারী কোনো পদার্থের সংস্পর্শে আসলে প্রদাহজনিত কারণে একজিমা হয়। এতে তুকে প্রথমে ফোক্সা হয় এবং পরে তা পেকে পুঁজ হয়। আক্রান্ত স্থান লাল ও আর্দ্র হয় এবং চুলকায়। গরুবাচ্চুর ও ছাগলভেড়ায় এ রোগের আক্রমণ কম হয়। তবে, কুকুরবিড়ালে এ রোগ বেশি দেখা যায়। একজিমা থেকে প্রচুর কষানি নির্গত হয় এবং তা পরে শুকিয়ে উপরে ছালট তৈরি করে। আক্রান্ত স্থান ধীরে ধীরে লোমশূন্য হয়ে পড়ে। কুকুরের পিঠ ও লেজের গোড়ায় এ রোগ বেশি দেখা যায়।

কতিপয় বিষক্রিয়া এবং ভিটামিন এ স্বল্পতার কারণে তুক পুরু হতে পারে।

তুক পুরু হওয়া (Hyperkeratosis)

গরুতে এ রোগ বেশি দেখা যায়। আর্সেনিক, ন্যাপথালিন, ক্রিয়োজল প্রভৃতি বিষক্রিয়া হলে এ রোগ হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে ভিটামিন এ শরীরে ব্যবহৃত হতে না পারার কারণে তুক পুরু হয়ে যায়। এছাড়া আক্রান্ত স্থানের তুক শুক হয় ও উপরে খোসা পড়ে। এরূপ তুক প্রায়ই ফেটে যায়। শরীরের সামনের দিকে, বিশেষ করে ঘাড়ের দুপাশের তুকের, এ অবস্থা বেশি দেখা যায়। আক্রান্ত স্থানের লোম পড়ে যায় এবং তুক কুঁচকে যায়। স্যালিসাইলিক অ্যাসিড গ্লারা তৈরি মলম ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

চর্মপ্রদাহ (Dermatitis)

এটি সাধারণত বিভিন্ন রোগজীবাণু, যেমন— ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছ্বাক, পরজীবী (মেনজ মাইট) এ তীব্র সূর্যরশ্মি ও ঠান্ডা, আগুন ও তরল গরম পদার্থ; জ্বালা সৃষ্টিকারী রাসায়নিক পদার্থ, যেমন—আর্সেনিক; আঘাত; অ্যালার্জি প্রভৃতি কারণে হয়ে থাকে। ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের অভাব হলেও চর্মপ্রদাহ হতে পারে। এটি মৃদু এবং তীব্র উভয় প্রকারেরই হতে পারে। আক্রান্ত তুক লাল হয়ে যায় এবং বেদনা ও চুলকানি দেখা দেয়। চুলকানির ফলে তুক থেকে কষানি বা রস বেরোয়। এ অবস্থায় ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ হলে পুঁজ হয়। কোনো জটিলতা না হলে চর্মপ্রদাহ আপনাআপনি সেরে যায়। তবে, প্রদাহ ও চুলকানি দমনকারী ওষুধ প্রয়োগ করলে সহজেই নিরাময় হয়।

চুলকানি (Pruritis)

এটি খুব সাধারণ ও ব্যাপকভিত্তিক চর্মরোগ। পশুর চুলকানি হলে স্থির থাকতে পারে না। কোনো গাছ বা সুবিধাজনক অন্য কোনো জিনিসের সাথে ঘষাঘষি করে। এতে ত্বকের বহিরাবরণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ক্ষত ত্বকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে বেদনা অনুভূত হয়। বিভিন্ন কারণে চুলকানি হতে পারে। ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক, পরজীবী প্রভৃতির আক্রমণ এবং অ্যালার্জির কারণে চুলকানি হয়। গরু, মহিষ, মোড়া, তেড়া, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি প্রাণীতে পরজীবী, বিশেষ করে মেনজ মাইটের আক্রমণে, চুলকানি বেশি দেখা দেয়। গরুমহিষে কুঁজে ঘা হলে প্রচন্ড চুলকানি দেখা দেয়। এটিও পরজীবীজনিত রোগ।

ইমপেটিগো (Impetigo)

ব্যাকটেরিয়া, সংক্রমণে
ইমপেটিগো রোগ বেশি হয়।

এ রোগে ত্বকে প্রথমে ফোক্সা পড়ে। এ ফোক্সাতে পরবর্তীতে পুঁজ হয়। পরে এটি ফেটে পুঁজ বের হয় এবং উপরে ছালট পড়ে। ব্যাকটেরিয়া, বিশেষ করে *Staphylococcus* (স্ট্যাফাইলোক্লাস), সংক্রমণে এ রোগ বেশি হয়। ইমপেটিগো শরীরের লোমবিহীন স্থানে, বিশেষ করে গাড়ীর ওলানে, বেশি দেখা যায়। এ রোগ সাধারণত সংক্রামক এবং এক পশু থেকে অন্য পশুতে স্পর্শের মাধ্যমে সহজেই সংক্রমিত হতে পারে। এসব ক্ষত সচরাচর এক সঞ্চাহের মধ্যে সেড়ে যায়। তবে, একইসাথে শরীরের অন্যান্য স্থানে নতুন করে দেখা দিতে পারে।

আর্টিকেরিয়া (Urticaria)

পশুর চামড়াতে অ্যালার্জিক প্রতিক্রিয়ার ফলে অনেক সময় চাকচাক ফুলে যায়। এটি সাধারণত ঘোড়াতে বেশি দেখা যায়। কীটপতঙ্গের হল, বিষাক্ত গাছের স্পর্শ, অ্যালার্জিক খাবার গ্রহণ, রাসায়নিক পদার্থ, যেমন— কার্বন-ডাই-সালফাইড শরীরে লাগলে এ রোগ হতে পারে। এসব কারণে কয়েক মিনিট বা ঘন্টার মধ্যে শরীরে আর্টিকেরিয়ার লক্ষণ দেখা দিতে পারে। আবার কয়েক ঘন্টা বা কয়েকদিনের মধ্যে এগুলো এমনিতেই সেড়ে যায়। অ্যান্টিঅ্যালার্জিক ওষুধ, যেমন— অ্যান্টিহিস্টামিন প্রয়োগে এ রোগ তাড়াতাড়ি আরোগ্য হয়।

মেনজ (Mange)

মাইট প্লারা আক্রান্ত রোগকে
মেনজ বলে।

মাইট একজাতীয় বাহ্যিক পরজীবী। এটি আট পাবিশিট একধরনের ক্ষুদ্র কীট যা বিভিন্ন পশুর ত্বক আক্রমণ করে। বিভিন্ন পশুর বিভিন্ন স্থানে মাইট আক্রমণ করে। গরু ও ঘোড়াতে ঘাড়, মাথা ও লেজে; কুকুরের মুখ, কান, লেজ ও উরুতে; ছাগলের মাথা ও কানে এ রোগ বেশি দেখা যায়। মাইট প্লারা আক্রান্ত রোগকে মেনজ বলে। মেনজ হলে আক্রান্ত স্থানের লোম পড়ে যায়। অস্থির কারণে পশুর খাওয়া কমে যায় এবং ক্রমাগ্রামে দুর্বল হয়ে পড়ে।



চিত্র ৫৬ : মেনজ রোগে আক্রান্ত ছাগল

মাইট ছাড়াও অন্যান্য বাহ্যিক পরজীবী, যেমন— আটালি, উকুন, কুকুরে মাছি বা ফ্লি (Flea) প্রভৃতি বিভিন্ন চর্মরোগ সৃষ্টি করে।

আলসার (Ulcer)

চামড়াতে আঘাত ও প্রদাহের কারণে স্থানীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে আলসার দেখা দেয়।

উপরে বর্ণিত ত্বকের বিভিন্ন রোগ ছাড়াও আরো কিছু বিষয় রয়েছে যা নিচে উল্লেখ করা হয়েছে।

ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা (Skin Elasticity)

স্বাস্থ্যবান পশুর ত্বক সাধারণত স্থিতিস্থাপক বা নমনীয় হয়।

স্বাস্থ্যবান পশুর ত্বকের একটি অংশ টান দিয়ে ছেড়ে দিলে ত্বকের অবস্থা যদি স্বাভাবিক থাকে, তাহলে তৎক্ষণাত পূর্বাবস্থায় লেগ যায়। পক্ষান্তরে, ত্বকের নমনীয়তা বিনষ্ট হলে পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে বিলম্ব হয়। একজিমা, মেনজ, পুষ্টিহীনতা, যক্ষা, জোনস ডিজিজ (Johne's Disease), সালমোনেলোসিস (Salmonellosis), কাউ স্কাউর (Calf Scour), ডায়াবেটিস প্রভৃতি রোগে ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা ক্ষুণ্ণ হয়।

ম্যাকুল (Macule)

পোকামাকড়ের কামড়ে ত্বকের অভ্যন্তরে রক্তপাত হলে তাকে ম্যাকুল বলে।

প্যাপুল (Papule)

শরীরের কোনো স্থানে মটর দানার মতো সৃষ্টি হলে তাকে প্যাপুল বলে। মটরদানা থেকে আর একটু বড় হলে তাকে নোডিউল (Nodule) বলে।

ভেসিক্যাল (Vesicle)

ত্বকের উপর কোনো ফোক্ষা পড়লে তাকে ভেসিক্যাল বলে। এ ফোক্ষাতে সাধারণত সিরাস ফ্লুইড (Serous Fluid) থাকে।

পাসচুল (Pastule)

ফোক্ষাতে সিরাস ফ্লুইডের পরিবর্তে পুঁজ থাকলে তাকে পাসচুল বলে।

অনুশীলন (Activity) : পশুর ত্বকের বিভিন্ন রোগাবস্থা সম্পর্কে একটি রচনা লিখুন।



সারমর্ম : পশুর দাদ একটি ছত্রাকজনিত সংক্রামক চর্মরোগ। গরু, মহিষ, ছাগল, মোড়া, কুকুর, বিড়ালে এ রোগ বেশি দেখা যায়। ক্ষতস্থান গোলাকৃতি হয়, লোম পড়ে যায় ও উপরে ‘ছালট’ পড়ে। লক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে দাদ শগান্ত করা যায়। তবে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয়ের জন্য নমুনা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। প্রচলিত চিকিৎসায় দাদ সাধারণত সেড়ে যায়। দাদ ছাড়া ত্বকের অন্যান্য অনেক রোগ রয়েছে। এদের মধ্যে একজিমা, ত্বকের পুরাত্ত, চর্মপ্রদাহ, চুলকানি, ইমপেটিগো, আর্টিকেরিয়া, মেনজ, আলসার প্রভৃতি অন্যতম। এসব চর্মরোগের কারণে পশুর জীবনহালী ঘটে না। তবে, অস্থিতির কারণে খাদ্য গ্রহণ করে গেলে দৈহিক ওজন ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে পারে। চর্মরোগ সঠিকভাবে শগান্তকরণপূর্বক কার্যকর চিকিৎসা প্রদান করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পশু আরোগ্য লাভ করে।



পাঠোভৰ মূল্যায়ন ৬.৬

১। সঠিক উত্তৰের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. দাদ হলে ক্ষতস্থানের আকৃতি কেমন হয়?

- i) ডিষ্টাকৃতি
- ii) গোলাকৃতি
- iii) রেখাকৃতি
- iv) অর্ধচন্দ্রাকৃতি

খ. একজিমা কেমন রোগ?

- i) ব্যাকটেরিয়াজনিত
- ii) ভাইরাসজনিত
- iii) ছ্বাকজনিত
- iv) অ্যালার্জিক

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. দাদ এক প্রকার ছ্বাকজনিত রোগ।

খ. আটালি গ্লারা আক্রান্ত রোগকে মেনজ বলে।

৩। শূন্যস্থান পূরণ কৰুন।

ক. গুরুতে দাদ সৃষ্টিকারী জীবাণুর নাম _____ *verrucosum*।

খ. মাইট একজাতীয় বাহ্যিক _____।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. কোন্ ভিটামিনের অভাবে চর্মরোগ হতে পারে?

খ. কোন্ চর্মরোগে ক্ষতস্থানের প্রান্তদেশ উঁচু থাকে?

ব্যবহারিক

পাঠ ৬.৭ পেটফাঁপা রোগে আক্রান্ত পশুকে নিজ হাতে ওষুধ খাওয়ানো

এ পাঠ শেষে আপনি –

- পেটফাঁপা রোগে আক্রান্ত পশুকে নিজ হাতে ওষুধ খাওয়াতে পারবেন।
- ওষুধ খাওয়ানোর সময় সার্বিকভাবে সাবধানতা অবলম্বন করতে পারবেন।



প্রাসঙ্গিক তথ্য

গবাদিপন্থৰ রোগব্যাধি চিকিৎসার জন্য সাঠিক মাত্রায় ওষুধ খাওয়ানো গুরুত্বপূর্ণ। ওষুধ খাওয়ানোর সময় মুখ থেকে নির্ধারিত মাত্রার কোনো একটি অংশ পড়ে গেলে ওষুধের কান্তি কার্যকারিতা ব্যতৃত হতে পারে। সে কারণে নিজ হাতে ওষুধ খাওয়ানোর প্রযুক্তিগত কৌশল জানা আবশ্যিক।

ওষুধ খাওয়ানোর কৌশল

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. পেটফাঁপা রোগে আক্রান্ত একটি পশু।
২. যন্ত্রপাতি ও ওষুধপত্র—
 - ক. ড্রেনিং বোতল (Drenching Bottle)— ১টি অথবা
 - খ. স্টমাক টিউব (Stomach Tube)— ১টি।
 - গ. ফানেল— ১টি।
 - ঘ. মাউথ গ্যাগ (Mouth Gag)— ১টি।
 - ঙ. তিসির তেল— আধা লিটার।
 - চ. তারপিন তেল— ৩০ মি.লি।
 - ছ. ফরমালিন— ১৫ মি.লি।
৩. ব্যবহারিক খাতা, পেসিল, কলম, রাবার, সার্পনার, ক্ষেল ইত্যাদি।

অসুস্থ পশুকে তরল ওষুধ খাওয়ানোর জন্য ড্রেনিং বোতল অথবা স্টমাক টিউব ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এখানে দুটো পদ্ধতিই উল্লেখ করা হয়েছে।

১. ড্রেনিং বোতল পদ্ধতি



চিত্র ৫৭ : ড্রেনিং বোতলের সাহায্যে ওষুধ খাওয়ানো

কাজের ধারা

- ◆ প্রথমে পশুর মাথা একটু উঁচু করে শক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করুন। প্রয়োজনে একজন সহকারীর সাহায্য নিন।
- ◆ ড্রেসিং বোতলে ওষুধ নিন এবং বোতলের মাথা পশুর মুখের এক কোণে ঢুকিয়ে দিন।
- ◆ বোতলের ওষুধ ক্রমান্বয়ে মুখের মধ্যে ঢেলে দিন। এভাবে খাওয়ানো ওষুধ পশু সহজেই গলধকরণ করে।
- ◆ এবার পুরো প্রক্রিয়াটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখে টিউটরকে দেখিয়ে তাতে সই নিন।

সাবধানতা

- ◆ ড্রেসিং বোতল শক্ত প্লাস্টিকের তৈরি হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাঁচের তৈরি বোতল ব্যাবহার করলে অনেক সময় ভেঙ্গে গিয়ে পশুর মুখে ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে।
- ◆ ওষুধ খাওয়ানোর সময় পশু কাশি বা হাঁচি দিলে অথবা অস্থির মনে হলে ওষুধ খাওয়ানো তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করতে হবে এবং পশুর মাথা নিচু করতে হবে। ওষুধ শ্বাসনালিতে প্রবেশের উপক্রম হলে পশু এজাতীয় লক্ষণ প্রকাশ করে। এসব ক্ষেত্রে ড্রেসিং বোতলের পরিবর্তে স্টমাক টিউবের সাহায্যে ওষুধ খাওয়ানো উচিত।

২. স্টমাক টিউব পদ্ধতি



চিত্র ৫৮ : স্টমাক টিউবের সাহায্যে পশুকে ওষুধ খাওয়ানো

কাজের ধারা

- ◆ প্রথমে পশুর মাথা শক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করুন।
- ◆ রাবার অথবা প্লাস্টিকের তৈরি ১.৫-৩.০ সেন্টিমিটার ব্যাসবিশিষ্ট একটি স্টমাক টিউব নিন।
- ◆ পশুর মুখে একটি মাউথ গ্যাগ ব্যবহার করুন। প্রয়োজনের এক বা একাধিক সহকারীর সাহায্য নিন। মাউথ গ্যাগ ব্যবহার করলে পশু স্টমাক টিউব চিবিয়ে নষ্ট করতে পারে না।
- ◆ স্টমাক টিউব নাক দিয়েও ঢুকানো যেতে পারে। তবে, এক্ষেত্রে স্টমাক টিউব অপেক্ষাকৃত নরম রাবার ফ্লারা তৈরি হতে হবে এবং ব্যাস ১.১-১.১৭ সেন্টিমিটারের মধ্যে হতে হবে।
- ◆ মুখ অথবা নাক দিয়ে ঢুকানোর পর টিউবের প্রান্ত ফ্যারিংসে (Pharynx) প্রবেশের সাথে সাথে পশু ঢোক গিলতে থাকে। ফলে টিউব সহজেই অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। পশু কোনো কাশি না দিলে টিউবের প্রান্ত অন্ধনালিতে প্রবেশ করেছে বলে ধরে নেয়া যায়। এ পর্যায়ে টিউবটি ক্রমান্বয়ে রুমেনের ভিতর ঢুকিয়ে দিন।

- ◆ টিউবের মুক্ত প্রান্ত নাকের কাছে ধরণ এবং রংমেন গ্যাস নির্গমণ পরীক্ষা করুন।
- ◆ রংমেন গ্যাস বিতাড়িত হওয়ার পর টিউবের বাহ্যিক প্রান্তে একটি ফানেল সংযুক্ত করুন।
- ◆ এবার পেট ফাঁপার ওষুধ ফানেলের মধ্যে ঢেলে দিন এবং ফানেলসহ টিউবের প্রান্ত যথাসম্ভব উঁচুতে ধরুন। এ অবস্থায় মধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে ওষুধ সহজেই রংমেনে প্রবেশ করবে।
- ◆ ওষুধ প্রয়োগ শেষে পুরু প্রক্রিয়াটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখুন ও মূল্যায়নের জন্য টিউটরকে দেখান ও তাতে সই নিন।

সাবধানতা

- ◆ টিউব প্রবেশকালে পশুর মাথা অতিরিক্ত উঁচু বা নিচু করলে ঘাড় বেঁকে যায় এবং টিউবের অগ্রযাত্রা বাধাগ্রস্থ হয়।
- ◆ দুর্ঘটনাবশত টিউবের প্রান্ত শ্বাসনালিতে প্রবেশ করলে পশু কাশি দেয়, অস্থিরতা দেখায় এবং জিহ্বা বেরিয়ে আসতে পারে। এসব ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে টিউব বের করে ফেলতে হবে এবং বিকল্প পদ্ধতিতে ওষুধ রংমেনে প্রবেশ করাতে হবে। ট্রিকার ও ক্যানুলা যত্র ব্যবহার করে পেটফাঁপা পশুর রংমেনে সহজেই ওষুধ প্রবেশ করানো যায়।

ব্যবহারিক

পাঠ ৬.৮ কুঁজে ঘায়ের চিকিৎসার জন্য একটি মলম তৈরি করে ঘায়ের চিকিৎসা করা



এ পাঠ শেষে আপনি –

- কুঁজে ঘায়ের মলম নিজ হাতে তৈরি করতে পারবেন।
- তৈরিকৃত মলম কুঁজে ঘায়ের চিকিৎসায় ব্যবহার করতে পারবেন।



প্রাসঙ্গিক তথ্য

নেগুভন, সালফানিলামাইড ও জিংক অক্সাইড সমন্বয়ে তৈরি মলম কুঁজে ঘা চিকিৎসায় অত্যন্ত ফলপ্রসূ। এ মলম তৈরির পদ্ধতি নিচে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. কুঁজে ঘায়ে আক্রান্ত একটি পশ্চ
২. যন্ত্রপাতি –
 - ক. ওজন নেয়ার নিক্ষি (Balance) – ১ টি।
 - খ. বিভিন্ন মাপের বাটখারা।
 - গ. প্যাব – ১টি।
 - ঘ. স্চেচুলা – ১টি।
৩. রাসায়নিক দ্রব্য –
 - ক. নেগুভন পাউডার – ১০ গ্রাম।
 - খ. সালফানিলামাইড পাউডার – ৫ গ্রাম।
 - গ. জিংক অক্সাইড – ৫ গ্রাম।
 - ঘ. ভ্যাসলিন – ৮০ গ্রাম।
৪. ব্যবহারিক খাতা, কলম, পেন্সিল, রাবার, সার্পনার, ক্ষেল ইত্যাদি।

কাজের ধারা

- ◆ একটি টেবিলের উপর মলম তৈরির প্যাব রাখুন।
- ◆ নিক্ষির সাহায্যে ১০ গ্রাম নেগুভন পাউডার মাপুন এবং প্যাবের উপর রাখুন।
- ◆ এবার ৫ গ্রাম সালফানিলামাইড পাউডার ও ৫ গ্রাম জিংক অক্সাইড পৃথক পৃথকভাবে নিক্ষিতে মাপুন এবং প্যাবের উপর রাখুন।
- ◆ সবশেষে ৮০ গ্রাম ভ্যাসলিন মাপুন এবং পুনরায় প্যাবে রাখুন।
- ◆ এবার স্চেচুলার সাহায্যে ভ্যাসলিনের সঙ্গে নেগুভন, সালফানিলামাইড ও জিংক অক্সাইড উত্তমরূপে মিশান। মিশণ সম্পন্ন হলে ১০০ গ্রাম প্রস্তুত হবে। এ মলম এখন কুঁজে ঘায়ে আক্রান্ত পশ্চতে ব্যবহার করা যাবে। তৈরি মলম চিকিৎসা কাজে ব্যবহারের জন্য প্লাস্টিকের কোটা বা পলিথিন প্যাকেটে সংরক্ষণ করুন।

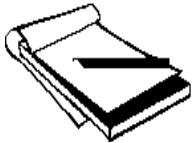
মলম প্রয়োগ পদ্ধতি –

- ◆ মলম প্রয়োগের পূর্বে ক্ষতস্থান ক্ষ্যাপিংয়ের সাহায্যে ভালোভাবে পরিষ্কার করুন।
- ◆ ঘায়ের উপর কোনো শক্ত চল্টা বা শুষ্ক আবরণী থাকলে তা সরিয়ে ফেলুন। এবার কোনো জীবাণুনাশক ঘারা ক্ষতস্থান উত্তমরূপে পরিষ্কার করুন।
- ◆ এবার একটি কাঠির সাহায্যে মলম ক্ষতস্থানে ভালোভাবে লাগিয়ে দিন।

- ◆ দিনে দুবার করে এ মলম ঘায়ে লাগান। এ চিকিৎসা অব্যাহত রাখলে ১০–৩০ দিনের মধ্যে ক্ষতস্থান আরোগ্য লাভ করবে।
- ◆ পুরো পরীক্ষণ প্রক্রিয়া ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখুন ও তা মূল্যায়নের জন্য আপনার টিউটরকে দেখিয়ে সই নিন।

সাবধানতা

- ◆ ক্ষতস্থান যথাযথভাবে ক্র্যাপিং না করে শক্ত আবরণীর উপর মলম প্রয়োগ করলে চিকিৎসা আদৌ ফলপ্রসূ হবে না।



চূড়ান্ত মূল্যায়ন - ইউনিট ৬

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন

- ১। বিষত্রিয়া কী? উদাহরণসহ বিভিন্ন প্রকার বিষের শ্রেণিবিভাগ করুন।
- ২। নাইট্রেট ও নাইট্রাইট বিষত্রিয়ার কারণ, লক্ষণ ও চিকিৎসা বর্ণনা করুন।
- ৩। পাঁচটি ক্লোরিনেটেড হাইড্রোকার্বন বিষের নাম লিখুন।
- ৪। ইউরিয়া বিষত্রিয়ার উৎস কী? এর সঠিক চিকিৎসা ও প্রতিরোধ লিখুন।
- ৫। পেটফাঁপা রোগ কী? প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পেটফাঁপা রোগের মধ্যে পার্থক্য করুন।
- ৬। উদরাময় কী? উদরাময় সৃষ্টিকারী বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়ার নাম লিখুন।
- ৭। ডায়ারিয়া সৃষ্টিকারী বিভিন্ন ভাইরাসের নাম লিখুন।
- ৮। রিভারপেস্ট রোগ কীভাবে প্রতিরোধ করবেন?
- ৯। পি.পি.আর. কোন প্রাণীতে বেশি হয়? এ রোগের লক্ষণসমূহ লিখুন।
- ১০। জোয়াল কান্দা রোগ কী? এর কারণ ও লক্ষণ বর্ণনা করুন।
- ১১। একটি পোড়া ক্ষত কীভাবে চিকিৎসা করবেন?
- ১২। বিভিন্ন প্রকার ক্ষতের বৈশিষ্ট্য লিখুন।
- ১৩। ক্ষতের জটিলতাসমূহ উল্লেখ করুন।
- ১৪। বিভিন্ন প্রকার চর্মরোগের একটি তালিকা তৈরি করুন।
- ১৫। একজিমা, আর্টিকেরিয়া ও ইমপেটিগো কী?



উত্তরমালা - ইউনিট ৬

পাঠ ৬.১

- | | | | | | |
|-----------|-------------------------------|------------|---------|---------------|------------------|
| ১। ক. ii | ১। খ. iii | ২। ক. স | ২। খ. স | ৩। ক. সংকুচিত | ৩। খ. নাইট্রেট ও |
| নাইট্রাইট | ৪। ক. হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড | বিষত্রিয়া | | ৪। খ. ইউরিয়া | বিষত্রিয়া |

পাঠ ৬.২

- | | | | | | |
|------------------------|-------------|---------|----------|-----------|----------------|
| ১। ক. i | ১। খ. iv | ২। ক. স | ২। খ. মি | ৩। ক. ৬০০ | ৩। খ. বামদিকের |
| ৮। ক. ট্রিকার-ক্যানুলা | ৪। খ. হ্যাঁ | | | | |

পাঠ ৬.৩

- | | | | | | |
|------------------|-----------------|----------|---------|------------------|----------------------|
| ১। ক. i | ১। খ. ii | ২। ক. মি | ২। খ. স | ৩। ক. ডায়ারিয়া | ৩। খ. দুর্গন্ধিযুক্ত |
| ৮। ক. ডায়ারিয়া | ৪। খ. জি.টি.ভি. | | | | |

পাঠ ৬.৪

- | | | | | | |
|----------------------------|------------------|----------|----------|--------------|------------------------------|
| ১। ক. iii | ১। খ. ii | ২। ক. মি | ২। ক. মি | ৩। ক. জোয়াল | ৩। ক. <i>Stephanofilaria</i> |
| ৮। ক. কীড়াপড়া ও কুঁজে ঘা | ৪। খ. সাবান পানি | | | | |

পাঠ ৬.৫

- | | | | | | |
|------------------|----------------|---------|---------|--------------|------------------|
| ১। ক. iv | ১। খ. ii | ২। ক. স | ২। খ. স | ৩। ক. জীবাণু | ৩। খ. অভ্যন্তরীণ |
| ৮। ক. ছিদ্র ক্ষত | ৪। খ. দ্বিতীয় | | | | |

পাঠ ৬.৬

- | | | | | | |
|----------------------------|-------------|---------|----------|---------------------------|--------------|
| ১। ক. ii | ১। খ. iv | ২। ক. স | ২। খ. মি | ৩। ক. <i>Trichophyton</i> | ৩। খ. পরজীবী |
| ৮। ক. ভিটামিন বি কমপ্লেক্স | ৪। খ. আলসার | | | | |

ইউনিট ৭
গবাদিপশুর
রোগপ্রতিরোধে টিকার
ব্যবহার

ইউনিট ৭ গবাদিপশুর রোগপ্রতিরোধে টিকার ব্যবহার

দেহে রোগজীবাণু প্রবেশ করে দেহের স্বাভাবিক কার্যকলাপ ব্যহত করে জীবাণুঘাটিত রোগের সৃষ্টি করে। দেহে প্রাণু রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা থাকলে জীবাণু রোগ সৃষ্টি করতে পারে না। এ রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা পশু দুভাবে পেয়ে থাকে। যথা— ক. প্রাকৃতিক বা অনিদিষ্ট প্রতিরোধ প্রক্রিয়া (Natural or Nonspecific Immunity) ও খ. অর্জিত বা নির্দিষ্ট রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা (Acquired or Specific Immunity)। প্রাকৃতিক বা অনিদিষ্ট প্রতিরোধ প্রক্রিয়ায় পশুর দেহের রক্তের মনোসাইট (Monocyte), নিউট্রোফিল (Neutrophil), ইউসিনোফিল (Eosinophyl) ও বেসোফিল (Basophyl); ফুসফুস, পিহা (Spleen) এবং যকৃতের ম্যাক্রোফেজ (Macrophage) ইত্যাদি রাক্তসে কোষ যে কোনো রোগজীবাণু দেহে প্রবেশ করলে তা গ্রাস করে মেরে ফেলে। নির্দিষ্ট বা অর্জিত রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থায় রক্তের লিফোসাইট (Lymphocyte) নির্দিষ্ট জীবাণুর সংস্পর্শে এলে প্রতিক্রিয়া করে এবং দ্রুত এর বিভিন্ন কার্যকরী বংশধর তৈরির মাধ্যমে অনুপ্রবেশকারীকে ধ্বংস করে শরীর থেকে নির্গমনের ব্যবস্থা করে। যখন কোনো লিফোসাইট কোনো নির্দিষ্ট জীবাণু বা তার অংশবিশেষের সংস্পর্শে আসে তখন তার বিরুদ্ধে স্পর্শকাতর (Sensitized) হয়ে থাকে। স্পর্শকাতর লিফোসাইটের পরবর্তী বংশধরেরাও নির্দিষ্ট জীবাণুর প্রতি স্পর্শকাতর হয়। লিফোসাইটের এ স্মরণশক্তিকেই রোগপ্রতিরোধ বা ওসসঁহুব ঝুঁঁবস বলে। আর এ ব্যবস্থা কাজে লাগানোকেই রোগপ্রতিরোধ বা ওসসঁহুবুধুড়হ বলা হয়। কোনো নির্দিষ্ট জীবাণু বা জীবাণুর অংশবিশেষ (Specific Antigen) নির্দিষ্ট মাত্রায় (Specific Dose) নির্দিষ্ট শক্তিতে (Live/Attenuated) দেহে প্রবেশ করিয়ে যে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করা হয় তাকে অর্জিত প্রতিরোধ (Specific Immunity বা Acquired Immunity) ব্যবস্থা বলে। এ কাজে যে জীবাণু বা জীবাণুর অংশ বা অ্যান্টিজেন (Antigen) ব্যবহার করা হয় তাকে টিকা (Vaccine) বলে। টিকাকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা— ক. জীবন্ত টিকা (Live Attenuated Vaccine) যা জীবন্ত রোগজীবাণু কিন্তু রোগ সৃষ্টি করতে অসমর্থ এবং খ. মৃত জীবাণু থেকে প্রস্তুত টিকা (Killed Vaccine)। জীবন্ত টিকাকে আদর্শ টিকা বলা হয়। কারণ, এ থেকে সৃষ্টি রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী। মৃত জীবাণু থেকে প্রস্তুত টিকাও রোগপ্রতিরোধে সক্ষম, তবে দীর্ঘস্থায়ী নয়। সময়মতো সংক্রামক রোগের টিকা প্রদান করলে গবাদিপশুকে নির্দিষ্ট রোগের ক্ষেত্রে মুক্ত রাখা যায়। টিকা প্রয়োগ করলে পশুর রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা সুসংহত হয়। খামারের গবাদিপশুকে সুস্থ রাখতে হলে সময়মতো দেশে বিদ্যমান সম্ভাব্য রোগের বিরুদ্ধে টিকা বা প্রতিষেধক প্রয়োগ করতে হবে। এতে প্রাথমিক খরচ আপাতত বেশি হলেও সামগ্রিক উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে তা থেকে ভালো মুনাফা আসবে।

এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে বিভিন্ন ধরনের টিকার সংরক্ষণ পদ্ধতি এবং পরিবহণ, বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসজনিত রোগের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত টিকার পরিচিতি ও ব্যবহার এবং বিভিন্ন প্রকার টিকা প্রয়োগ করার পদ্ধতি তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিকসহ আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ৭.১ বিভিন্ন ধরনের টিকার সংরক্ষণ পদ্ধতি ও পরিবহণ

এ পাঠ শেষে আপনি –

- বিভিন্ন ধরনের টিকার সংরক্ষণ পদ্ধতি আলোচনা করতে পারবেন।
- টিকার পরিবহণ পদ্ধতি বলতে ও লিখতে পারবেন।



টিকার সংরক্ষণ পদ্ধতি

এ দেশে চাহিদার তুলনায় টিকার উৎপাদন কিছুটা কম। উৎপাদিত টিকার প্রায় ১৮% সংরক্ষণ, পরিবহণ ও ব্যবহারের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের অভাবে অপচয় হয়। এ অপচয় রোধ করে টিকার

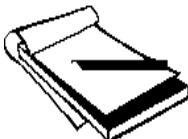
টিকার সঠিক সংরক্ষণে এর অপচয় কমিয়ে ঘাটতি মেটানো ও অর্থিক সাশ্রয় করা সম্ভব। হিমশুষ্ক টিকা 2° - 8° সে. ও তরল টিকা 4° - 8° সে. এ সংরক্ষণ করতে হয়।

যথাযথ ব্যবহার করতে ও নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে টিকা সংরক্ষণ সম্পর্কে জানতে হবে। প্রতিটি টিকার জন্য একটি নির্দিষ্ট সংরক্ষণ তাপমাত্রা আছে। ভুল সংরক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে সংরক্ষিত টিকা ব্যবহার করলে তা নির্দিষ্ট রোগের বিরুদ্ধে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে পারে না। টিকা প্রস্তুত প্রক্রিয়া অনুযায়ী টিকাবীজকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা— ক. হিমশুষ্ক (Freeze Dried) ও খ. তরল সাসপেনশন (Liquid Suspension)। সাধারণত হিমশুষ্ক টিকা 2° - 8° সে. তাপমাত্রার মধ্যে এবং তরল টিকা 4° - 8° সে. তাপমাত্রায় ব্যবহারের পূর্ব পর্যন্ত রাখতে হয়। সংরক্ষণ ও পরিবহণ করে ব্যবহার পর্যন্ত তাপমাত্রা নির্দিষ্ট রাখার ব্যবস্থাকে Cool-chain System বলে। টিকা কোমো সময়ই ডিপফ্রিজে রাখা যাবে না। রেফ্রিজারেটরে টিকা রাখার পর ফ্রিজের দরজা ঠিকমতো বন্ধ হয়েছে কি—না তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। ফ্রিজের সুইচ, সকেট, প্লাগ ঠিকমতো লাগানো আছে কি—না এবং ফ্রিজ ঠিকমতো কাজ করছে কি—না তাও পরীক্ষা করে দেখতে হবে। তড়কা, বাদলা, গলাফোলা রোগের টিকা 4° - 8° সে. এবং রিন্ডারপেস্ট টিসু কালচার টিকা (Rinderpest Tissue Culture Vaccine), শুরারোগ (Foot and Mouth Disease) ও ছাগলের বসন্ত রোগের টিকা (Goat Pox Vaccine) 2 - 8° সে. তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হয়।

পরিবহণ

যেহেতু গবাদিপশু সাধারণত গ্রামাঞ্চলে পালন করা হয় তাই টিকাবীজ পরিবহণের গুরুত্ব রোগপ্রতিরোধের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা বহন করে।

সাধারণত টিকা উৎপাদন কেন্দ্র বা বিক্রয় কেন্দ্র থেকে খামারগুলো বেশ দূরে অবস্থিত। যেহেতু পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা টিকা সংরক্ষণ তাপমাত্রার চেয়ে বেশি তাই পরিবহণকালে সংরক্ষণ তাপমাত্রা ঠিক রাখতে কুলভ্যাম, কুলবক্স বা থার্মোফ্লাক্সে বরফসহ বহন করতে হয়। এটা Chool-chain রক্ষা করার জন্য সকল টিকার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। থার্মোফ্লাক্স বা কুলবক্সের বরফ থাকতে হবে। বরফ ছাড়া বহন করা টিকা ব্যবহারে কোনো রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠে না। তাই গরু, ছাগল, ভেড়াকে এ টিকা প্রদানের পরও একই রোগে এরা আক্রান্ত হতে পারে।



অনুশীলন (Activity) ৪ টিকা সংরক্ষণের পদ্ধতিগুলোর মধ্যে আপনার মতে কোনটি ফলপ্রসূ? মতামতের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।



সারমর্ম ৪ হিমশুষ্ক টিকা 2° - 8° সে. এবং তরল টিকা 4° - 8° সে. তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হয়। রেফ্রিজারেটরে টিকা সংরক্ষণের পর সেটি ঠিকমতো চলছে কি—না তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। পরিবহণকালে থার্মোফ্লাক্স বা কুলবক্সের বরফ গলে গেলে পুনরায় বরফ ভরতে হবে। টিকা প্রয়োগের জন্য বহন করা টিকা সহনীয় তাপমাত্রায় নেয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কুলবক্স বা ফ্লাক্সে রাখতে হবে।



পাঠোভর মূল্যায়ন ৭.১

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. টিকা কী জন্য সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়?

- i) নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় রাখার জন্য
- ii) পরিবহণের জন্য
- iii) অপচয় রোধ করার জন্য
- iv) রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য

খ. টিকা পরিবহণে কুলবস্তু বা থার্মোফ্লাক্সের প্রয়োজন হয় কেন?

- i) বরফ গলায় বাধা সৃষ্টি করতে
- ii) সূর্যের তাপ থেকে রক্ষা করতে
- iii) কুল চেইন রক্ষা করতে
- iv) পরিবহণ সহজ করতে

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. কুল চেইন রক্ষা করতে ব্যাকটেরিয়াল টিকা 4° – 8° সে. তাপমাত্রায় বহন করা হয়।

খ. হিমশুষ টিকা 4° – 8° সে. তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হয়।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. স্পর্শকাতর লিফোসাইটের পরবর্তী _____ নির্দিষ্ট জীবাণুর প্রতি স্পর্শকাতর হয়।

খ. জীবস্তু টিকাকে _____ টিকা বলা হয়।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. দূরের যাত্রায় ফ্লাক্সে পুনরায় বরফ ভরতে হয় কেন?

খ. সংরক্ষণ, পরিবহণ ও এসব কাজে প্রশিক্ষণের আভাবে কত % টিকার অপচয় হয়?

পাঠ ৭.২ পশুর ব্যাকটেরিয়াল টিকার পরিচিতি ও ব্যবহার



এ পাঠ শেষে আপনি –

- ব্যাকটেরিয়াল টিকা কী তা বলতে পারবেন।
- এদেশে তৈরি গবাদিপশুর বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়াল টিকার নাম লিখতে পারবেন।
- এদেশে তৈরি গবাদিপশুর বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াল টিকার ব্যবহার বর্ণনা করতে পারবেন।



ব্যাকটেরিয়াল টিকা (Bacterial Vaccine)

নির্দিষ্ট ব্যাকটেরিয়া বা এর কোনো অংশ থেকে ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগপ্রতিরোধের জন্য যে টিকা তৈরি করা হয় তাকে ব্যাকটেরিয়াল টিকা (Bacterial Vaccine) বলে। এ টিকা প্রয়োগ করা হলে পশুর দেহে নির্দিষ্ট ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগের বিরুদ্ধে রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে উঠে। গবাদিপশুর ব্যাকটেরিয়াল টিকাগুলো এদেশের পরিবেশে প্রাপ্ত বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগপ্রতিরোধের জন্য তৈরি হয়। বর্তমানে ঢাকার মহাখালীস্থ পশুসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠানে গবাদিপশুর জন্য তড়কা (Anthrax), বাদলা (Black Quarter) ও গলাফোলা (Haemorrhagic Septicemia) রোগের প্রতিষেধক টিকা তৈরি করা হয়।

যে কোনো টিকা ব্যবহারের পূর্বে নির্দিষ্ট পশুর জন্য তার মাত্রা, প্রয়োগ স্থান, কত বয়সে প্রথম টিকা প্রয়োগ করতে হয় এবং কত দিন পরপর তা পুনঃপ্রয়োগ করা প্রয়োজন তা ভালো করে জেনে নিতে হবে। এতে টিকাদান বা ডেক্সিনেশন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব। এছাড়া প্রতিটি টিকা সঠিকভাবে সংরক্ষণ করারও প্রয়োজন হয়। তাই টিকার বোতল বা ভায়ালের গায়ে আটানো লেবেল পড়ে নির্দেশ মোতাবেক সংরক্ষণ করতে হয়।

তড়কা রোগের টিকা (Anthrax Spore Vaccine)

পশুসম্পদ অধিদপ্তরের মহাখালীস্থ পশুসম্পদ গবেষণাগারে এ টিকা তৈরি করা হয়। এ টিকা তরল এবং ১০০ মি.লি. বোতলে সরবরাহ করা হয়। গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়ার রোগপ্রতিরোধের জন্য এটি ব্যবহৃত হয়। এ টিকা চামড়ার নিচে (Subcutaneously) ইনজেকশন করে প্রয়োগ করা হয়।

মাত্রা :

প্রতিটি গরু/মহিষের জন্য— ১ মি.লি. করে।

প্রতিটি ছাগল/ভেড়ার জন্য— ০.৫ মি.লি. করে।

গবাদিপশুর ৬ মাস বয়সে প্রথম এ টিকা দিতে হয় এবং বছরে একবার প্রয়োগ করতে হয়। টিকা ৪°-৮°সে. তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হয়। টিকা ব্যবহারের পূর্বে বোতলের তরল টিকা ভালো করে ঝাঁকিয়ে নিতে হয়। টিকা প্রয়োগের পর প্রয়োগ স্থান কয়েকদিন ফুলে থাকে। টিকা দেয়ার পর পশুর দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে এবং দুংবৰ্তী পশুর দুধ উৎপাদনের পরিমাণ সাময়িকভাবে কমে যায়। এগুলো টিকার সঠিক কার্যকারিতা নির্দেশ করে।

গলাফোলা রোগের টিকা (Haemorrhagic Septicemia Vaccine)

Pasteurella multocida (পাসচুরেলা মালটুসিডা) টাইপ ১ স্ট্রেইনের ব্যাকটেরিয়া নিক্রিয় (রহিষ্পঘোষণাব্দক) করে তেল সহযোগে (Oil Adjuvant) এ টিকা প্রস্তুত করা হয়। পশুসম্পদ অধিদপ্তরের মহাখালীস্থ পশুসম্পদ গবেষণাগারে এ টিকা উৎপাদন করা হয়। ১০০ মি.লি. বোতলে এ তরল টিকা সরবরাহ করা হয়। গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়ার গলাফোলা রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রতিষেধক হিসেবে এ টিকা ব্যবহৃত হয়। প্রথমবার এ টিকা ৬ মাস বয়সের পশুকে চামড়ার নিচে ইনজেকশন হিসেবে প্রয়োগ করতে হয় এবং পরবর্তী টিকাগুলো ১ বছর পরপর দিতে হয়।

গলাফোলা টিকা গরুমহিষকে ২ মি.লি. এবং ছাগলভেড়াকে ১ মি.লি. করে ১ বছর পর পর চামড়ার নিচে ইনজেকশন করতে হয়।

মাত্রা :

প্রতিটি গরু/মহিষের জন্য— ২ মি.লি. করে।

প্রতিটি ছাগল/ভেড়ার জন্য— ১ মি.লি. করে।

টিকা 4° – 8° সে. তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হয়। ঘরের তাপমাত্রায় ৩–৫ মিনিট রেখে বোতল ভালো করে ঝাঁকিয়ে সিরিঞ্জে টিকা ভরে ইনজেকশন আকারে প্রয়োগ করতে হবে। টিকা প্রয়োগের ১–২ সপ্তাহের মধ্যে পশু রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় এবং ১ বছর পর্যন্ত তা বিদ্যমান থাকে। টিকা প্রয়োগের পর পশুর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে এবং দুর্ঘটনাতী পশুর দুধ উৎপাদনের পরিমাণ সাময়িকভাবে কমে যেতে পারে। এতে টিকা সঠিকভাবে কাজ করেছে বলে ধরে নেয়া যায়।

বাদলা রোগের টিকা (Black Quarter Vaccine)

বাদলা টিকা গরুমহিষকে ৫ মি.লি. এবং ছাগলভেড়কে ২ মি.লি. মাত্রায় চামড়ার নিচে পুশ করতে হয়।

বাদলা রোগের টিকা মৃত *Clostridium chauvoei* (ক্লস্ট্রিডিয়াম চৌভিয়াই) প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া অ্যালামে (Alum) থিতিয়ে (Precipitated) তৈরি করা হয়। মহাখালিস্থ পশুসম্পদ অধিদপ্তরের পশুসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠানে এ টিকা তৈরি করা হয়। ১০০ বা ৩০০ মাত্রার তরল টিকা বোতলের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়। তিন মাস থেকে ৩ বছর বয়সের গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়ার বাদলা রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রতিষ্ঠেধক হিসেবে এ টিকা ব্যবহৃত হয়। টিকা প্রথমবার ৬ মাস বয়সের পশুর ঘাড় বা কাঁধের ঢিলা চামড়ার নিচে ইনজেকশন আকারে দিতে হয়। প্রতি ৬ মাস পরপর টিকা প্রয়োগ করতে হয়। তবে প্রথম ডোজের ৪ সপ্তাহ পর ২য় ডোজ দিলে পরবর্তী টিকাগুলো ১ বছর পরপর দিতে হবে।

মাত্রা :

প্রতিটি গরু/মহিষের জন্য— ৫ মি.লি. করে।

প্রতিটি ছাগল/ভেড়ার জন্য— ২ মি.লি. করে।

এ টিকা 4° – 8° সে. তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হয়। ঘরের তাপমাত্রায় ৩–৫ মিনিট রেখে বোতল ভালো করে ঝাঁকিয়ে সিরিঞ্জে টিকা ভরে ইনজেকশন দিতে হবে। ব্যবহারের জন্য খোলা বোতলের টিকা ২–৩ ঘন্টার মধ্যে শেষ করতে হবে। অবশিষ্ট টিকা ফিজে রেখে আবার ব্যবহার করা যাবে না। টিকা প্রয়োগের ১–২ সপ্তাহের মধ্যে পশু রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় এবং বুস্টার ডোজ (ইডড়ংবৎ উড়ংব) দেয়ার পর ১ বছর পর্যন্ত তা বিদ্যমান থাকে। টিকা প্রয়োগের পর পশুর দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে এবং দুর্ঘটনাতী গাভীর দুধ উৎপাদনের পরিমাণ সাময়িকভাবে হ্রাস পেতে পারে। এতে টিকার সঠিক কার্যকারিতা নির্দেশিত হয়।



অনুশীলন (Activity) : ৪ গবাদিপশুর ব্যাকটেরিয়াল টিকাগুলোর প্রয়োগমাত্রা, প্রয়োগের স্থান, পদ্ধতি প্রভৃতি ছক আকারে লিখুন।



সারমর্ম : ৪ বর্তমানে গবাদিপশুর ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগের প্রতিষেধক হিসেবে তড়কা, গলাফোলা ও বাদলা রোগের টিকা পাওয়া যায়। প্রতিষেধক টিকার মাত্রা, প্রয়োগের বয়স, প্রয়োগ স্থান, কতদিন পর তা পুনরায় প্রয়োগ করতে হয় ইত্যাদি বিস্তারিত জানার পর তা নিজ হাতে প্রয়োগ করতে হয়।



পাঠোভর মূল্যায়ন ৭.২

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. ব্যাকটেরিয়াল টিকা দেয়ার কত দিন পর পশু সাধারণত রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়?

- i) ২-৫ সপ্তাহ
- ii) ১-৩ সপ্তাহ
- iii) ১-৪ সপ্তাহ
- iv) ১-২ সপ্তাহ

খ. গবাদিপশুর টিকা প্রয়োগের পরপরই সাধারণত সাময়িক শারীরিক কী পরিবর্তন হয়?

- i) চুলকানি হয়
- ii) তাপবৃদ্ধি ও দুধ উৎপাদন কমে
- iii) রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়
- iv) বাদলা রোগ প্রতিরোধ হয়

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. বাদলা রোগ প্রতিরোধের জন্য বুস্টার ডোজ দিতে হয় না।

খ. গবাদিপশুর ব্যাকটেরিয়াল টিকা সাধারণত $2^{\circ}-4^{\circ}\text{সে}.$ তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা হয়।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. নির্দিষ্ট ব্যাকেটেরিয়া বা এর কোনো অংশ থেকে ব্যাকেটেরিয়াজনিত রোগপ্রতিরোধের জন্য যে টিকা তৈরি করা হয় তাকে _____ টিকা বলে।

খ. বর্তমানে মহাখালিস্থ পশুসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠানে গবাদিপশুর জন্য তড়কা, বাদলা ও _____ রোগের প্রতিষেধক টিকা তৈরি করা হয়।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. টিকার বোতলে লেবেল দেয়া হয় কেন?

খ. গলাফোলা রোগের টিকা কোথায় দিতে হয়?

পাঠ ৭.৩ গবাদিপশুর ভাইরাল টিকার পরিচিতি ও ব্যবহার



এ পাঠ শেষে আপনি –

- ভাইরাল টিকা কী তা বলতে পারবেন।
- গবাদিপশুর বিভিন্ন ভাইরাল টিকার নাম লিখতে পারবেন।
- গবাদিপশুর বিভিন্ন ভাইরাল টিকার ব্যবহার বর্ণনা করতে পারবেন।



দেশে ভাইরাসজনিত ক্ষুরারোগ, রিভারপেস্ট ও জলাতকের টিকা প্রস্তুত করা হয়। টিকার পরিবহণ, সংরক্ষণ ও প্রয়োগ পদ্ধতির ওপর এর কার্যকারিতা নির্ভরশীল।

ভাইরাল টিকা (ঠরৎধৰ ঠধপপৱহব)

ভাইরাসজনিত রোগপ্রতিরোধের জন্য যে টিকা ব্যবহার করা হয় তাকে ভাইরাল টিকা বা (ঠরৎধৰ ঠধপপৱহব) বলা হয়। বর্তমানে দেশে গবাদিপশুর তিনটি ভাইরাস রোগের প্রতিষেধক টিকা তৈরি করা হয়। এগুলো হচ্ছে- ক. ক্ষুরারোগের টিকা (Foot and Mouth Disease Vaccine or FMD Vaccine), খ. গোবসন্ত বা রিভারপেস্ট টিকা (Rinderpest Vaccine) এবং গ. জলাতক টিকা (Rabies Vaccine)। এছাড়াও ছাগলের পি.পি.আর. (Pestdes Petits Ruminants) রোগ প্রতিরোধকল্পে রিভারপেস্ট টিস্যু কালচার ভেক্সিন (Rinderpest Tissue Culture Vaccine or TCV) ব্যবহার করা হচ্ছে। সকল ভাইরাল টিকায় জীবিত ভাইরাস বিদ্যমান তাই এসব টিকা খুব কার্যকর রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। তা সত্ত্বেও সঠিক সংরক্ষণ (Preservation), পরিবহণ (Transportation), মিশণ (Dilution), মাত্রা (Dose), প্রয়োগবিধি (Administration), প্রয়োগ স্থান (Route of Adminstration), পশ্চতে প্রয়োগের বয়স (অবস্থা) ইত্যাদির ওপর টিকার কার্যকারিতা নির্ভর করে। এ পাঠে দেশে তৈরি গবাদিপশুর ভাইরাল টিকাগুলোর পরিচিতিসহ ব্যবহারবিধি বর্ণিত হয়েছে।

ক্ষুরারোগের টিকা (FMD Vaccine)

বাংলাদেশে ক্ষুরা রোগের ভাইরাসের টাইপগুলোর মধ্যে সাধারণত ৪টি গ্লারা গবাদিপশু আক্রান্ত হয়। টাইপগুলো হচ্ছে এ, ও, সি এবং এশিয়া ১। তাই চারটি টাইপ একত্রে বা আলাদা কিংবা দুটো অথবা তিনটি টাইপের এ টিকা তৈরি করে একত্রে মিশিয়ে সরবরাহ করা হয়। একটি টাইপ গ্লারা প্রস্তুত টিকাকে মনোভ্যালেন্ট, ২টি গ্লারা প্রস্তুত টিকাকে বাইভ্যালেন্ট এবং এভাবে ট্রাইভ্যালেন্ট ও কোয়াক্সিভ্যালেন্ট বা পলিভ্যালেন্ট টিকা তৈরি হয়। পশুসম্পদ গবেষণাগারে উপদ্রুত এলাকা হতে সংগৃহীত ভাইরাস টাইপ গ্লারা টিকা তৈরি করে সরবরাহ করা হয়।

মাত্রা :

প্রতিটি গরু/মহিষের জন্য— মনোভ্যালেন্ট টিকা ৩ মি.লি., বাইভ্যালেন্ট টিকা ৬ মি.লি. ও পলিভ্যালেন্ট টিকা ১০ মি.লি. করে।

প্রতিটি ছাগল/ভেড়ার জন্য— মনোভ্যালেন্ট টিকা ১.৫ মি.লি., বাইভ্যালেন্ট টিকা ৩ মি.লি. পলিভ্যালেন্ট টিকা ৪ মি.লি. করে।

প্রথম টিকা পশুর ২–৩ মাস বয়সে প্রয়োগ করতে হয়। ১ মাস পর দ্বিতীয় টিকা দিতে হবে এবং প্রথম টিকাদানের ঠিক ৬ মাসে তৃতীয় ডোজ দিতে হবে। প্রতি ৬ মাস পরপর টিকা প্রয়োগ করতে হয়। গবাদিপশুর গলকম্বলের (Dewlap) চামড়ার নিচে ইনজেকশন আকারে টিকা প্রয়োগ করতে হয়। এ টিকা 2° – 8° সে. তাপমাত্রায় অক্ষকারে সংরক্ষণ করতে হয় এবং পরিবহণের যথাযথ নিয়ম মেনে তা করতে হবে।

রিভারপেস্ট টিসিভি টিকা
গরুমহিষের রিভারপেস্ট ও
ছাগলভেড়ার পি.পি.আর.
রোগপ্রতিরোধে ব্যবহৃত হয়।

গোবসন্ত বা রিভারপেস্ট রোগের টিকা (TCV)

কয়েক বছর পূর্বে মহাখালীস্থ পশুসম্পদ গবেষণাগারে ছাগলকে রিভারপেস্ট ভাইরাস ফ্লারা আক্রান্ত করে মেরে এর প্লীহা (Spleen) থেকে টিকা অর্থাৎ জিটিভি (Goat Tissue Vaccine) তৈরি করা হতো। পৃথিবীর কোথাও বর্তমানে এ পদ্ধতিতে টিকা তৈরি করা হয় না। বর্তমানে জিটিভি এর পরিবর্তে টিসিভি অর্থাৎ গোট টিস্যু কালচার ভেক্সিন (Goat Tissue Culture Vaccine) তৈরি হচ্ছে। ১০০ মাত্রার টিকা শুক্র অবস্থায় সরবরাহ করা হয়। ১০০ মি.লি. পরিসুত পানি (Distilled Water) গুলে ১ মি.লি. মাত্রায় চামড়ার নিচে ইনজেকশন দিতে হয়। প্রতি হয় মাস পরপর টিকা দিতে হয়। জিটিভি টিকা ছাগলভেড়াকে দেয়া যেত না। কিন্তু বর্তমানের টিসিভি সব গবাদিপশুকেই দেয়া যায়। ছাগলভেড়ার পি.পি.আর. রোগের প্রতিষেধক টিকা হিসেবে এটি ব্যবহার করা হয়। ছাগলভেড়াকে ০.৫ মি.লি. টিসিভি চামড়ার নিচে ইনজেকশন দিতে হয়। টিকা ২°-৮°সে. তাপমাত্রায় সংরক্ষণ এবং পরিবহণ করতে হয়।

জলাতক্ষ রোগের টিকা (Anti-rabies Vaccine)

পশুসম্পদ গবেষণাগারে প্রস্তুত টিকা কুকুর ও গবাদিপশুর জলাতক্ষ রোগ প্রতিরোধকল্পে প্রয়োগ করা হয়। এ গবেষণাগারে দুপ্রকার টিকা তৈরি করা হয়। যথা— ক. লেপ— LEP (Low Embryo Passage) I খ. হেপ— HEP (High Embryo Passage)। কুকুরের জন্য লেপ এবং গবাদিপশুর জন্য হেপ ব্যবহার করা হয়। হেপ টিকা তিন মাস বয়সের বেশি গবাদিপশুকে দিতে হয়। হিমশুক্র এ টিকা একক মাত্রায় ভায়ালে সরবরাহ করা হয়। টিকার সাথে ৩ মি.লি. এর ডাইলুয়েট টিকা মিশানোর জন্য সরবরাহ করা হয়।

মাত্রা :

প্রতিটি গরুর জন্য— ৩ মি.লি. করে।

প্রতিটি বানর/বিড়ালের জন্য— ১.৫ মি.লি. করে।

এ টিকা মাংসে ইনজেকশন হিসেবে দিতে হয় ও ১ মাস পর বুস্টার ডোজ এবং প্রতি বছর একবার দিতে হয়। এ টিকা কোনো অবস্থাতেই চামড়ার নিচে ইনজেকশন দেয়া যাবে না। টিকা ২°-৮°সে. তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হয়। সময়োটোর্ন টিকা ব্যবহার করা যাবে না। গুলানো টিকা ফ্রিজে রেখে পুনরায় ব্যবহার করা যাবে না। পরিবহণের সকল নিয়মকানুন মেনে পরিবহণ করে তবেই সে টিকা ব্যবহার করতে হবে।



অনুশীলন (Activity) ৪ গবাদিপশুতে ভাইরাল টিকাগুলোর নাম, মাত্রা, প্রয়োগপথ প্রভৃতি ছক আকারে লিখুন।



সারমর্ম ৪ দেশে ভাইরাসজনিত ক্ষুরারোগ, রিভারপেস্ট ও জলাতক্ষের টিকা প্রস্তুত করা হয়। টিকার পরিবহণ, সংরক্ষণ ও প্রয়োগ পদ্ধতির ওপর এর কার্যকারিতা নির্ভরশীল। ক্ষুরা রোগের বিভিন্ন টাইপ ফ্লারা তৈরি টিকা ব্যবহৃত হয়। মনোভ্যালেন্ট, বাইভ্যালেন্ট এবং ট্রাইভ্যালেন্ট এর জন্য প্রয়োগ মাত্রার তারতম্য হয়। টিকা চামড়ার নিচে দিতে হয়। রিভারপেস্ট টিসিভি গরুমহিষের রিভারপেস্ট ও ছাগলভেড়ার পি.পি.আর. রোগপ্রতিরোধে ব্যবহৃত হয়। কুকুরের জন্য লেপ এবং গবাদিপশুর জন্য হেপ টিকা জলাতক্ষ রোগপ্রতিরোধে ব্যবহৃত হয়।



পাঠোভর মূল্যায়ন ৭.৩

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. পশুসম্পদ গবেষণাগারে তৈরি গবাদিপশুর ভাইরাল টিকাণ্ডলো কী কী?

i) তড়কা, গলাফোলা ও বাদলা রোগের টিকা

ii) ক্ষুরা, গোবসন্ত ও রেবিস রোগের টিকা

iii) তড়কা, বাদলা ও ক্ষুরারোগের টিকা

iv) গোবসন্ত, বাদলা ও ক্ষুরারোগের টিকা

খ. বাংলাদেশে সাধারণত যে চারটি টাইপ প্লারা ক্ষুরা রোগ হয় সেগুলো কী কী?

i) এ, সি, স্যাট ১ এবং স্যাট ২

ii) এ, ও, সি এবং এশিয়া ১

iii) এ, ও, সি এবং স্যাট ১

iv) ও, সি, এশিয়া ১ এবং স্যাট ১

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. ছাগলের পি.পি.আর. হলে টিসিভি রিভারপেস্ট টিকা প্রয়োগ করা হয়।

খ. কুকুরের জলাতক্ষ রোগপ্রতিরোধে হেপ এবং গবাদিপশুর জন্য লেপ ব্যবহার করা হয়।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. একটি টাইপের ক্ষুরা রোগের ভাইরাস প্লারা প্রস্তুত টিকাকে _____ টিকা বলা হয়।

খ. ক্ষুরারোগের প্রথম টিকার _____ পর দ্বিতীয় টিকা দিতে হয়।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. ক্ষুরারোগে বিভিন্ন মাত্রার যেসব টিকা ব্যবহার করা হয় সেগুলো কী কী?

খ. কোন্ টিকা একক মাত্রায় এবং ডাইলুয়েন্টসহ সরবরাহ করা হয়?

ব্যবহারিক

পাঠ ৭.৪ বিভিন্ন ধরনের টিকাবীজ সংরক্ষণ হাতে কলমে শেখা এবং পদ্ধতি খাতায় লেখা



এ পাঠ শেষে আপনি –

- নিজ হাতে কোথায় টিকা সংরক্ষণ করবেন তা বলতে পারবেন।
- নিজ হাতে বিভিন্ন প্রকার টিকা বিভিন্ন পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করতে পারবেন।



টিকার গুণগতমান বজায় রাখার জন্য এটি সংরক্ষণ করতে হয়। এতে সফলভাবে গবাদিপঙ্কৰ রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

টিকার গুণগত মান বজায় রেখে টিকা প্রয়োগ করলে পশু রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা প্রাপ্ত হবে। টিকা সংগ্রহের স্থান থেকে টিকা প্রয়োগের পূর্ব পর্যন্ত টিকার মান বজায় রাখতে $2^{\circ}-8^{\circ}\text{সে.}$ তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হয়। এ জন্য টিকা বরফভর্তি থার্মোফ্লাক্স বা কুলবক্সে বহন করতে হয়। খামারে টিকা রেফ্রিজারেটরে রাখতে হয়। টিকার ভায়াল বা বোতলে সূর্যের আলো সরাসরি লাগতে দেয়া যাবে না। থার্মোফ্লাক্স বা কুলবক্সে টিকা বরফসহ বহন করা নিশ্চিত করতে হয়। রেফ্রিজারেটর যে ঠিকভাবে চলছে তা পরীক্ষা করতে হয়। টিকা পরিবহণ ও মজুদকালে এ কাজগুলো সঠিকভাবে করাই টিকা সংরক্ষণ।

টিকা সংরক্ষণের সুবিধা

- ◆ টিকার কার্য্যকারিতা বজায় থাকে।
- ◆ সফল রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়।
- ◆ খামারে মড়ক (Epidemic) আকারে রোগ দেখা দেয় না।
- ◆ খামারের উৎপাদনে বিরুপ প্রতিক্রিয়া পড়ে না।
- ◆ লাভজনক খামার প্রতিষ্ঠার সহায়ক হয়।
- ◆ টিকা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতি আহ্বার সৃষ্টি হয়।

টিকা সংরক্ষণের প্রয়োজন

- ◆ তাপমাত্রা নির্দিষ্ট রাখার জন্য।
- ◆ পরিবহণের সময় মান ঠিক রাখার জন্য।
- ◆ মজুদকালে কার্য্যকারিতা বহাল রাখার জন্য।
- ◆ সূর্যের আলো থেকে রক্ষা করার জন্য।

টিকা সংরক্ষণ পদ্ধতি

দুভাবে টিকা সংরক্ষণ করা যায়। যথা—

১. রেফ্রিজারেটর বা কুল রুমে
২. থার্মোফ্লাক্স, কুলবক্স বা কুলভ্যানে

১. রেফ্রিজারেটর বা কুলরুম : রেফ্রিজারেটর/কুলরুমে টিকা $2^{\circ}-8^{\circ}\text{সে.}$ এ রাখা হয়। ডিপফ্রিজ বা ফ্রিজের আইস চেম্বারে টিকা রাখা যাবে না।

২. থার্মোফ্লাক্স, কুলবক্স বা কুলভ্যান : টিকা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান থেকে কুলভ্যানে করে বেশি পরিমাণ টিকা বহন করে নিয়ে জেলা সদরের কুল রুমে মজুদ করা হয়। সেখান থেকে থার্মোফ্লাক্স বা কুলবক্সে করে থানা সদর বা খামারে বহন করে রেফ্রিজারেটরে মজুদ করা হয়। অতঃপর থার্মোফ্লাক্সে করে টিকা প্রদানের জন্য নির্দিষ্ট খামার বা স্থানে নেয়া হয়।

পরিবহণ ও মজুদকালে $2^{\circ}-8^{\circ}\text{সে.}$ তাপমাত্রা নিশ্চিত করতে হবে।

পরীক্ষণ ১ কুলবক্সে টিকা সংরক্ষণ পদ্ধতি

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. টিকার ভায়াল— দরকারমতো ।
২. যন্ত্রপাতি—
 - ক. কুলবক্স— ১টি ।
 - খ. থার্মোস্ট্যাট গ্লোভস— ১টি ।
৩. বরফের টুকরো— পরিমাণমতো (প্রায় ৩ কেজি) ।
৪. ব্যবহারিক খাতা, কলম, পেসিল, রাবার, সার্পনার, ক্ষেল ইত্যাদি ।

কাজের ধারা

কুলবক্সে বরফসহ একস্থান
হতে অন্যস্থানে টিকা বহন
করতে হয় ।

- ◆ টিকা গ্রহণের দাগ্ধরিক কাজ সেরে নিন ।
- ◆ ডান হাতে থার্মোস্ট্যাট গ্লোভস পরে নিন ।
- ◆ এবার বাম হাতে কুলবক্সের ঢাকনা খুলে নিন ।
- ◆ এক কেজি পরিমাণ বরফের টুকরো কুলবক্সের ভিতরে তলায় বিছিয়ে দিন ।
- ◆ কুল রুম থেকে ট্রেতে সাজানো টিকা বের করে দেয়ার সাথে সাথে দ্রুত গণনা করে কুলবক্সে
সাজিয়ে রাখুন ।
- ◆ বেশি পরিমাণ টিকা সরবরাহ নিতে হলে ১৫ সে.মি. স্তরে আবার বরফের ৭.৫ সে.মি. স্তর
দিয়ে তার উপর টিকার ভায়াল রাখুন । এরপর আবার ৭.৫—১০ সে.মি. স্তর করে কুলবক্সের
ঢাকনা বন্ধ করে দিন ।
- ◆ এবার যত দ্রুত সম্ভব উদ্দিষ্ট স্থানে যাত্রা করুন ।
- ◆ নির্দিষ্ট স্থানে পৌছার পর কুলবক্স থেকে টিকাগুলো বের করে সাথে সাথে রেফ্রিজারেটরে
রেখে দিন ।
- ◆ রেফ্রিজারেটরের দরজা ঠিকভাবে বন্ধ করেছেন কি—না তা পরীক্ষা করুন ।
- ◆ পুরো পরীক্ষণটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখুন ও টিউটরকে দেখিয়ে তাতে সই
নিন ।

সাবধানতা

- ◆ কুলবক্সে করে বেশি সময় টিকা পরিবহণের ক্ষেত্রে মাঝাপথে বরফ গলে গলে তা আবার
ভরতে হবে ।
- ◆ যে রেফ্রিজারেটরে টিকা রাখা হয়েছে তার পাওয়ার সাপ্লাই ঠিক আছে কি—না এবং তা
ঠিকমতো চলছে কি—না তা লক্ষ্য করতে হবে ।

পরীক্ষণ ২ রেফ্রিজারেটরে টিকা সংরক্ষণ

সুবিধা

- ◆ সেলফ লাইফ পর্যন্ত টিকা কার্যকর থাকে ।
- ◆ সর্বদা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বজায় থাকে ।
- ◆ বেশি পরিমাণে টিকা রাখা যায় ।
- ◆ বার বার বরফ দেয়ার প্রয়োজন হয় না ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. রেফ্রিজারেটর— ১টি।
২. টিকার ভায়ালসহ কুলভ্যান— ১টি।
৩. টিকা রাখার ট্রে— ২-৩টি।

কাজের ধারা

কুলভ্যান থেকে বিভিন্ন টিকা ভিন্ন ভিন্ন ট্রেতে করে রেফ্রিজারেটরে সাজিয়ে সংরক্ষণ করতে হয়।

- ◆ কুলভ্যানে করে বহন করা বিভিন্ন রোগের টিকা ভ্যানের মধ্যেই আলাদা ট্রেতে সাজিয়ে নিন।
- ◆ ভ্যান হতে সাবধানে ও দ্রুত নামিয়ে রেফ্রিজারেটরের কাছে রাখুন।
- ◆ আলতোভাবে রেফ্রিজারেটরের দরজা খুলুন।
- ◆ এবার দুহাতে সাবধানে রেফ্রিজারেটরের বিভিন্ন র্যাকে ভিন্ন ভিন্ন টিকার ট্রে সাজিয়ে নিন।
- ◆ রেফ্রিজারেটরের দরজা ঠিকমতো বন্ধ হয়েছে কি—না তা পরীক্ষা করুন।
- ◆ রেফ্রিজারেটরের প্লাগ ছকেটে লাগানো এবং সুইচ অন করা হয়েছে কি—না লক্ষ্য করুন।
- ◆ এবার রেফ্রিজারেটরের কম্প্রেসরের শব্দ শুনে বা রেফ্রিজারেটরের দরজা খুলে লাইট দেখে এটি যে ঠিকমতো চলছে তা নিশ্চিত হোন।
- ◆ পুরো প্রক্রিয়াটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখুন ও টিউটরকে দেখিয়ে তাতে সহ নিন।

সাবধানতা

- ◆ মাঝেমধ্যে পরীক্ষা করে রেফ্রিজারেটর চলা নিশ্চিত করতে হয়।
- ◆ আইস চেম্বারে কখনও টিকা সংরক্ষণ করবেন না।

পরীক্ষণ ৩ থার্মোফ্লাক্সে সংরক্ষণ করে খামারে টিকা পরিবহণ

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. টিকার ভায়াল— প্রয়োজনমতো।
২. থার্মোফ্লাক্স— ১টি।
৩. বরফের টুকরো— ১৫-২০টি।

কাজের ধারা

থার্মোফ্লাক্সে বরফের টুকরো দিয়ে সংরক্ষণ করে টিকা বহন করতে হয়।

- ◆ রেফ্রিজারেটর থেকে টিকা বের করার পূর্বে ডিপফ্রিজ থেকে ৮-১০ টুকরো বরফ থার্মোফ্লাক্সে নিন।
- ◆ রেফ্রিজারেটর থেকে টিকার ভায়াল বের করে থার্মোফ্লাক্সে রাখুন।
- ◆ থার্মোফ্লাক্সের উপর বাকি বরফের টুকরো দিয়ে দিন।
- ◆ থার্মোফ্লাক্সের মুখ বন্ধ করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পরিবহণ করুন।
- ◆ থার্মোফ্লাক্স থেকে প্রয়োজনমতো টিকার ভায়াল বের করে থাইংয়ের জন্য রেখে দিন।
- ◆ থইং শেষে টিকা ব্যবহারের পদ্ধতি অনুযায়ী তা প্রয়োগ করুন।
- ◆ পুরো প্রক্রিয়াটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখুন ও টিউটরকে দেখিয়ে তাতে সহ নিন।

সাবধানতা

- ◆ থার্মোফ্লাক্সের বরফ গলে গলে নতুন করে যোগ করুন।

ব্যবহারিক

পাঠ ৭.৫ একটি সুস্থ পঞ্চকে যে কোনো একটি ব্যাকটেরিয়াল টিকা প্রদান করতে শেখা

এ পাঠ শেষে আপনি –

- নিজ হাতে ব্যাকটেরিয়াল টিকা থইং করতে পারবেন।
- নিজ হাতে ব্যাকটেরিয়াল টিকা সিরিঙ্গে ভরতে পারবেন।
- নিজ হাতে ব্যাকটেরিয়াল টিকা গবাদিপশুর দেহে ইনজেকশন করতে পারবেন।



টিকার বোতল থার্মোফ্লাক্স
থেকে বের করে কয়েক মিনিট
ঘর বা পরিবেশের তাপমাত্রায়
রেখে দিলেই থইং হয়ে যায়।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

থইং

টিকা থার্মোফ্লাক্স থেকে বের করে পরিস্রূত পানি দিয়ে গুলার পূর্বে তা পঞ্চর দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রার সমান তাপমাত্রায় নামিয়ে আনাকে থইং (Thawing) বলে। তরল টিকা থার্মোফ্লাক্স থেকে বের করে কয়েক মিনিট পরিবেশের বা ঘরের তাপমাত্রায় রেখে দিলে থইং হয়ে যায়। থইং সময় ঘরের বা পরিবেশের তাপমাত্রার ওপর নির্ভরশীল। এছাড়া টিকার ভায়াল বা বোতল দুহাতের তালুর মধ্যে আলতো করে ঘসে থইং করা যায়।

টিকা প্রদান

ব্যাকটেরিয়াল টিকা তরল অবস্থায় বিভিন্ন মাত্রার বোতলে পাওয়া যায়। সব ব্যাকটেরিয়াল টিকাই ইনজেকশনের মাধ্যমে চামড়ার নিচে পুশ করা হয়। একই টিকার মাত্রা গবাদিপশুর প্রজাতিতে ভিন্ন ভিন্ন হয়। এখানে গলাফোলা রোগের প্রতিষেধক টিকা আপনি কী করে গরুর দেহে প্রয়োগ করবেন তা বর্ণনা করা হচ্ছে।

পদ্ধতি

সিরিঙ্গে নির্দিষ্ট মাত্রার গলাফোলা রোগের তরল টিকা বোতল থেকে টেনে নিয়ে গলার চামড়া একটু টেনে উঠিয়ে চামড়ার নিচে সুচ চুকিয়ে পুশ করা হয়। গলাফোলা রোগের প্রতিষেধক টিকা ১০০ মি.লি. বোতলে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। গরুর জন্য এ টিকার মাত্রা ২ মি.লি. এবং তিনমাস বয়সের বাচ্চুরকে প্রথম টিকা দিতে হয়। এ টিকা প্রতি বছর একবার দিতে হয়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. তিনমাস বয়সের বাচ্চুর— ১টি।
২. গলাফোলা রোগের প্রতিষেধক টিকা— ১ বোতল।
৩. যন্ত্রপাতি—
 - ক. গ্লাস সিরিঙ্গ— ১ টি।
 - খ. খাটো মোটা সুচ— ১ টি।
৪. ব্যবহারিক খাতা, কলম, পেন্সিল, রাখার, সার্পনার, ক্ষেল ইত্যাদি।

কাজের ধারা

- ◆ প্রথমে বাচ্চুরটির সুস্থতা পরীক্ষা করে নিন।
- ◆ থার্মোফ্লাক্স থেকে গলাফোলা রোগের টিকার বোতল বের করে টেবিলের উপর রেখে দিন।
- ◆ এবার ফুটানো পানিতে জীবাণুমুক্ত করা গ্লাস সিরিঙ্গে নিডল লাগিয়ে টেবিলে রাখুন।

- ◆ টিকার বোতল হাতে নিয়ে দুহাতের তালুর মাঝে রেখে অনুভব করে নিন তাপমাত্রা আপনার হাতের তামাত্রার কাছাকাছি এসেছে কি—না।
- ◆ এবার টিকার বোতলের মুখের রাবার সিলের উপরের আলগা অংশটি খুলে ফেলুন।
- ◆ বোতলটি বাম হাতের ঘুঠোয় ভালোভাবে ধরে রাঁকিয়ে নিন।
- ◆ এবার ডান হাতে সিরিঞ্জ নিয়ে রাবার সিলের ভিতর দিয়ে সুচ ঢুকিয়ে পিস্টনের সাহায্যে টেনে ২ মি.লি. তরল টিকা ভরে নিন।



চিত্র ৫৯ : ভায়াল থেকে সিরিঞ্জে গলাফোলা রোগের টিকা টেনে নেয়া হচ্ছে

- ◆ টিকার বোতল রেখে দিন।
- ◆ তরল টিকার সাথে বাতাস বা বুদবুদ সিরিঞ্জে ঢুকে থাকলে তা সাবধানে পিস্টনের পিছন থেকে চাপ দিয়ে বের করে ফেলুন। টিকার পরিমাণ ২ মি.লি. আছে কি—না তা দেখে নিন।



চিত্র ৬০ : বাচ্চুরের গলার চিলা চামড়ার নিচে গলাফোলা রোগের টিকা প্রদান

- ◆ বাছুরকে আপনার সাহায্যকারী ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে কি—না তা একবার দেখে নিন।
- ◆ এবার বাছুরটির কাছে সাবধানে যেয়ে গলার চিলা চামড়া আলতো করে টেনে ধরে সুচ ফুটিয়ে চামড়ার নিচে সম্পূর্ণ তরল টিকা পুশ করুন।
- ◆ বাছুরটিকে ছেড়ে দিতে বলুন।
- ◆ এবার পুরো পরীক্ষণটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখুন ও আপনার টিউটরকে দেখিয়ে তাতে সই নিন।

সাবধানতা

- ◆ সিরিঞ্জ ও সুচ কোনো রাসায়নিক দ্রব্য প্লারা জীবাণুমুক্ত করা যাবে না।
- ◆ টিকা প্রয়োগের স্থানে কোনো অ্যান্টিসেপ্টিক ওষুধ ব্যবহার করা যাবে না।
- ◆ টিকা প্রয়োগের পর সামান্য জ্বর হতে পারে। এজন্য কোনো ওষুধ ব্যবহার করা যাবে না।
- ◆ টিকা প্রয়োগকালে পশু নিয়ন্ত্রণের জন্য এ কাজে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে সাহায্যকারী হিসেবে নিতে হবে।
- ◆ টিকা প্রদানের সরঞ্জাম রাখার স্থান থেকে ৫–৭ মিটার দূরে টিকা প্রদান কাজ চালাতে হবে।
- ◆ নিরিবিলি স্থানে টিকা প্রদান কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

ব্যবহারিক

৭.৬ একটি সুস্থ গরুকে যে কোনো একটি ভাইরাল টিকা প্রদান করতে শেখা



এ পাঠ শেষে আপনি –

- নিজে নিজে ভাইরাল টিকা থইং করতে পারবেন।
- ভাইরাল টিকা সিরিঞ্জে উঠাতে পারবেন।
- নিজ হাতে ভাইরাল টিকা পুশ করতে পারবেন।



প্রাসঙ্গিক তথ্য

থইং

ব্যাকটেরিয়াল টিকার মতোই ভাইরাল টিকাও থইং করা যায়।

টিকা প্রদান

টিকা থইং করে সিরিঞ্জে ভরে গলার চামড়ার নিচে ১০ মি.লি. মাত্রায় ৩ মাসের বেশি বয়সের বাচ্চুরকে প্রথমবার টিকা প্রয়োগ করতে হয়। একমাস পর দ্বিতীয়বার ও বছরে দুবার এ টিকা দিতে

এ পাঠে গবাদিপশুর ক্ষুরারোগের প্রতিষেধক টিকা কী করে প্রদান করতে হয় তা হাতেকলমে শিখবেন। ক্ষুরারোগের ভাইরাসের বিভিন্ন সাবটাইপের বিরুদ্ধে আলাদা প্রতিষেধক টিকা ব্যবহার করতে হয়। এ টিকা বর্তমানে বেশ ব্যয়বহুল। তাই কোনো এলাকায় এ রোগের প্রকোপ দেখা দিলে এলাকায় আক্রান্ত পশু হতে নমুনা সংগ্রহ করে ভাইরাস টাইপিং করার পর নির্দিষ্ট টাইপের বিরুদ্ধে রিং ভেকসিনেশনের মাধ্যমে সুস্থ পশুকে টিকা দেয়া হয়। অবশ্য খামার পর্যায়ে দেশে বিদ্যমান ৪টি সাবটাইপের বিরুদ্ধে পলিভ্যালেন্ট টিকা ১০ মি.লি. মাত্রায় তিনমাস বয়সের বাচ্চুরকে ১ম বার এবং ১ মাস পর ২য় বার দিতে হয়। বছরে ২ বার টিকাদান করা হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তৈরি ক্ষুরারোগের টিকা তরল অবস্থায় বিভিন্ন আকারের বোতলে পাওয়া যায়। এ টিকা ইনজেকশনের মাধ্যমে চামড়ার নিচে প্রয়োগ করা হয়।

পদ্ধতি

সিরিঞ্জে তরল ক্ষুরারোগের প্রতিষেধক টিকা মাত্রানুযায়ী বোতল থেকে টেনে নিয়ে গরুর গলার চামড়া একটু টেনে উঠিয়ে চামড়ার নিচে সুচ চুকিয়ে পুশ করা হয়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. তিনমাস বয়সের বাচ্চু— ১টি।
২. ক্ষুরারোগের প্রতিষেধক টিকা— ১ বোতল।
৩. যন্ত্রপাতি—
 - ক. গ্লাস সিরিঞ্জ— ১ টি।
 - খ. খাটো মোটা সুচ— ১ টি।

কাজের ধারা

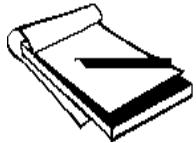
- ◆ প্রথমে বাচ্চুটির সুস্থিতা পরীক্ষা করে নিন।
- ◆ থার্মোফাস্ক থেকে ১টি পলিভ্যালেন্ট ক্ষুরারোগের টিকার বোতল বের করে টেবিলের উপর রেখে দিন।
- ◆ বোতলের গায়ে লাগানো লেবেল পড়ে টিকা প্রদানের নিয়মকানুন ও ব্যবহারের শেষ সময় (Expiry Date) দেখে নিন।
- ◆ এবার ফুটানো পানিতে জীবাণুমুক্ত করা গ্লাস সিরিঞ্জে সুচ লাগিয়ে টেবিলে রাখুন।

১০ মি.লি. পলিভ্যালেন্ট টিকা থইংয়ের পর সিরিঞ্জে ভরে বাচ্চুরের চামড়ার নিচে পুশ করতে হয়। টিকা প্রয়োগের পর জুর হলে আস্টিবায়োটিক ফ্লারা চিকিৎসা করা যাবে না।

- ◆ টিকার বোতল হাতে নিয়ে দুহাতের তালুর মাঝে রেখে অনুভব করে নিন যে তাপমাত্রা আপনার হাতের তাপমাত্রার কাছাকাছি এসেছে কি—না।
- ◆ এবার টিকার বোতলের মুখের রাবারের সিলের উপরের আলগা অংশ সরিয়ে ফেলুন।
- ◆ বোতলটি বাম হাতের মুঠোয় ভালোভাবে ধরে বাঁকিয়ে নিন।
- ◆ এবার ডান হাতে সিরিজে নিয়ে রাবার সিলের ভিতর দিয়ে সুচ ঢুকিয়ে পিস্টনের সাহায্যে টেনে ১০ মি.লি. তরল টিকা ভরে নিন।
- ◆ টিকার বোতল রেখে দিন।
- ◆ তরল টিকার সাথে বাতাস বা বুদবুদ সিরিজে ঢুকে থাকলে তা সাবধানে পিস্টনের পিছন থেকে চাপ দিয়ে বের করে ফেলুন। টিকার পরিমাণ ১০ মি.লি. আছে কি—না তা দেখে নিন।
- ◆ বাচ্চুরটিকে আপনার সাহায্যকারী ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে কি—না তা একবার দেখে নিন।
- ◆ এবার বাচ্চুরের কাছে সাবধানে যেয়ে গলার ঢিলা চামড়া আলতো করে টেনে ধরে সুচ ফুটিয়ে চামড়ার নিচে সম্পূর্ণ তরল টিকা পুশ করুন।
- ◆ বাচ্চুর ছেঢ়ে দিতে বলুন।
- ◆ এবার পুরো পরীক্ষণটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখুন ও আপনার টিউটরকে দেখিয়ে তাতে সই নিন।

সাবধানতা

- ◆ টিকা প্রয়োগের স্থানে কোনো অ্যান্টিসেপ্টিক ব্যবহার করা যাবে না।
- ◆ টিকা প্রয়োগের পর সামান্য জ্বর হতে পারে। তবে এক্ষেত্রে কোনো ঔষুধ ব্যবহার করবেন না।
- ◆ অভিজ্ঞ লোক দিয়ে পশু নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- ◆ নিরিবিলি স্থানে টিকা প্রদানের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।



চূড়ান্ত মূল্যায়ন – ইউনিট ৭

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন

- ১। রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা গবাদিপশু কতভাবে পেয়ে থাকে?
- ২। অর্জিত রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা কী?
- ৩। টিকা সংরক্ষণ পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন?
- ৪। কীভাবে টিকা পরিবহণ করবেন?
- ৫। ব্যাকটেরিয়াল টিকা কী? আমাদের দেশে কী কী ব্যাকটেরিয়াল টিকা পাওয়া যায়?
- ৬। গবাদিপশুতে বাদলা রোগের টিকা ব্যবহারের নিয়ম কী?
- ৭। ভাইরাল টিকা বলতে কী বোঝেন?
- ৮। গবাদিপশুতে ক্ষুরারোগের টিকার ব্যবহার সংক্ষেপে বর্ণনা করুন?
- ৯। জলাতক্ষ রোগের টিকা কত প্রকার ও কী কী?
- ১০। বিভিন্ন পশুতে জলাতক্ষ রোগের টিকা ব্যবহারের মাত্রা বর্ণনা করুন।
- ১১। ক্ষুরারোগের টিকা কত প্রকার?
- ১২। বিভিন্ন পশুতে বিভিন্ন প্রকার ক্ষুরারোগের টিকার ব্যবহারবিধি লিখুন।
- ১৩। গোবসন্ত বা রিভারপেস্ট টিকার ব্যবহারবিধি লিখুন।
- ১৪। কীভাবে থার্মোফ্লাক্সে করে খামারে টিকা পরিবহণ করবেন?
- ১৫। থইং বলতে কী বোঝেন?



উন্নতমালা – ইউনিট ৭

পাঠ ৭.১

১। ক. i ১। খ. iii ২। ক. স ২। খ. মি ৩। ক. বংশধরেরাও ৩। খ.
আদর্শ ৪। ক. সংরক্ষণ তাপমাত্রা ঠিক রাখতে ৪। খ. ১৮%

পাঠ ৭.২

১। ক. iv ১। খ. ii ২। ক. মি ২। খ. মি ৩। ক. ব্যাকটেরিয়াল ৩। খ.
গলাফোলা ৪। ক. টিকা সংরক্ষণ ও ব্যবহার পদ্ধতি জানানোর জন্য ৪। খ. গলার চিলা চামড়ার
নিচে

পাঠ ৭.৩

১। ক. ii ১। খ. ii ২। ক. স ২। খ. মি ৩। ক. মনোভ্যালেন্ট ৩। খ. ১ মাস
৪। ক. মনোভ্যালেন্ট, বাইভ্যালেন্ট, ট্রাইভ্যালেন্ট, কোয়ার্ট্রিভ্যালেন্ট বা পলিভ্যালেন্ট ৪। খ. জলাতক্ষ

ইউনিট ৮ টিকা ও ওষুধের ব্যবহার পদ্ধতি

ইউনিট ৮ টিকা ও ওষুধের ব্যবহার পদ্ধতি

টিকা ও ওষুধের সঠিক ব্যবহার রোগপ্রতিরোধ ও নিরাময় নিশ্চিত করে এবং টিকা ও ওষুধের অপচয় রোধ করে। টিকার ব্যবহার যথাযথ না হলে গবাদিপশুর সংক্রামক রোগের মহামরীর জন্য খামারিলা লোকসানের সম্মুখীন হবেন। এতে খামারি তথা দেশ এক গুরুতর আর্থিক বিপর্যয়ের মুখে পড়তে পারে। গাভীর ওষুধ প্রয়োগ সঠিক মাত্রায় হতে হবে। যদি মাত্রা সঠিক না হয় তবে রোগ সারবে না। কম মাত্রায় ওষুধ প্রয়োগের ফলে আক্রমণকারী জীবাণু ওষুধের বিরুদ্ধে সহনশীলতা (Drug Resistant) অর্জন করবে। পরবর্তীতে ঐ ওষুধ প্রয়োগে ঐ রোগ নিরাময় করা যাবে না।

এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে বিভিন্ন প্রকার টিকা ও ওষুধ প্রয়োগের বিভিন্ন পদ্ধতি তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিকসহ আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ৮.১ টিকা ও ওষুধ প্রয়োগ পদ্ধতি



এ পাঠ শেষে আপনি –

- টিকা ও ওষুধ প্রয়োগের বিভিন্ন পথ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- টিকা প্রয়োগের বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনা করতে পারবেন।
- ওষুধ প্রয়োগের বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।



দেহে টিকা বা ওষুধ প্রবেশের
পথকে রুট অব
অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বলে।

টিকা ও ওষুধ প্রয়োগ পথ

যে নিয়মে বা পথে পশুর দেহে টিকা বা ওষুধ প্রয়োগ করা হয় তাকে টিকা বা ওষুধ প্রয়োগ পথ বা রুট অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (Route of Administration) বলে। আক্রান্ত পশুর রোগের প্রকৃতি, আক্রান্ত অঙ্গ এবং আক্রমণকারী জীবাণুর ধরনের ওপর ওষুধ প্রয়োগ পদ্ধতি নির্ভর করে। সঠিকভাবে ওষুধ প্রয়োগে রোগ দ্রুত নিরাময় হয়। ভুল পদ্ধতিতে প্রয়োগে বিপদের আশঙ্কা আছে।

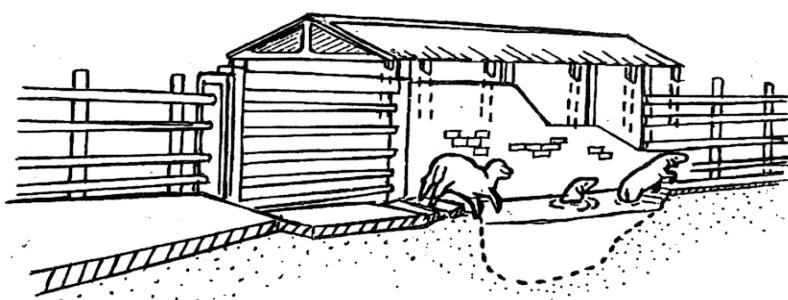
ওষুধ প্রয়োগের বিভিন্ন পদ্ধতি

সাধারণত তিন পদ্ধতিতে গবাদিপশুর দেহে ওষুধ প্রয়োগ করা হয়। যেমন—

ক. উপরি প্রয়োগ (Topical Application)

নিম্নলিখিতভাবে ওষুধ উপরি প্রয়োগ করা হয়। যথা—

১. প্রলেপ : যেমন— লোশন, মলম।
২. ডাস্টিং : যেমন— ড্রেসিং পাউডার।
৩. স্প্রে : যেমন— ঘায়ে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল স্প্রে।
৪. চেলে বা গোসল করিয়ে : যেমন— কৌটনাশক পানিতে মিশিয়ে ঢালা বা ডিপ (উরচ) দেয়া।

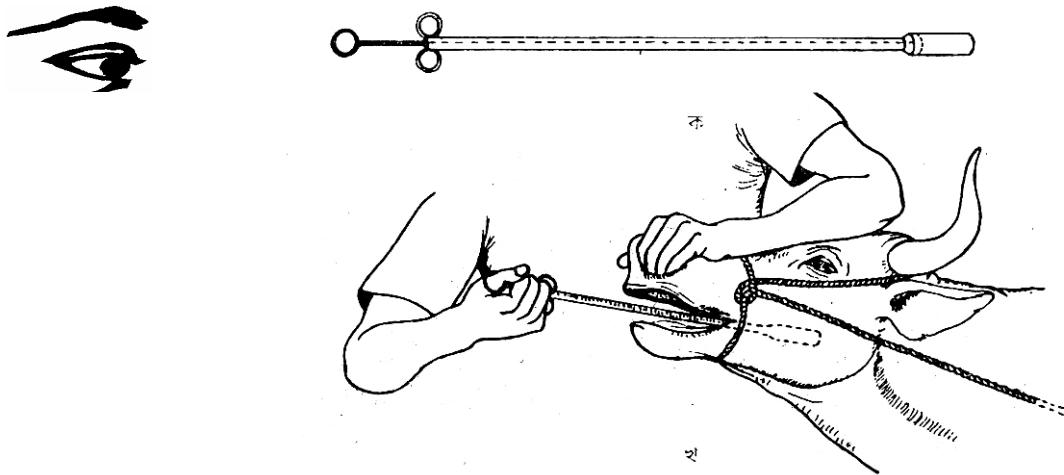


চিত্র ৬১ : ভেড়াকে কৌটনাশক ওষুধে গোসল করানো বা ডিপ দেয়া।

খ. দেহভ্যন্তরে নির্দিষ্ট অঙ্গে প্রয়োগ

সারারণত নিম্নলিখিতভাবে পবাদিপশুর অঙ্গে ওষুধ প্রয়োগ করা হয়। যেমন—

১. মুখে খাওয়ানো (Oral Administration)— যে কোনো পাউডার, তরল, ট্যাবলেট বা বোলাস ইত্যাদি পানিতে গুলে লম্বা গলাওয়ালা বোতল বা স্টেমাক টিউবের সমস্তি খাওয়াতে হয়। এছাড়া বলিং গানের (Balling Gun) মাধ্যমেও খাওয়ানো যায়।



চিত্র ৬২ (ক, খ) : বলিং গানের মাধ্যমে পশুকে ট্যাবলেটজাতীয় ওষুধ খাওয়ানো

২. ইন্ট্রারেকটাল প্রয়োগ— এ পদ্ধতিতে রাবার টিউবের সাহায্যে ডুস (Douche) দিয়ে ওষুধ প্রবেশ করানো হয়।

৩. ইন্ট্রাইউটেরাইন— এ পদ্ধতিতে পেসারিজাতীয় ওষুধ ঘোনিপথে প্রবেশ করানো হয়।

৪. ইন্ট্রামেমারি ইনফিউশন— এ পদ্ধতিতে বাটের ছিদ্রের ভিতর দিয়ে ওলানে অ্যান্টিবায়োটিকজাতীয় ওষুধ প্রয়োগ হয়।

৫. শ্বাসের মাধ্যমে ওষুধ প্রয়োগ (Inhalation)— এ পদ্ধতিতে ধূমায়িত (Fumigate) ওষুধ শাসনালি বা ফুসফুসের ভিতরে প্রবেশ করানো হয়।

৬. চোখে ফোটা (Eye Drop)— এ পদ্ধতিতে চোখে তরল ওষুধ প্রয়োগ করা হয়।

৭. কানে ফোটা (Ear Drop)— এটি কানে তরল ওষুধ প্রয়োগ করার পদ্ধতি।

গ. প্যারেন্টেরাল ওষুধ প্রয়োগ (Parenteral Administration)

ইনজেকশনের মাধ্যমে ওষুধ প্রয়োগ করাকে প্যারেন্টেরাল ওষুধ প্রয়োগ (Parenteral Administration) বলে। প্যারেন্টেরাল বিভিন্ন পথে ইনজেকশনের মাধ্যমে ওষুধ প্রয়োগ করা হয়। এগুলোর মধ্যে চারটি পথে প্রধানত পশুতে ইনজেকশন প্রয়োগ করা হয়। যেমন— মাংশপেশি, চামড়ার নিচ, শিরা ও পেরিটেনিয়াম পথ। প্যারেন্টেরাল ওষুধ সিরিজে সুচের মাধ্যমে পশুতে পুশ করে প্রদান করা হয়।

১. মাংসে ইনজেকশন (Intramuscular Injection)— সাধারণত পুরু মাংসপেশিতে ইন্ট্রামাসকুলার ইনজেকশন দিতে হয়। গবাদিপশুর গুটিয়াল মাংসে এ ইনজেকশন দিতে হয়।

২. সাবকিউটেনিয়াস ইনজেকশন (Subcutaneous Injection)— গবাদিপশুর চামড়ার নিচে ফ্যাসার (Fascia) মধ্যে ইনজেকশনের মাধ্যমে ওষুধ প্রয়োগকে সাবকিউটেনিয়াস ইনজেকশন বলে। গবাদিপশুর দেহের চিলা চামড়া, যেমন— গলকম্বল এবং নাভির চারপাশে এ ইনজেকশন প্রয়োগ করা যায়।

৩. ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশন (Intravenous Injection)— গবাদিপশুর শিরার মধ্যে ইনজেকশন গ্লারা সরাসরি রক্তের মধ্যে ওষুধ প্রয়োগকে ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশন বলে। গবাদিপশুর ঘাড়ের জুঁগুলার শিরা, কানের শিরা এবং ছাগল ভেড়ার টারসাল শিরায় ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশন দেয়া যায়।

৪. ইন্ট্রাপেরিটোনিয়াল ইনজেকশন (Intraperitoneal Injection)— এ পদ্ধতিতে গেট বা ফ্লাক্সের (খৃষ্ণধূশ) মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে লম্বা মোটা সুচ দিয়ে চামড়া ভেদ করে অভ্যন্তরীণ অঙ্গে ওষুধ প্রবেশ করানো হয়। সাধারণত পেরিটোনাইটিস রোগে আক্রান্ত পশুর ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিতে ওষুধ প্রয়োগ করা হয়।

টিকা প্রয়োগের বিভিন্ন পদ্ধতি

সব টিকা প্রয়োগের নির্দিষ্ট পথ আছে। এজন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, আনুসংস্ক দ্রবাদি, টিকা প্রয়োগ পদ্ধতি ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা যথাযথ কি—না তা পরীক্ষা করে নিতে হয়।

- গবাদিপশুর দেহে নির্দিষ্ট পথে টিকা প্রয়োগের ফলে প্রয়োজনীয় রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। ভুল পথে প্রয়োগে কোনো প্রতিরোধ ক্ষমতা তো গড়ে উঠেই না বরং খারাপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। টিকা প্রয়োগের সময় যেসব বিষয় খোল রাখতে হবে তা হচ্ছে—
- ◆ টিকা সঠিকভাবে পরিবহণ ও সংরক্ষণ করা হয়েছে কি—না।
 - ◆ টিকা প্রদানের যন্ত্রপাতি, সিরিঞ্জ, সুচ ইত্যাদি পানিতে ফুটিয়ে জীবাণুমুক্ত করা হয়েছে কি—না।
 - ◆ পশু সুস্থ কি—না।
 - ◆ পশুকে ছায়াতে রাখা হয়েছে কি—না।
 - ◆ টিকা গুলানোর জন্য পরিস্তুত পানি ব্যবহৃত হচ্ছে কি—না।
 - ◆ তরল ব্যাকটেরিয়াল টিকা হলে তা সিরিঞ্জে ভরার পূর্বে বোতল ঝাঁকিয়ে ভরা হচ্ছে কি—না।
 - ◆ টিকা প্রয়োগের পথ ঠিক হচ্ছে কি—না।
 - ◆ ঠিক মাত্রায় ইনজেকশন করা হচ্ছে কি—না।
 - ◆ টিকা রেজিস্ট্রার ও ভেকসিনেশন কার্ডে ঠিকমতো রেকর্ড করা হচ্ছে কি—না।

গবাদিপশুর ভাইরাল বা ব্যাকটেরিয়াল টিকা সাধারণত ইন্ট্রামাসকুলার ও সাবকিউটেনিয়াস ইনজেকশনের মাধ্যমে প্রয়োগ (প্যারেন্টেৱাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) করা হয়।

পদ্ধতি

গবাদিপশুর দেহে টিকা ইন্ট্রামাসকুলার বা সাবকিউটেনিয়াস পথে প্রয়োগ করা হয়।

ক. ইন্ট্রামাসকুলার ইনজেকশন (Intramuscular Injection)— সাধারণত পুরু মাংসপেশিতে ইন্ট্রামাসকুলার ইনজেকশন দিতে হয়। যেমন— গবাদিপশুর জলাতন্ত্র রোগের টিকা গুটিয়াল বা উরুর মাংসে ইনজেকশন দিয়ে দিতে হয়।

খ. সাবকিউটেনিয়াস ইনজেকশন (Subcutaneous Injection)— গবাদিপশুর চামড়ার নিচে ফ্যাসার মধ্যে ইনজেকশনের মাধ্যমে টিকা প্রয়োগ করাই সাবকিউটেনিয়াস টিকা প্রয়োগ পদ্ধতি। গবাদিপশুর টিলা চামড়া, যেমন— গলকম্বল এবং নাভির চারপাশে ইনজেকশন করে এ টিকা প্রয়োগ করা হয়। গলাফোলা, বাদলা, টিস্যু কালচার রিভারপেস্ট ভ্যাকসিন (টিসিভি) ইত্যাদি এ পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা হয়।

অনুশীলন (Activity) : দেহে ওষুধ প্রয়োগের চারটি পথের মধ্যকার পার্থক্যসমূহ লিখুন।



সারমর্ম : প্রতিটি টিকা ও ওষুধ প্রয়োগের নির্দিষ্ট পথ আছে। সঠিক পথে পশুর দেহে টিকা ও ওষুধ প্রয়োগ করলে প্রকৃত ফল লাভ করা যায়। ভুল পথে প্রয়োগে বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। চারটি পথে ইনজেকশন প্রয়োগ করা হয়।



পাঠোভর মূল্যায়ন ৮.১

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন

ক. টিকা প্রয়োগের প্রধান দুটো পথ কী ?

- i) চোখে ফোটা ও স্প্রে
- ii) ইন্ট্রাভেনাস ও ইন্ট্রামাসকুলার ইনজেকশন
- iii) ইন্ট্রামাসকুলার ও সাবকিউটেনিয়াস ইনজেকশন
- iv) ওরাল ও ইন্ট্রামেমারি ইনফিউশন

খ. যে কোনো টিকা মাত্রামতো প্রয়োগ না করলে কী হয়?

- i) রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা লোপ পায়
- ii) রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে উঠে না
- iii) রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়
- iv) বার বার টিকা দিতে হয়

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. নিয়মিত টিকা প্রদান করলে গবাদিপশুতে রোগ মহামারী আকারে হয় না।

খ. চামড়ার নিচে ইনজেকশনের মাধ্যমে ওষুধ প্রয়োগকে সাবকিউটেনিয়াস ইনজেকশন বলে।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. বাটের ছিদ্রের ভিতর দিয়ে ওলানে _____ ওষুধ প্রয়োগ করা হয়।

খ. ধূমায়িত ওষুধ শাসনালি বা _____ ভিতরে প্রবেশ করানোর জন্য ব্যবহার হয়।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. কোন্ পথে ওষুধ প্রয়োগের জন্য গুটিয়াল মাংস ব্যবহার করা হয়?

খ. কোন্ কোন্ টিকা দেহের তিলা চামড়ার নিচে প্রয়োগ করা হয়?

পাঠ ৮.২ ইনজেকশনের মাধ্যমে গবাদিপশ্চতে ওষুধ প্রয়োগ



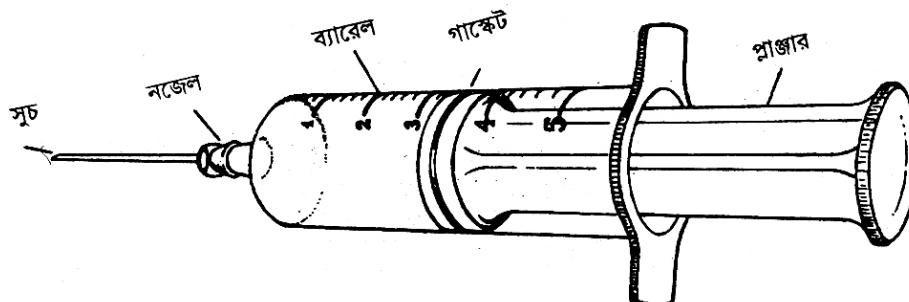
এ পাঠ শেষে আপনি –

- ইনজেকশনের মাধ্যমে গবাদিপশ্চতে ওষুধ প্রয়োগের সুবিধা বলতে পারবেন।
- ইনজেকশনের বিভিন্ন পথ বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন পথে ইনজেকশন দেয়া ও ওষুধের মাত্রা লিখতে পারবেন।



ইনজেকশন (Injection)

গবাদিপশ্চর দেহের যে কোনো তত্ত্বে কার্যকরভাবে সরাসরি ওষুধ পৌছানোর জন্য সিরিঞ্জ ও সুচের মাধ্যমে প্যারেন্টেরিয়াল পথে ইনজেকশন প্রয়োগ করতে হয়। ইনজেকশন প্রয়োগ করার একটি সিরিঞ্জের কয়েকটি অংশ থাকে। যথা— নজেল বা সুচ ধারক, ব্যারেল ও পিস্টন। পিস্টন আবার গাস্কেট ও প্লাঞ্জার সমন্বয়ে তৈরি। সিরিঞ্জের নজেলে সুচ লাগিয়ে ইনজেকশন পুশ করা হয়।



চিত্র ৬৩ : একটি সিরিঞ্জের বিভিন্ন অংশ

ইনজেকশনের সুবিধা

- ◆ ওষুধ পশ্চর দেহে সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করা যায়।
- ◆ ওষুধের অপচয় রোধ করা যায়।
- ◆ নির্দিষ্ট অঙ্গে ওষুধ প্রয়োগ নিশ্চিত করা যায়।
- ◆ ওষুধের দ্রুততর কার্যকারিতা নিশ্চিত করা যায়।
- ◆ শরীরের অভ্যন্তরীণ স্পর্শকাত্তর অঙ্গে ওষুধ প্রয়োগ নিশ্চিত করা যায়।
- ◆ অন্য যে কোনো পথের চেয়ে কম ওষুধে কার্যকরভাবে রোগ নিরাময় করা যায়।

ইনজেকশন প্রয়োগ পথ

ইনজেকশন প্রধানত তিন পথে প্রদান করা হয়। যথা—

- ◆ চামড়ার নিচে (Subcutaneously)
- ◆ মাংসের মধ্যে (Intramuscularly) এবং
- ◆ শিরার মধ্যে (Intravenously)

এছাড়াও গবাদিপশ্চতে নির্দিষ্ট প্রয়োজনে ইন্ট্রাপেরিটোনিয়াল (Intraperitoneal) ও ইন্ট্রাডুরাল (Intradural) ইনজেকশন দেয়া হয়ে থাকে।

ক. চামড়ার নিচে ইনজেকশন

সারকিউলেটেনিয়াস ইনজেকশনে সিরিঞ্জ ও সুচের সাহায্যে তরল ওষুধ চামড়ার নিচে প্রয়োগ করা হয়। সাধারণত এ পথে অনুভেজক বা নন-ইরিটেন্ট ওষুধ (Non-irritant Drug) প্রয়োগ করা হয়। ওষুধ চামড়ার নিচে ধীরে শোষণ করানোর উদ্দেশ্যে এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

চামড়ার নিচে ওষুধ ধীরে শোষণের জন্য ইনজেকশন প্রয়োগ করা হয়।

চামড়ার নিচে ওষুধ ধীরে শোষণের জন্য ইনজেকশন প্রয়োগ করা হয়।

ইনজেকশনের স্থান ও ওষুধের মাত্রা : পশুর দেহের যেসব স্থানের চামড়া টিলা বা ঝুলে থাকে সাবকিউটেনিয়াস ইনজেকশন সেসব স্থানের চামড়ার নিচে দেয়া হয়। সাবকিউটেনিয়াস ইনজেকশন গবাদিপশুর দেহের যেসব স্থানে দেয়া হয় তা হচ্ছে—

১. গলকম্বল
২. গলার আশপাশ
৩. পেটের নিচে
৪. নাভির আশপাশ
৫. লেজের গোড়া

এ পদ্ধতি সাধারণত কম মাত্রার ওষুধ বা টিকা প্রয়োগে ব্যবহার করা হয়। তবে, বেশি মাত্রায় ওষুধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে সম্পূর্ণ ওষুধ একাধিক স্থানে ইনজেকশন করে দিতে হয়।

সাবকিউটেনিয়াস ইনজেকশনের জন সুচ খাটো ও মোটা হতে হয়। বাম হাতে পশুর চামড়া টেনে ধরে রেখে সুচ চুকিয়ে সুচসহ চামড়া উপরে টানলে সুচের আগা মাংসে না আঁকিয়ে এদিকসৌন্দর্য নড়াচড়া করলে সুচের আগা চামড়ার নিচে চুকেছে বলে নিশ্চিত হওয়া যাবে। এরপর সিরিঞ্জে সুচ লাগিয়ে ওষুধ পুশ করতে হবে।

খ. মাংসপেশিতে ইনজেকশন (Intramuscular Injection)

সিরিঞ্জে ও সুচের সাহায্যে তরল ওষুধ পুরু মাংসপেশির মধ্যে পুশ করা হয়। সাধারণত এ পদ্ধতিতেও কিছুটা তীব্র প্রকৃতির ওষুধ (Mild-irritant Drug) প্রয়োগ করা হয়। অপেক্ষাকৃত দ্রুত শোষণ ও কার্যকর করার জন্য এ পদ্ধতিতে ওষুধ পুশ করা হয়। অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ওষুধ পুশ করতে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

ওষুধ কিছুটা দ্রুত শোষণ করানোর জন্য গুটিয়াল মাংসপেশিতে লম্বা সুচ দিয়ে ইনজেকশন করা হয়।

ইনজেকশনের স্থান ও ওষুধের মাত্রা : পশুর দেহের যেসব স্থানের মাংস পুরু সেসব স্থানের মাংসের মধ্যে ইন্ট্রামাসকুলার ইনজেকশন দেয়া হয়। গবাদিপশুর যেসব স্থানে ইন্ট্রামাসকুলার ইনজেকশন দেয়া হয় তা হচ্ছে—

১. হিপ জয়েন্ট ও লেজের মধ্যবর্তী গুটিয়াল মাংসে
২. পিছনের পায়ের উরুর মাংসে

এ পদ্ধতি সাধারণত মাঝারি মাত্রার ওষুধ বা অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ওষুধ প্রয়োগে ব্যবহার করা হয়। পরপর কয়েকদিন ইনজেকশন দিতে হলে একদিন পশুর দেহের যেপাশে ইকজেকশন দেয়া হবে পরদিন অন্যপাশে দিতে হবে।

ইন্ট্রামাসকুলার ইনজেকশনের সুচ তুলনামূলকভাবে একটু লম্বা হতে হয়। এ ইনজেকশনের জন্য পশু ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে করে দেহে ওষুধ প্রয়োগের সময় নড়তে না পারে। সুচ মাংসে চুকিয়ে একটু টেনে পরে সিরিঞ্জের ওষুধ পুশ করলে ওষুধ সহজে এবং দ্রুত প্রবেশ করে।

গ. শিরায় ইনজেকশন (Intravenous Injection)

ইন্ট্রাভেনাস বা অন্তঃশিরা ইনজেকশন ড্রিপ বা সিরিঞ্জে ও সুচের সাহায্যে তরল ওষুধ শিরার মাধ্যমে সরাসরি রক্তে প্রয়োগ করা হয়। এতে করে ওষুধ সঙ্গে সঙ্গে রক্তে মিশে কাজ শুরু করে এবং দ্রুত ফল দেয়। সাধারণত এ পদ্ধতিতে তীব্র (Irritant) ও দ্রুত কার্যকর ওষুধ প্রয়োগ করা হয়। যে কোনো রোগে জরুরি অবস্থার প্রেক্ষিতে ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশন দেয়া হয়। এ পদ্ধতি সাধারণত বেশি মাত্রার ওষুধ বা ড্রিপ ইনফিউশনের কাজে লাগানো হয়।

দ্রুত ওষুধ শোষণ করানোর জন্য জগতের বাকেরে শিরায় ইনজেকশন দেয়া হয়। পশু ভালো করে নিয়ন্ত্রণ করে ধারালো সুচের প্লারা রক্ত প্রোত্তে বিপরীতে ধীরে ধীরে পুশ করতে হয়।

ইনজেকশনের স্থান ও ওষুধের মাত্রা : পশ্চর দেহে যেসব শিরা বাহির থেকে দেখা যায় সেসব শিরার মধ্যে ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশন দেয়া হয়। গবাদিপশুর যেসব শিরায় ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশন দেয়া হয় তা হচ্ছে—

১. গলার জুগলার শিরা
২. কানের শিরা

ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশনের জন্য নতুন ধারালো সুচ নিতে হয়। এ ইনজেকশনের জন্য পশ্চ ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে করে কাজের সময় নড়তে না পারে। সুচ চুকানোর পূর্বে শিরার রক্ত চলাচল হাতের চাপে বন্ধ করে দিয়ে শিরা ফুলিয়ে নিতে হবে। অতঃপর সাবধানে প্রয়োজনমতো সুচ চুকিয়ে দিলে শিরার ভিতরে প্রবেশের সাথে সাথে সিরিঞ্জ বা ড্রিপের পাইপে রক্ত দেখা গেলে সুচ শিরার মধ্যে প্রবেশ করেছে বলে ধরে নিতে হবে। এরপর ওষুধ পুশ বা ড্রিপ সেটের নব ঢিলা করলে যদি সুচের পাশের চামড়া ফুলে না উঠে এবং সহজে ওষুধ প্রবেশ করে তবে শিরায় ওষুধ প্রবেশ করেছে বলে নিশ্চিত হওয়া যাবে। শিরায় ওষুধ সবসময় রক্ত স্নোতের বিপরীতে প্রবেশ করাতে হয়।

এছাড়াও গবাদিপশুতে পেরিটেনাইটিস (Peritonitis) রোগের চিকিৎসায় অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেকশনের মাধ্যমে সরাসরি পেরিটেনিয়ামে প্রবেশের জন্য ইন্ট্রাপেরিটেনিয়াল (Intrapеритональ) ইনজেকশন দেয়া হয়। কোমরের ব্যাথার চিকিৎসার জন্য এক্সট্রাডুরাল (Extradural) ইনজেকশন দেয়া হয়ে থাকে।



অনুশীলন (Activity) : ইনজেকশন প্রয়োগের বিভিন্ন পথের মধ্যকার পার্থক্যগুলো লিপিবদ্ধ করুন।



সারমর্ম : পশ্চর যে কোনো তত্ত্বে কার্যকরভাবে সরাসরি ওষুধ প্রয়োগ পদ্ধতিকে ইনজেকশন দেয়া বলে। প্রধানত ইনজেকশন চামড়ার নিচে, মাংসের মধ্যে এবং শিরায় প্রদান করা হয়। চামড়ার নিচের ইনজেকশন গলকম্বল, গলার আশপাশ, পেটের নিচ, নাভির আশপাশ এবং লেজের গোড়ায় দেয়া হয়। ইন্ট্রামাসকুলার ইনজেকশন হিপজয়েন্ট ও লেজের মধ্যবর্তী গুটিয়াল মাংসে ও পিছনের পায়ের উরুর মাংসে দেয়া হয়। ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশন গলার জুগলার ও কানের শিরায় দেয়া হয়।



পাঠোভর মূল্যায়ন ৮.২

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন

- ক. যে দুটো প্রধান পথে টিকা প্রয়োগ করা হয় সেগুলো কী কী ?
i) এক্সট্রাডুরাল ড্রিপ
ii) ইন্ট্রাভেনাস ও ইন্ট্রামাসকুলার ইনজেকশন
iii) ইন্ট্রামাসকুলার ও সাবকিউটেনিয়াস ইনজেকশন
iv) ওরাল ও ইন্ট্রামেমারি ইনফিউশন
- খ. যে ইনজেকশনের মাধ্যমে সর্বাধিক পরিমাণ ওষুধ শরীরে প্রবেশ করানো যায় তার নাম কী ?
i) ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশন
ii) ইন্ট্রামাসকুলার ইনজেকশন
iii) সাবকিউটেনিয়াস ইনজেকশন
iv) এক্সট্রাডুরাল ইনজেকশন

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

- ক. ইনজেকশন প্রধানত তিন পথে প্রদান করা হয়।
খ. ইন্ট্রামাসকুলার ইনজেকশন প্রয়োগের জন্য লম্বা সুচ ব্যবহার করা হয়।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

- ক. শিরায় ওষুধ প্রয়োগ করলে ওষুধ সঙ্গে সঙ্গে _____ মিশে কাজ শুরু করে এবং দ্রুত ফল দেয়।
খ. শিরায় ওষুধ সবসময় রক্ত স্নোতের _____ প্রবেশ করাতে হয়।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

- ক. ইন্ট্রামাসকুলার ইনজেকশনে সাধারণত কী প্রকৃতির ওষুধ ব্যবহার করা হয়?
খ. পেরিটোনাইটিস রোগে কোন পথে ওষুধ প্রয়োগ করা হয়?

ব্যবহারিক



৮.৩ গবাদিপশুকে নিজ হাতে ওষুধ খাওয়ানো

এ পাঠ শেষে আপনি –

- গবাদিপশুকে মুখের মাধ্যমে ওষুধ খাওয়ানোর সুবিধা ও অসুবিধা বলতে পারবেন।
- নিজ হাতে গবাদিপশুকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে ওষুধ খাওয়াতে পারবেন।



প্রাসঙ্গিক তথ্য

সাধারণত গ্যাস্ট্রো-এন্টারাইটিস বা অন্ত্রের যে কোনো অসুখের জন্য গবাদিপশুকে মুখ দিয়ে ওষুধ খাওয়ানো হয়।

সুবিধা

- ◆ এটি একটি সহজ ওষুধ সেবন পদ্ধতি।
- ◆ মালিক নিজেই খাওয়াতে পারেন।
- ◆ ক্ষুধামন্দা বা রেচনতত্ত্বের অসুখে ওষুধ দ্রুত কাজ করে।
- ◆ দিনে একাধিকবার প্রয়োগের জন্য এটি সুবিধাজনক পদ্ধা।
- ◆ অনেকদিন পর্যন্ত একনাগাড়ে ওষুধ প্রয়োগের জন্য এটি একটি উৎকৃষ্ট পথ।
- ◆ পানীয় বা খাদ্যের সঙে মিশিয়ে প্রয়োগ করা যায়।
- ◆ দীর্ঘস্থায়ী ওষুধের বাহক বা সাস্টেইনেবল বোলাস (Sustainable Bolus) প্রয়োগ করা যায়।

অসুবিধা

- ◆ শাসনালির ভিতর দিয়ে ওষুধ ফুসফুসে প্রবেশ করে নিউমোনিয়ার সৃষ্টি করতে পারে।
- ◆ অ্যাটিবায়োটিক ও সালফোনেমাইড জাতীয় ওষুধ এ পথে ধীরে কাজ করে।
- ◆ অ্যাটিবায়োটিক ও সালফোনেমাইড জাতীয় ওষুধ পরিমাণে বেশি লাগে।
- ◆ অ্যাটিবায়োটিক ও সালফোনেমাইডের কার্যকারিতা কমে যায়।
- ◆ অ্যাটিবায়োটিক ও সালফোনেমাইড জাতীয় ওষুধ পাকস্তলীর উপকারী ব্যাকটেরিয়া (Rumen Flora) মেরে ফেলে গবাদিপশুর হজমশক্তিহ্রাস করে।
- ◆ অ্যাটিবায়োটিক ও সালফোনেমাইড জাতীয় ওষুধ খাওয়ালে ক্ষুদ্রামন্দা দেখা দেয়।
- ◆ অ্যাটিবায়োটিক ও সালফোনেমাইড জাতীয় ওষুধ বেশিদিন খাওয়ালে ব্যাকটেরিয়া ওষুধ সহ্য করার ক্ষমতা লাভ করে (Drug Resistant)।

পদ্ধতি

যে কোনো ওষুধ মুখের মাধ্যমে খাওয়াতে হলে পানিতে মিশিয়ে নিতে হয়। তাই ওষুধ স্টমাক টিউব বা লংগ গলাওয়ালা বোতলে পুরে মুখে ঢেলে খাওয়ানো হয়। বোতলে ওষুধ খাওয়ানোর সময় পশুকে ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করে গলা ভূমি সমান্তরাল রেখে মুখে ওষুধ ঢেলে দিতে হয়।

পরীক্ষণ ১ স্টমাক টিউবের সাহায্যে গবাদিপশুকে ওষুধ খাওয়ানো

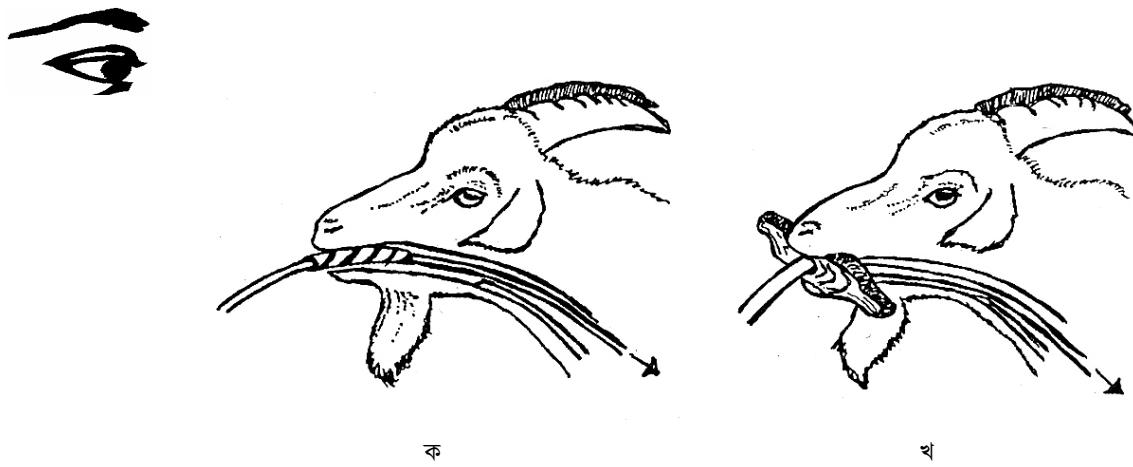
প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. মাত্রামতো তরল ওষুধ— ১ বোতল।
২. স্টমাক টিউব— ১টি।
৩. মাউথ গ্যাগ (বড়)— ১টি।

৪. প্লাস্টিক ফানেল— ১টি ।

৫. ১-২ বছর বয়সের ছাগল — ১টি ।

৬. ব্যবহারিক খাতা, কলম, পেনিল, রাবার, সার্পনার, ক্ষেল ইত্যাদি ।



চিত্র ৬৪ (ক, খ) : স্টমাক টিউবের মাধ্যমে ছাগলকে ওষুধ খাওয়ানো

কাজের ধারা

- ◆ প্রথমে ছাগলটিকে নিয়ন্ত্রণ করুন ।
- ◆ ছাগলের মুখের দুচোয়াল ফাক করে মাউথ গ্যাগ পড়িয়ে দিন ।
- ◆ মাউথ গ্যাগের ছিদ্র দিয়ে স্টমাক টিউব ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়ে দিন ।
- ◆ খাদ্যনালির শেষপ্রাণে পাইলোরাস পর্যন্ত প্রবেশ করলে একটু চাপ দিয়ে পাইলোরাস ভেদ করে টিউব রূমেনে প্রবেশ করিয়ে দিন ।
- ◆ এবার স্টমাক টিউবের বাইরের প্রাপ্তে ফানেলের নল লাগিয়ে নিন ।
- ◆ সাহায্যকারীকে স্টমাক টিউবসহ মাউথ গ্যাগ ধরে রাখতে বলুন ।
- ◆ ডান হাতে বোতল নিয়ে বাম হাতে টিউবসহ ফানেল ধরে তাতে ওষুধ ঢালুন ।
- ◆ ওষুধ শেষ হলে ধীরে ধীরে টেনে স্টমাক টিউব বের করে আনুন ।
- ◆ এবার সাবধানে মাউথ গ্যাগ খুলে ফেলুন ।
- ◆ এবার পুরো পরীক্ষণটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখুন ও আপনার টিউটরকে দেখিয়ে তাতে সই নিন ।

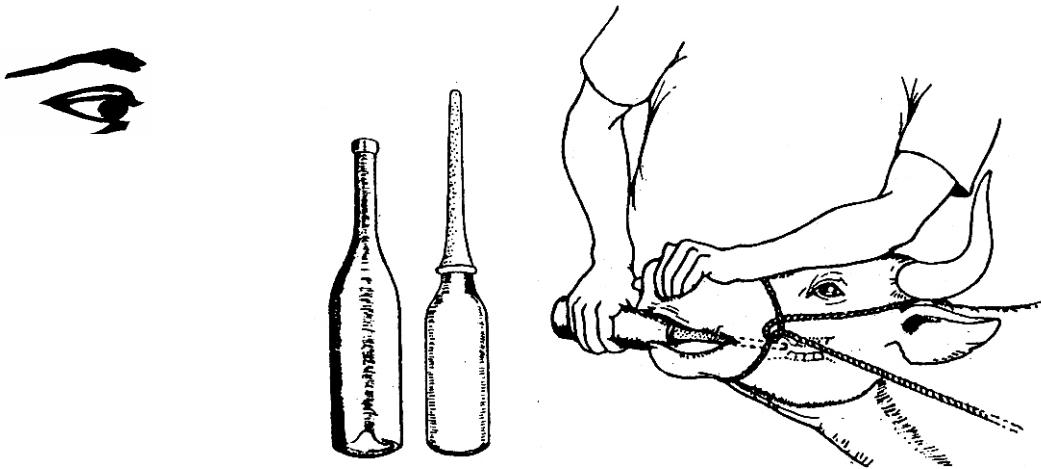
সাবধানতা

- ◆ তাড়াভড়ো করে স্টমাক টিউব প্রবেশ করাবেন না বা প্রবেশের সময় জোড় করবেন না এতে খাদ্যনালিতে ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে ।
- ◆ ঠিকমতো নিয়ন্ত্রণ না করতে পারলে ছাগল নড়াচড়া করবে । এতে ফানেলে ওষুধ ঢালার সময় তা পড়ে যেতে পারে ।
- ◆ সম্পূর্ণ ওষুধ রূমেনে প্রবেশের পরই কেবল টিউব ধীরে ধীরে টেনে বের করতে হবে । অন্যথায় শ্বাসনালিতে ওষুধ প্রবেশ করতে পারে ।
- ◆ মাউথ গ্যাগ খুলে গেলে ছাগল টিউব চিবিয়ে ফেলতে চাহিবে । তাই যাতে না খুলতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে ।

পরীক্ষণ ২ বোতলের সাহায্যে গবাদিপশুকে ওষুধ খাওয়ানো

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. লম্বা গলাওয়ালা আধা লিটারের বোতল— ১টি ।
২. ৫০০ মি.লি. প্লাস্টিক পাত্র— ১টি ।
৩. পানি— ০.৫ লিটার ।
৪. প্লাস্টিকের ফানেল— ১টি ।
৫. ৩-৪ বছর বয়সের গরু— ১টি ।



চিত্র ৬৫ : বোতলের সাহায্যে গরুকে ওষুধ খাওয়ানো

কাজের ধারা

বোতলের মুখ গরুর মুখে প্রবেশ করিয়ে ওষুধ ঢেলে খাওয়ানো যায়। মালিক নিজে এ কাজ করতে পারেন।

- ◆ প্লাস্টিকের পাত্রে মাত্রা অনুযায়ী ওষুধ নিয়ে ২৫০ মি.লি. পানিতে ভালো করে মিশিয়ে নিন।
- ◆ এবার ফানেলের সাহায্যে ওষুধ বোতলে ঢেলে নিন।
- ◆ অবশিষ্ট ২৫০ মি.লি. পানি বোতলে ঢেলে নিন।
- ◆ বোতল বাঁকিয়ে ওষুধ ভালো করে মিশিয়ে নিন।
- ◆ এবার গরু ট্রাবিসে ঢুকিয়ে সাহায্যকারীর হারা নিয়ন্ত্রণ করুন।
- ◆ ভূমি সমান্তরাল করে মুখ উঁচিয়ে ধরে বাম হাতে জিহ্বার আগা আলতোভাবে চেপে রাখুন।
- ◆ এবার ডান হাতে ওষুধের বোতল ধরে অন্যপাশের চোয়াল দিয়ে বোতলের মুখ গরুর মুখে ঢুকিয়ে দিন।
- ◆ ধীরে ধীরে বোতলের পিছনের দিক উঁচিয়ে ওষুধ ঢালুন।
- ◆ বোতলের সব ওষুধ শেষ হলে বের করে আনুন।
- ◆ ট্রাবিস থেকে গরু বের করুন।
- ◆ পুরো পরীক্ষণটি এবার ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখুন ও আপনার টিউটরকে দেখিয়ে তাতে সহি নিন।

সাবধানতা

- ◆ চোয়ালের একপাশ দিয়ে মুখে হাত ঢুকাতে হয় যাতে কামড় দিতে না পারে।
- ◆ শ্বাসনালিতে যাতে ওষুধ প্রবেশ না করে সেজন্য ভূমি সমান্তরাল করে মুখ উঁচিয়ে ধরতে হয়।
- ◆ পুরু শক্ত কাঁচের বোতল নিতে হবে যাতে বোতল ভেঙে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে।

ব্যবহারিক

৮.৪ একটি গরুর বিভিন্ন জায়গায় ইনজেকশন প্রদান

এ পাঠ শেষে আপনি –

- গরুর দেহের বিভিন্ন স্থানে ইনজেকশন দেয়ার পদ্ধতিগুলোর নাম বলতে পারবেন।
- নিজ হাতে গরুর বিভিন্ন রূটে ইনজেকশন প্রয়োগ করতে পারবেন।



ইন্ট্রাভেনাস রূটে ওষুধ
সরাসরি রক্তে যায় বলে দ্রুত
রোগ নিরাময় হয়।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

ওষুধের কাজ দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করার জন্য ইনজেকশনের মাধ্যমে ওষুধ প্রয়োগ করা হয়। গরুতে সাধারণত ৪টি রূটে বা পথে ইনজেকশনের মাধ্যমে ওষুধ পুশ করা হয়। যথা— ক. অন্তঃশিরা বা ইন্ট্রাভেনাস (Intravenous), খ. মাংসপেশি বা ইন্ট্রামাস্কুলার (Intramuscular), গ. পেরিটোনিয়ামে বা ইন্ট্রাপেরিটোনিয়াল (Intraperitoneal) ও ঘ. চামড়ার নিচে বা সাবকিউটেনিয়াস (Subcutaneous)।

ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশন

ওষুধ দ্রুত প্রবেশ করিয়ে মূরুর্ষ রোগী বাঁচানো জন্য এটি অত্যন্ত ভালোপথ।

সুবিধা

- ◆ ওষুধ সরাসরি রক্তে পৌঁছে।
- ◆ রক্ত ও টিস্যুতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ওষুধ দ্রুত যায়।
- ◆ অন্য রূটের তুলনায় ওষুধ দ্রুত কাজ করে।
- ◆ ওষুধের অপচয় হয় না।
- ◆ মূরুর্ষ রোগীর চিকিৎসায় দ্রুত কার্যকর।

অসুবিধা

- ◆ দ্রুত বিষক্রিয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- ◆ বেশি সময়ের প্রয়োজন হয়।
- ◆ সাধারণত হাসপাতাল ছাড়া এ রূটে ওষুধ প্রয়োগ নিরাপদ নয়।
- ◆ মালিকের বাড়িতে চিকিৎসার সময় পশু মারা গেলে মালিক মনে করেন ভুল চিকিৎসায় মারা গেছে।

পদ্ধতি

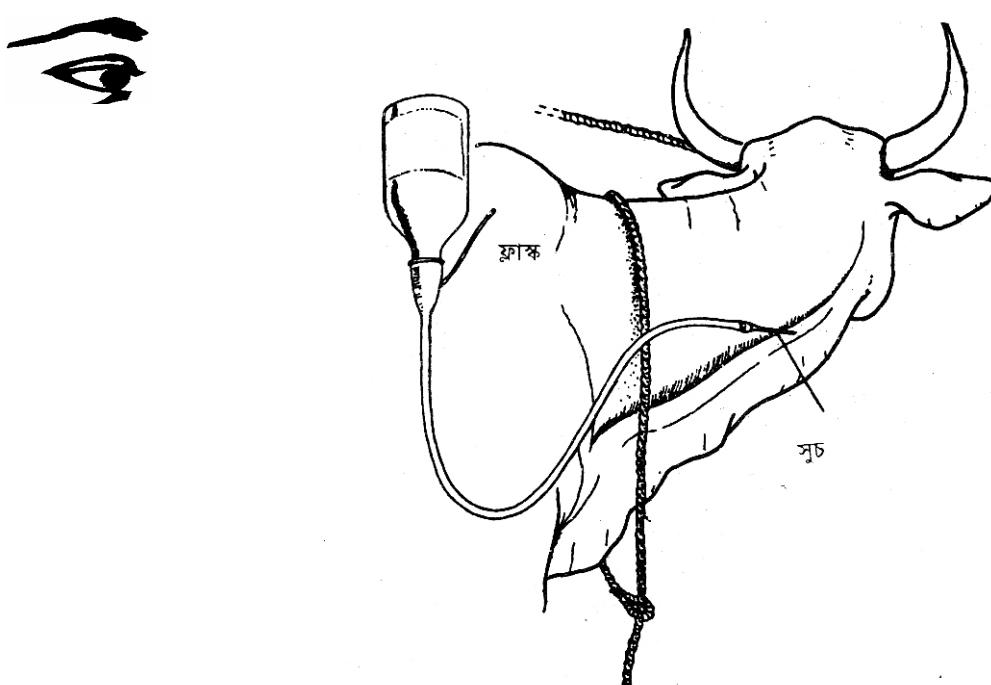
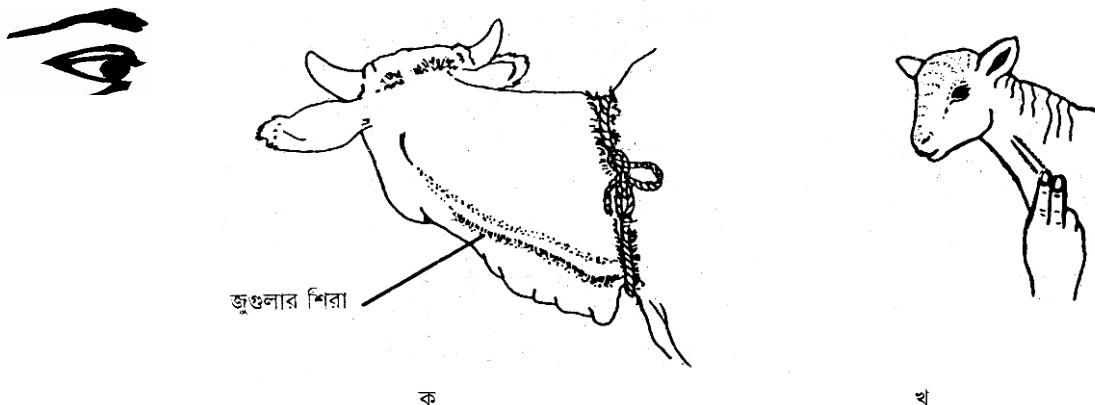
গরুর গলার পাশে জুগলার শিরার ভিতরে রক্তে ওষুধ প্রবেশ করাতে হয়। সুচ দিয়ে জুগলার শিরা ছিদ্র করলে যদি ফিলকি দিয়ে রক্ত বের হয় তবে বুঝতে হবে সুচ শিরায় প্রবেশ করেছে। দ্রুত সিরিঞ্জে সুচ লাগিয়ে রক্ত স্নোতের বিপরীতে ধীরে ধীরে ওষুধ প্রবেশ করাতে হয়। ড্রিপ বা বেশি মাত্রার ওষুধের ক্ষেত্রে সেলাইন কিট (Saline Kit) ব্যবহার করা হয়। এতে রোগীর অবস্থা বিবেচনা করে প্রেসার হাঁটলের নব ঘুরিয়ে ওষুধ নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

পরীক্ষণ ১ ইন্ট্রাভেনাস রূটে ওষুধ প্রয়োগ

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. মাত্রামতো তরল ওষুধ— ৫০ মি.লি.।

২. কাস্টিং দড়ি— ১টি ।
৩. সিরিঞ্জ (৫০ মি.লি.)— ১টি ।
৪. সুচ (১৬ গেজি) — ১টি ।
৫. ৩-৪ বছর বয়সের গরু— ১টি ।



কাজের ধারা

জীবাণুমুক্ত সিরিঞ্জ দিয়ে
জুগলার শিরায় ইনজেকশন
করে ওষুধ পুশ করা হয়।

- ◆ প্রথমে একটি জীবাণুমুক্ত সিরিঞ্জে ৫০ মি.লি. ওষুধ ভরে নিন।
- ◆ গরুটি খোলা জায়গায় নিয়ে কাস্টিংয়ের মাধ্যমে ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করুন।
- ◆ এবার জুগলার শিরায় বাম হাতে চাপ দিয়ে রক্ত প্রবাহ বন্ধ করুন।
- ◆ জুগলার শিরা ফুলে ডুঁচ হয়ে উঠলে ডান হাতে দৃঢ়তর সাথে সুচ প্রবেশ করিয়ে দিন।

- ◆ এবার সুচ দিয়ে রক্ত বের হতে থাকলে তাতে সিরিজের নজল লাগিয়ে রক্ত প্রবাহের বিপরীতে ধীরে ধীরে ওষুধ প্রবেশ করাতে থাকুন।
- ◆ সিরিজে একটু ওষুধ রেখেই সুচ খুলে নিন যাতে রক্তের মধ্যে বাতাস প্রবেশ করতে না পারে।
- ◆ এবার কাস্টিং দড়ি খুলে দিন।
- ◆ এবার পুরো পরীক্ষণটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখুন ও আপনার টিউটরকে দেখিয়ে তাতে সহ নিন।

সাবধানতা

- ◆ ওষুধ পুশ করার সময় গরুর শাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিকভাবে চলতে দিতে হবে।
- ◆ ইনজেকশনের সময় গরু যেন নড়াচড়া না করে। তবে, নিয়ন্ত্রণকারী যেন বুকের উপর চাপ না দেন সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- ◆ শিরায় যাতে বাতাস প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য সিরিজে একটু ওষুধ থাকতেই সুচ খুলে নিতে হবে।

ইন্ট্রামাসকুলার ইনজেকশন গরুর জন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক পথ। দেহের যে কোনো পুরু মাংসপেশিতে এ পথে বিভিন্ন ওষুধ প্রয়োগ করা হয়। সাধারণত গরুর পিছনের রানের মাংসে বা গুটিয়াল মাংসে ইন্ট্রামাসকুলার ইনজেকশন দেয়া হয়। অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ওষুধ পুশ করার জন্য এ পথ বেশি ব্যবহার করা হয়।

সুবিধা

- ◆ এ পথে ওষুধ প্রয়োগে ঝুঁকি কম।
- ◆ দ্রুত ওষুধ পুশ করা যায়।
- ◆ দিনে একবার প্রয়োগ করলেই হয়।
- ◆ মুখে ওষুধ খাওয়ানোর চেয়ে বামেলি কম।
- ◆ গরুকে বারবার উন্ডক করতে হয় না।
- ◆ গরু কাস্টিং করে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় না। ফলে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকে না।
- ◆ ক্ষুধামন্দা বা বদহজমজাতীয় পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয় না।

অসুবিধা

- ◆ স্থানিক অ্যালার্জির ফলে মাংসে পচন ধরতে পারে।
- ◆ মাংসে তৈরি ব্যাথার জন্য পা খোঁড়া হতে পারে।
- ◆ দুধ ও মাংসের জন্য প্রত্যাহার সময় (ডরঃয়ফৎধিষ্ঠিষ এওরসব) বেশি হয়।

পরীক্ষণ ২ ইন্ট্রামাসকুলার রঞ্টে ওষুধ প্রয়োগ

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. ওষুধ— ১০ মি.লি।
২. সিরিজ (১০ মি.লি.)— ১টি।
৩. সুচ (১৪ গেজি)— ১টি।

৪. ৩-৪ বছর বয়সের গরু— ১টি ।

কাজের ধারা

ওষুধ ইনজেকশনের মাধ্যমে
সরাসরি মাংসে পুশ করা হয় ।

- ◆ জীবাণুমুক্ত সিরিঞ্জ ও সুচ নিন ।
- ◆ সিরিঞ্জে সুচ লাগিয়ে নিন ।
- ◆ বাম হাতে ওষুধের ভায়াল উঠিয়ে বৃন্দাঙ্গুলের নখ দিয়ে সিলের উপরের অংশ উঠিয়ে ফেলুন ।
- ◆ এবার ডান হাতে সিরিঞ্জ ধরে ভায়ালে সুচ প্রবেশ করিয়ে পিস্টনের সাহায্যে টেনে ওষুধ সিরিঞ্জে ভরে নিন ।
- ◆ সাহায্যকারীকে হাতে ধরে গরু নিয়ন্ত্রণ করতে বলুন ।
- ◆ সুচ খুলে নিয়ে গরুর পিছনে দাঁড়িয়ে এক ফোঁড়ে বা কিকে রানের মাংসে সুচ চুকিয়ে দিন ।
- ◆ এবার সিরিঞ্জ সুচে লাগিয়ে ওষুধ পুশ করুন ।
- ◆ সুচ খুলে পিছন দিকে ঢলে আসুন ।
- ◆ এবার সাহায্যকারীকে গরু ছেড়ে দিতে বলুন ।
- ◆ পুরো পরীক্ষণটি এবার ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখুন ও আপনার টিউটরকে দেখিয়ে তাতে সই নিন ।

সাবধানতা

- ◆ গরুর সোজা পিছনে দাঁড়িয়ে ইনজেকশন দিতে হয় । পাশে যাবেন না, গরু পাশে লাঠি দেয় ।
- ◆ ওষুধ পুশের পূর্বে সিরিঞ্জের নজল সুচের সাথে ভালোভাবে লাগিয়ে নিবেন যাতে পুশের সময় ওষুধ পড়ে না যায় ।

ইন্ট্রাপেরিটোনিয়াল ইনজেকশন

গরুর পেরিটোনিয়ামের প্রদাহে সাধারণত ইন্ট্রাপেরিটোনিয়াল রুটে ইনজেকশন প্রয়োগ করা হয় ।

সুবিধা

- ◆ সরাসরি ওষুধ প্রয়োগে দ্রুত পেরিটোনাইটিস রোগ নিরাময় হয় ।

অসুবিধা

- ◆ দক্ষ ডাক্তার ছাড়া এ ইনজেকশন পুশ করা সম্ভব নয় ।
- ◆ এতে বিশেষ ধরনের সুচের প্রয়োজন হয় ।

পদ্ধতি

বড় (১২ গেজি লম্বা) সুচের সাহায্যে ডান পার্শ্বের পেটের মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে চামড়া ভেদ করে পেরিটোনিয়ামে সরাসরি ওষুধ প্রয়োগ করা হয় ।

পরীক্ষণ ও ইন্ট্রাপেরিটোনিয়াল রুটে ওষুধ প্রয়োগ

উপকরণ

১. ওষুধ— ১০ মি.লি. ।
২. সিরিঞ্জ (১০ মি.লি.)— ১টি ।
৩. সুচ (১২ গেজি)— ১টি ।
৪. ৩-৪ বছর বয়সের গরু— ১টি ।

কাজের ধারা

ওষুধ ইনজেকশনের ম্বারা সরাসরি
পেরিটেনিয়ামে পুশ করা হয়।
অভ্যন্তরীণ অসের কোনো প্রদাহে
এ পথে ওষুধ প্রয়োগ করা হয়।

- ◆ ট্রাবিসে গরু প্রবেশ করিয়ে তা নিয়ন্ত্রণ করুন।
- ◆ ডান পেটের মধ্যবর্তী স্থান ঠিক করুন।
- ◆ শেষ বক্ষাস্থি এবং টিউবার কক্সার মধ্যবর্তী স্থান চিহ্নিত করুন।
- ◆ এবার লাম্বার ভার্ট্রার লেটারাল প্রসেস থেকে মাঝ লাইন দিয়ে নিচের দিকে ১০ সেন্টিমিটার নেমে আসুন। এটিকে ইন্ট্রাপেরিটোনিয়াল ইনজেকশন পয়েন্ট হিসেবে চিহ্নিত করুন।
- ◆ এবার এ পয়েন্টে বা স্থানে চামড়ার ভিতর দিয়ে সুচ প্রবেশ করিয়ে দিন।
- ◆ এখন সুচে নজল লাগিয়ে ওষুধ পুশ করুন।
- ◆ ওষুধ পুশ করা হলে সুচের গোড়ায় চাপ দিয়ে ধরে সুচ টেনে বের করুন।
- ◆ পুরো পরীক্ষণটি এবার ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখুন ও আপনার টিউটরকে দেখিয়ে তাতে সই নিন।

সাবধানতা

- ◆ সুচ প্রবেশ করানোর সময় যেন কোনো অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিদ্র না হয় সেদিকে খেয়াল করতে হবে।

সাবকিউটেনিয়াস ইনজেকশনের
মাধ্যমে পশ্চতে চামড়ার নিচে
সাধারণত টিকা প্রদান করা হয়।

সাবকিউটেনিয়াস ইনজেকশন

টিকা ছাড়া সাধারণত অন্য কোনো ওষুধ সাবকিউটেনিয়াস ইনজেকশনের মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয় না। যে কোনো তীব্র প্রক্রিয়া বা উত্তেজক ওষুধ এ পথে পুশ করলে বিপদজনক প্রতিক্রিয়ার ফলে পশ্চ মারা যেতে পারে।

সুবিধা

- ◆ এতে টিকা ধীরে ধীরে শোষিত হয়।

অসুবিধা

- ◆ তীব্র প্রক্রিয়া বা উত্তেজক ওষুধ প্রয়োগ করলে বিপদজনক প্রতিক্রিয়ায় পশ্চ মারা যেতে পারে।

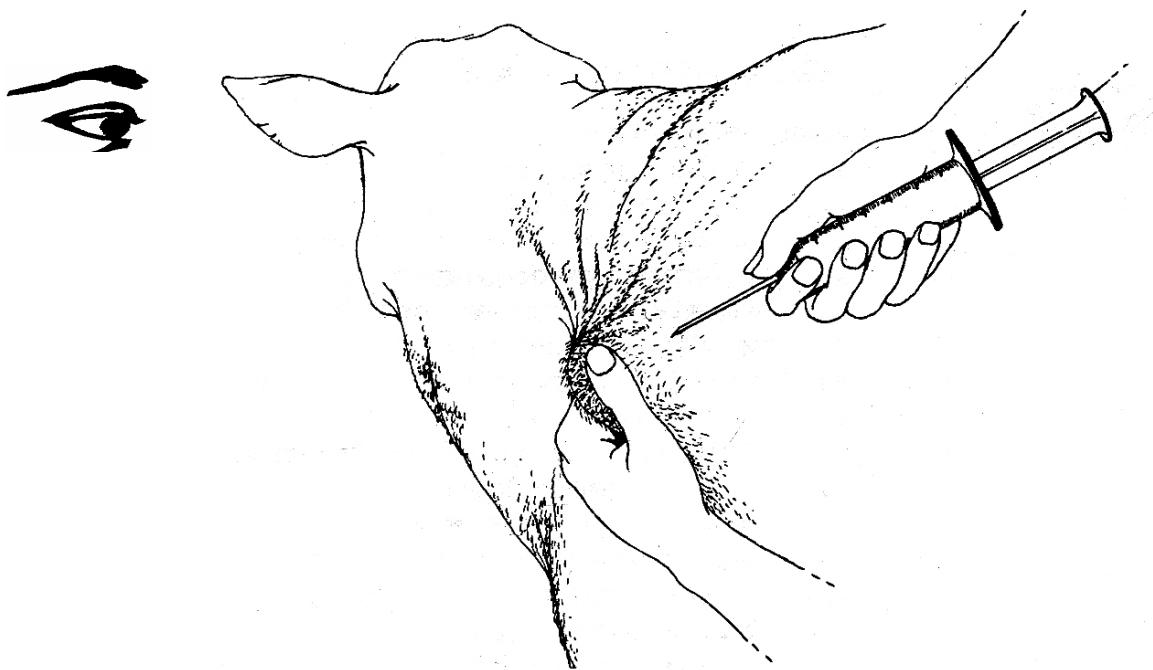
পদ্ধতি

দেহের চামড়া ও মাংসের মধ্যবর্তী অংশ অর্থাৎ ফ্যাসার (Fascia) মধ্যে ইনজেকশনের মাধ্যমে ওষুধ পুশ করলে তা ধীরে ধীরে শোষিত হয়। দেহের চিলা চামড়া, যেমন— গলা, গলকম্বল ও দেহের অন্যান্য চিলা চামড়া হাতে মুট করে ধরে এমনভাবে তাতে সুচ প্রবেশ করতে হয় যেন ফ্যাসায় যেয়ে না চুকে।

পরীক্ষণ ৪ সাবকিউটেনিয়াস রুটে টিকা প্রয়োগ

প্রয়োজনীয় উকরণ

1. টিকা— ১ মি.লি. (ধরুন, তড়কা রোগের টিকা)।
2. সিরিঞ্জ (২-৫ মি.লি.)— ১ টি।
3. সুচ (১৬ গেজি)— ১ টি।
4. ১-২ বছর বয়সের অসুস্থ গরু— ১ টি।



চিত্র ৬৮ : সাবকিউটেনিয়াস পথে পশুকে টিকা প্রদান

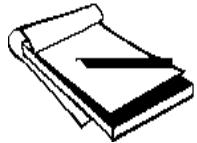
কাজের ধারা

ওষুধ ইনজেকশনের মাধ্যমে
সরাসরি মাংসে পুশ করা হয়।

- ◆ প্রথমে সিরিঞ্জ ও সুচ জীবাণুমুক্ত করে নিন।
- ◆ সিরিঞ্জে সুচ লাগিয়ে নিন।
- ◆ বাম হাতে ওষুধের ভায়াল উঠিয়ে বৃন্দাসুলের নখ দিয়ে সিলের উপরের অংশ উঠিয়ে ফেলুন।
- ◆ এবার ডান হাতে সিরিঞ্জ ধরে ভায়ালে সুচ প্রবেশ করিয়ে পিস্টনের সাহায্যে টেনে ওষুধ সিরিঞ্জে ভরে নিন।
- ◆ সাহায্যকারীকে হাতে ধরে গরু নিয়ন্ত্রণ করতে বলুন।
- ◆ সুচ খুলে নিয়ে গরুর দেহের টিলা চামড়া হাতে মুট করে ধরে এক ফোঁড়ে তা চামড়ার নিচের ফ্যাসায় ঢুকিয়ে দিন।
- ◆ এবার সিরিঞ্জ সুচে লাগিয়ে ওষুধ পুশ করুন।
- ◆ সুচ খুলে পিছন দিকে চলে আসুন।
- ◆ এবার সাহায্যকারীকে গরু ছেড়ে দিতে বলুন।
- ◆ পুরো পরীক্ষণটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখুন ও আপনার টিউটরকে দেখিয়ে তাতে সই নিন।

সাবধানতা

- ◆ সঠিকভাবে গরু নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- ◆ ওষুধ পুশের পূর্বে সিরিঞ্জের নজল সুচের সাথে ভালোভাবে লাগিয়ে নিবেন যাতে পুশের সময় ওষুধ পড়ে না যায়।



চূড়ান্ত মূল্যায়ন - ইউনিট ৮

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন

- ১। ওষুধ প্রয়োগ পথ কাকে বলে?
- ২। কী কী পদ্ধতিতে ওষুধ উপরি প্রয়োগ করা হয়?
- ৩। দেহের নির্দিষ্ট অঙ্গে ওষুধ প্রয়োগের পদ্ধতিগুলোর নাম লিখুন?
- ৪। কী ধরনের ওষুধ মুখে খাওয়ানো হয়?
- ৫। প্যারেনটেরাল ওষুধ প্রয়োগ পদ্ধতিগুলো কী কী?
- ৬। সারকিউটেনিয়াস ইনজেকশন বলতে কী বোবেন?
- ৭। কখন ইন্ট্রাপেরিটেনিয়াল ইনজেকশন প্রয়োগ করা হয়?
- ৮। ভুল পথে ওষুধ প্রয়োগ করলে কী হয়?
- ৯। টিকা প্রয়োগের পূর্বে কোন্ কোন্ বিষয় খেয়াল রাখতে হয়?
- ১০। ইনজেকশনের সুবিধাগুলো লিখুন।
- ১১। প্রধানত কোন্ পথে ইনজেকশন প্রয়োগ করা হয়?
- ১২। গবাদিপশুর দেহের কোন্ কোন্ স্থানে সারকিউটেনিয়াস ইনজেকশন দেয়া হয়।
- ১৩। মাংসপেশিতে ইনজেকশনের স্থানগুলোর নাম লিখুন?
- ১৪। শিরায় কেন ইনজেকশন দেয়া হয়?
- ১৫। মুখে ওষুধ খাওয়ানোর অসুবিধা কী?



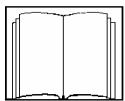
উত্তরমালা - ইউনিট ৮

পাঠ ৮.১

- | | | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------------------------|---------|------------------------------|
| ১। ক. iii | ১। খ. ii | ২। ক. স | ২। খ. স | ৩। ক. অ্যান্টিবায়োটিকজাতীয় |
| ৩। খ. ফুসফুসের | ৪। ক. ইন্ট্রামাসকুলার | ৪। খ. গলাফোলা, বাদলা ও চিস্য কালচার | | |
| | | | | রিভারপেস্ট টিকা |

পাঠ ৮.২

- | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|----------|---------|-------------|---------------|
| ১। ক. iii | ১। খ. i | ২। ক. মি | ২। খ. স | ৩। ক. রক্তে | ৩। খ. বিপরীতে |
| ৪। ক. কিছুটা তীব্র প্রকৃতির | ৪। খ. ইন্ট্রাপেরিটেনিয়াল | | | | |



তথ্যসূত্র

- রহমান, আ. (১৯৮৫)। গৃহপালিত পশুর সংক্রামক রোগতত্ত্ব (প্রথম খন্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
- রহমান, আ. (১৯৮৫)। গৃহপালিত পশুর সংক্রামক রোগতত্ত্ব (দ্বিতীয় খন্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
- রহমান, আ. (১৯৮৫)। গৃহপালিত পশুর তাস্তিক রোগতত্ত্ব (দ্বিতীয় খন্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
- রহমান, আ. (১৯৮৯)। গবাদিপশুর অপুষ্টিজনিত রোগব্যাধি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
- সামাদ, এম. এ. (১৯৯৬)। পশুপালন ও চিকিৎসাবিদ্যা। লিলিক-এপিক প্রকাশনী, ময়মনসিংহ।
- মির্ণা, আ. সা. (১৯৭৬)। গৃহপালিত পশুর প্রজনন সংকট ও ব্যাধি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
- Ainswroth, G. C. and Austwick, P. K. C. (1973). *Fungal Diseases of Animals (2nd Ed.)*, Farnham Royal, Slough, England, Commonwealth Agricultural Bureau.
- Arthur, G. H., Noakes, D. E. and Pearson, H. (1982). *Veterinary Reproduction and Obstetrics (8th Ed.)*, ELBS, UK.
- Blood, D. C., Radostits, O. M., Henderson, J. A., Arundel, J. H. and Gay, C. E. (1983). *A Textbook of Diseases of Cattle, Sheep, Pigs, Goats and Horses (6th Ed.)*, ELBS, Bailliere Tindall, Pitman Press Ltd, Great Britain.
- Buxton, A. and Fraser, G. (1977). *Animal Microbiology*, Blackwell Scientific Publications, Oxford, London, Edinburgh, Melbourne.
- Chakrabarti, A. (1994). *Textbook of Clinical Veterinary Medicine (2nd Ed.)*.
- Clarke, M. L., Harvey, D. G. and Humphreys, D. J. (1981). *Veterinary Toxicology (2nd Ed.)*, Great Britain.
- Coles, E. H. (1974). *Veterinary Clinical Pathology*, W.B. Saunders Co. Philadelphia, London.
- Etinger, S. J. (1989). *Textbook of Veterinary Internal Medicine*, W. B. Saunders Co., Philadelphia, London.
- FAO. (1994). *Manual on Meat Inspection for Developing Countries*, FAO Animal Production and Health Paper 119, FAO, Rome, Italy.
- FAO. (1983). *Manual for Animal Health Auxiliary Personnel*, FAO, Rome, Italy.
- FAO. (1994). *A Manual for the Primary Health Care Worker*, FAO, Rome, Italy.
- Greenough, P. C., MacCallum, F. J. and Weaver, A. D. (1972). *Lameness in Cattle*, Oliver and Boyd, Edinburgh.
- Gupta, P. K. and Salunkha, K. K. (1985). *Modern Toxicology (1st Ed.)*, Metropolitan Book Co. (Pvt.) Ltd., India.

- Kelly, W. R. (1967). *Veterinary Clinical Diagnosis*, Bailliere Tindall and Cassel, London, UK.
- Nicholson, M. J. and Butterworth, M. H. (1986). *A Guide to Condition Scoring of Jebu Cattle*, International Livestock Center for Africa, Addis Ababa Ethiopia.
- OConnor, J. J. (1980). *Dollar's Veterinary Surgery (4th Ed.)*, CBS Publishers and Distributors, New Delhi, India.
- Rahman, M. H., Ahmed, S. and Mondal, M. M. H. (1996). *Introduction to Helminth Parasites of Animals and Birds of Bangladesh*, Dhaka, Bangladesh.
- Rosenberger, G., Dirksen, G., Grunder, H. D., Grunert, E., Krause, D. and Stober, M. (1979). *Clinical Examination of Cattle*, Verlag Paul Parey, Berlin and Hamburg, Germany.
- Schalm, O. W., Jain, N. C. and Carrd, E. J. (1975). *Veterinary Haematology*, Lea and Febiger, Philadelphia.
- Sigmund, O. H. (1979). *The Merck Veterinary Manual (5th Ed.)*, Merck and Company, Inc., Rahwory, N. J., USA.
- Singh, H., Kumar, A. and Chaudhury, P. C. (1990). *Veterinary Clinician Guide*, Dalayassi Publishers, New Delhi, India.
- Soulsby, E. J. L. (1986). *Helminths, Arthropods and Protozoa of Domesticated Animals (7th Ed.)*, ELBS/Bailliere Tindall, UK.
- Swenson, M. J. (1977). *Dukes' Physiology of Domestic Animals (9th Ed.)*, Comstock Publishing Associates, Ithaca, London.

গবাদিপশুর রোগ ও প্রতিরোধ

LIVESTOCK DISEASES & THEIR PREVENTION

সিএলপি ১৩০৫

‘গবাদিপশুর রোগ ও প্রতিরোধ’
সিএলপি প্রোগ্রামের একটি কোর্সবই।
এ কোর্সবইটি দূরশিক্ষার ছাত্র-
ছাত্রীদের উপযোগী করে রচনা করা
হয়েছে। কোর্সবইটির বিভিন্ন ইউনিটে
গবাদিপশুর রোগ নির্ণয়ে প্রাথমিক
করণীয়, গবাদিপশুর ভাইরাস ও
ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রামক রোগ,
পরজীবী ও প্রজনন সংক্রান্ত রোগ,
সাধারণ রোগব্যাধি, গবাদিপশুর রোগ
প্রতিরোধে টিকা ও ঔষুধের ব্যবহার
পদ্ধতি প্রভৃতির ওপর তাত্ত্বিক ও
ব্যবহারিক বিষয়গুলো অত্যন্ত
সহজভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ISBN: 984-34-5055-8



কৃষি ও পদ্ধী উন্নয়ন ক্লিন
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
BANGLADESH OPEN UNIVERSITY